৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৭ পনেরো টাকা

আনন্দমেলা

চারটি সম্পূর্ণ গোয়েন্দা ও রহস্য উপন্যাস
লিখেছেন বিমল কর, সমরেশ মজুমদার,
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ও
রমাপ্রসাদ বণিক ।

বিশেষ সংখ্যা
গোয়েন্দা ও রহস্য উপন্যাস

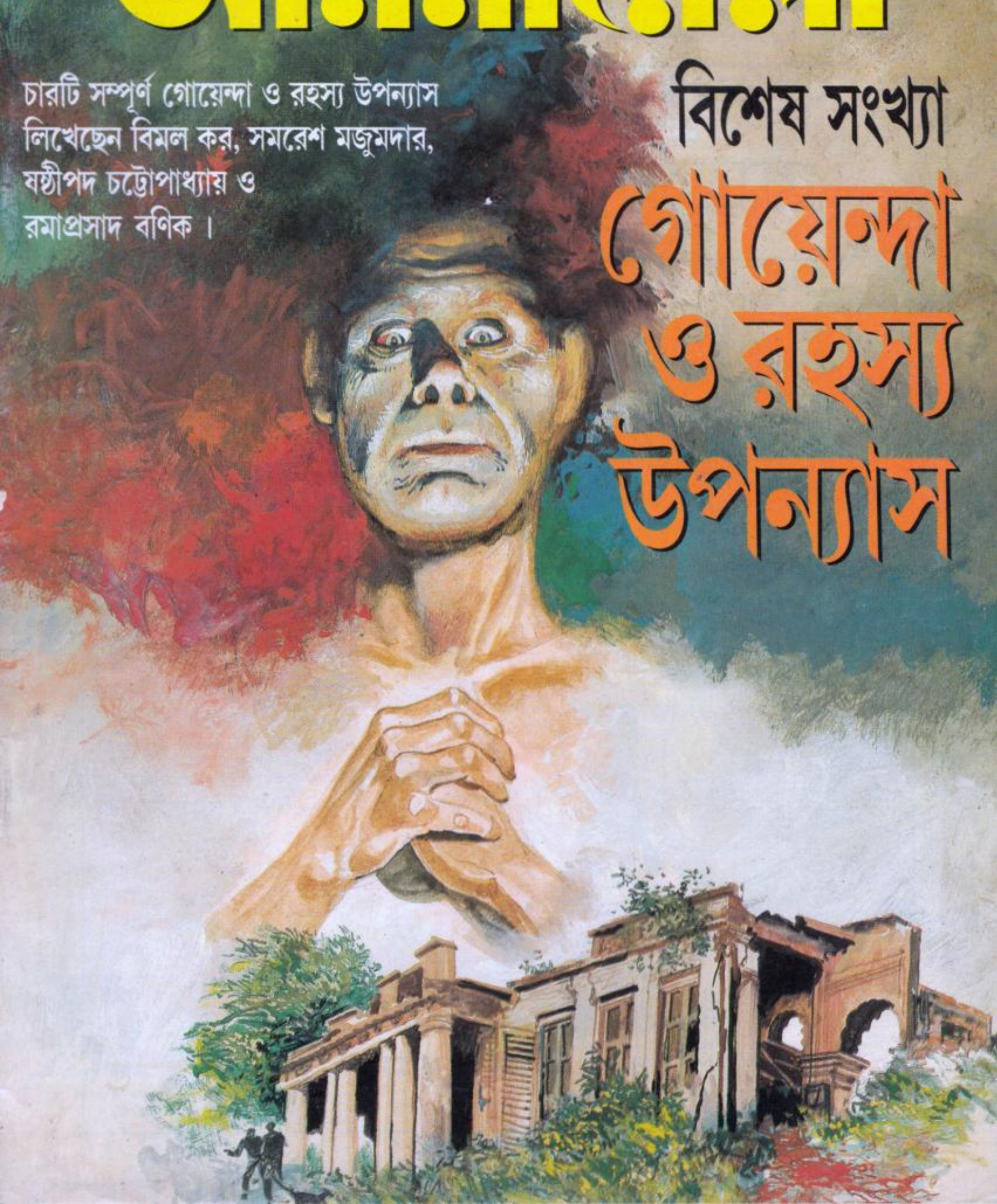

সুখবর!

উজালা এখন পাওয়া যাচ্ছে একটি নতুন 'ইকোনমি কিং সাইজ' প্যাকে।

৫.৩০প. বাঁচান!
উজালা'র
২৫০ মি.লি.
'কিং সাইজ'
প্যাকে

চার ফোঁটায় চমক

A quality product of Jyothy Laboratories Ltd.

Situations/JL/61/9

আনন্দমেলা

২৩ বর্ষ ১৮ সংখ্যা ১৫ পৌষ ১৪০৪ ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৭

গো য়ে ন্দা ও র হ স্য উ প ন্যা স : বি শে ষ সং খ্যা

বছর শেষের ছুটিতে পড়ার জন্য 'আনন্দমেলা'-র এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল চারটি সম্পূর্ণ গোয়েন্দা ও রহস্য-উপন্যাস। লিখেছেন বিমল কর, সমরেশ মজুমদার, রমাপ্রসাদ বণিক ও ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়। বিমল করের কিকিরা, সমরেশ মজুমদারের গোয়েন্দা অর্জুন ও ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের পাণ্ডব গোয়েন্দার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় নতুন নয়। এবার নতুন সংযোজন রমাপ্রসাদ বণিকের উপন্যাস 'সাদা মিথ্যে'। এক অন্তর্ধান-রহস্যের সমাধানে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন কিকিরা। হঠাৎ-নিখোঁজ মানুষটি কি আত্মহত্যা করলেন ? কিকিরা কী সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন ? বিমল করের 'কৃষ্ণধাম কথা' গোয়েন্দা-উপন্যাসে আছে এসব প্রশ্নের উত্তর। সমরেশ মজুমদারের উপন্যাস 'আমি অর্জুন' অরণ্যের পটভূমিতে এক রহস্যঘন কাহিনী। এ ছাড়াও পাঠকদের জন্য রইল আরও আকর্ষণ অন্য দু'টি উপন্যাসে।

এই সংখ্যায় নিয়মিত কয়েকটি বিভাগ প্রকাশিত হল না। আগামী সংখ্যা থেকে বিভাগগুলি নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

স ম্পূ র্ণ উ প ন্যা স

কৃষ্ণধাম কথা বিমল কর ১৩
আমি অর্জুন সমরেশ মজুমদার ২২
সাদা মিথ্যে রমাপ্রসাদ বণিক ২৯
পাণ্ডব গোয়েন্দা ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৬৫

বি শে ষ প্র তি বে দ ন

আগামী ৫০০ বছরে কী ঘটতে পারে
অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় ৪

কা ছে - দূ রে

এবার এসে গেল সুগন্ধি ডালিয়া আশিস সরকার ১১

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

দিনদুপুরেই রাতদুপুর সমরেশ মজুমদার ৫
পাণ্ডব গোয়েন্দা ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৮

খে লা ধু লো

বিশ্বকাপে চমক দেখাবে ইরান নির্মল সেন ৭৩
ফিরে দেখা : ১৯৯৭ প্রতাপ জানা ৭৪

মা ধ্য মি কে র লে খা প ড়া

পদার্থবিদ্যা ৭৯ ইংরেজি ৮১ বাংলা ৮৩ ইতিহাস ৮৫

নি য় মি ত ক মি ক্ স

টিনটিন : আশ্চর্য উল্কা ৩২ অ্যাসটেরিক্স : দুই প্রধানে ধুন্ধুমার ৩৬ অরণ্যদেব ৪৪ টারজান ৪৮ ম্যানিটোবা জাহাজের রহস্য ৫২ ডাঃ রেক্স মর্গান ৫৬ গাবলু ৭৭ আর্চি ৭৮

ক বি তা

আনন্দে গান গাই দেবব্রত দত্ত ১০

শ ব্দ স ন্ধা ন

দেবসেনাপতি ৬

প্র চ্ছ দ

অনুপ রায়

আগামী আকর্ষণ
প্রচ্ছদকাহিনী

স্কুলে ভর্তির খোঁজখবর

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের গল্প
প্রতিরূপ

•

স ম্পা দ ক

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

এবিপি লিঃ-এর পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম ১৫ টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা, উত্তর-পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

বিশেষ প্রতিবেদন

কেমন হবে ভবিষ্যতের চেহারা ? জানিয়েছেন **অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়**

আগামী ৫০০ বছরে কী ঘটতে পারে

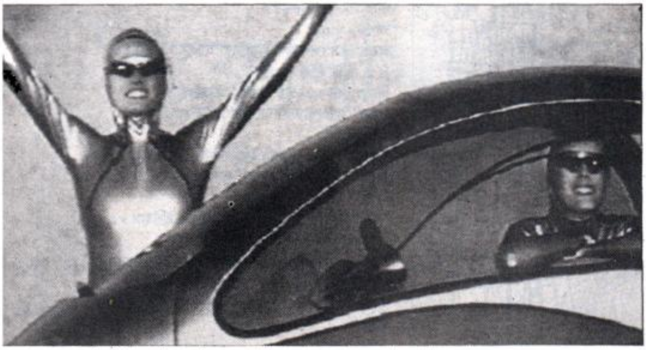

রেনো-র তৈরি বৈদ্যুতিক গাড়ি হতে পারে একুশ শতকের বড় চমক

মানুষের সরল বিশ্বাসে যা অতিপ্রাকৃত বা অতিদৈবিক বলে পরিচিত তেমনই বহু ঘটনার বাস্তব-বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জয়যাত্রা কখনও থেমে থাকেনি, থাকবেও না ভবিষ্যতে। এই শতাব্দীতেই, বিশেষ করে শেষভাগে, আমরা দেখেছি বিস্ময়কর সব কর্মকান্ড ! আগামী শতাব্দী এবং তার পরে ঘটতে পারে আরও বিস্ময়কর সব ঘটনা। সেইসব ঘটনার আগাম খবর দিয়েছেন বিজ্ঞানী ও গবেষকরা।

২০০০ : জিন প্রযুক্তির চূড়ান্ত অগ্রগতি। প্রচলিত পদ্ধতির 'ইমিউনোথেরাপি'র সঙ্গে 'জিনথেরাপি'র মিশ্রণে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে চিকিৎসকদের লড়াই জোরদার হয়ে উঠবে।

২০০১ : এক মিটার লম্বা, পাতলা একটি পরদাতেই দেখা যাবে টেলিভিশন অথবা ভিডিও অনুষ্ঠান। অথবা পছন্দমতো শিল্পকর্মের প্রদর্শনী। দেওয়ালেই ঝুলিয়ে রাখা যাবে ওই পরদা।

২০০৩ : আজকের দিনের 'মোবাইল' ফোনের আরও অগ্রগতি হবে এই সময়। সংলগ্ন ভিডিও ক্যামেরা এবং পরদার সাহায্যে বাড়িতে অথবা অফিসে, কথাবার্তা চালানোর অবসরেই দেখা যাবে সিনেমা ইত্যাদি। খেলা যেতে পারে রকমারি ভিডিও গেম, চালানো যেতে পারে কম্পিউটার।

২০০৫ : এসে গেল ভিডিও 'ভেকেশন' পোস্ট কার্ড ! পোস্টকার্ডের মাপের ভিডিও পবদায় ১০ সেকেন্ডের এক-একটি 'স্লট'-এ দেখা যাবে ছুটি কাটানোর চিত্তাকর্ষক জায়গাগুলির ছবি, সঙ্গে অবশ্যই সুন্দর ধ্বনি ও সঙ্গীত।

২০০৫ : পাওয়া যাবে আশ্চর্য এক 'কন্টাক্ট লেন্স'। চোখের মণির ওপর লাগিয়ে নেওয়ার পরে, এমনকী চোখ বুজেই, পড়ে নেওয়া যাবে 'ই'-মেলের লেখা, অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া যাবে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (W.W.W.) -এর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায়।

২০০৬ : নির্মাণকাজে ব্যবহারের জন্য যেসব ধাতু প্রয়োজন, সেগুলি এখন অনেক বুদ্ধিমান, অনেক বেশি স্মার্ট ! অতিরিক্ত বোঝা বা চাপ আসছে কি না, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বোঝার জন্য তাদের অণুতেই লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে দুরন্ত সব 'সেন্সর'। ওইসব সেন্সরের মাধ্যমে তারা প্রতিনিয়তই পাঠাতে থাকবে তথ্য।

এই বছরেই পাওয়া যাবে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত পোশাক। 'স্মার্ট তন্তু' থেকে তৈরি ওই পোশাক প্রচন্ড গরমের সময় দেবে শীতল অনুভূতি আর শীতে উষ্ণ আরাম।

২০০৭ : মোটরগাড়িতে আসবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। চালক ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই চালাতে পারবেন গাড়ি। সামনে-পেছনে অন্যান্য গাড়ির সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ এড়ানোর জন্য থাকবে 'অ্যান্টি কলিশন রাডার', সামনের রাস্তা বরাবর দৃষ্টিকে আরও বেশি স্বচ্ছ করার জন্য থাকবে 'থার্মাল ইমেজিং সিস্টেম'। কম্পিউটার তো আছেই, আর আছে উপগ্রহনির্ভর স্বয়ংক্রিয় 'গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম'।

২০১০ : পোষা কোনও প্রাণী নয়, বাজারে এসে গেল 'রোবটিক পেট'। যন্ত্রচালিত এবং কম্পিউটার মস্তিষ্কের এইসব রোবট প্রাণী তার প্রভুর মুখ চিনতে পারবে, বুঝতে পারবে তার গলার আওয়াজ। অক্ষরে-অক্ষরে প্রভু বা মনিবের নির্দেশ পালন তো আছেই।

২০১৫ : যে কোনও ধরনের অসুখের জন্য দায়ী বংশগতির ধারক-বাহক মৌল জিনকে শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

২০১৬ : শুধু কণ্ঠস্বরই নয়, টেলিফোনের কেব্‌ল বাহিত হয়ে ব্যক্তির পূর্ণদৈর্ঘ্যের প্রতিমূর্তিও পৌঁছে যাবে বার্তা গ্রাহকের সামনে ! এটা সম্ভব হবে 'হলোগ্রাফি' প্রযুক্তির সাহায্যে।

২০১৭ : ২০৪৪ - সাল নাগাদ পাকাপাকিভাবে মঙ্গল গ্রহে যে কলোনি গড়ে উঠবে, তার প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে প্রথম মানুষটি অবতরণ করবেন ওই গ্রহে।

২০২০ : এক হাজার মানুষ বহন করে ঘন্টায় প্রায় ৯০০ কিলোমিটার গতিবেগে উড়ে ৯০০০ কিলোমিটার দূরত্ব 'নন স্টপ' পাড়ি দেবে বিমান।

২০২৫ : সরাসরি মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কম্পিউটার মানুষের চিন্তাধারার সঙ্গী হয়ে উঠবে।

২০৩০ : কৃত্রিম ফুসফুস, কিড়নি এবং লিভার এর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে চিকিৎসকরা এবার কৃত্রিম পা এবং স্বনির্ভর চোখ তৈরিতে উদ্যোগী। এ ছাড়াও শীতের ছুটি কাটাতে মহাশূন্যের সুদূর কোনও জায়গায় ভ্রমণের আয়োজন করা হবে।

২০৪০ : 'নিউক্লিয়ার ফিউশন' পদ্ধতিতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন শুরু।

২০৪৪ : অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে হয় এমনই ছোট রোবট তৈরি হয়ে যাবে।

আ - র - ও বহু বছর পরে

২৫০০ : মানুষের বর্তমান গড় আয়ু ৭৮ বছর বেড়ে দাঁড়াবে ১৪০ বছরে !

'টাইম' পত্রিকার সৌজন্যে

ধারাবাহিক উপন্যাস

দিনদুপুরেই রাতদুপুর

সমরেশ মজুমদার

আঠারো

মারিও ওদের বজরার ভেতরে নিয়ে গেল।

একটা সুন্দর সাজানো ঘর। কার্পেটে মোড়া। ঘরের এক কোণে সোফায় যে মহিলা বসে আছেন তিনি অত্যন্ত স্ফীতকায়া। এককালে যে সুন্দরী ছিলেন, তা মুখের আদলে বোঝা যায়। পরনে দামি স্কার্ট, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। এই সময় একটা শব্দ পেছন থেকে কানে আসতে অর্জুন অবাক হয়ে ফিরে তাকাল। শব্দটা বেরিয়েছে মেজরের দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে ঢাকা মুখ থেকে, "হা! ম্যাডাম মন্টেগোমারি।"

মহিলার চোখ ছোট হল। তারপর বিচিত্র অভিব্যক্তি ফুটে উঠল মুখে। একগাল হেসে তিনি সস্নেহে চিৎকার করলেন, "ও মাই ডিয়ার মেজর! হোয়াট এ সারপ্রাইজ!" বলতে- বলতে তিনি দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন সোফায় বসেই।

সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে গেলেন মেজর, "আই কান্ট বিলিভ। পৃথিবীটা কি ঠিকঠাক ঘুরছে?" বলতে বলতে মহিলার হাত দুটো ধরে নিজের দাড়ি-গোঁফের ওপর চেপে ধরলেন। সঙ্গে-সঙ্গে মহিলা খিলখিল করে হেসে উঠলেন। সে হাসি আর থামতে চায় না। মেজর একটু হকচকিয়ে বললেন, "ওঃ, আপনি ঠিক আগের মতো আছেন।"

"সুড়সুড়ি— ওঃ— কী সুড়সুড়ি— মরে যাব। আমার দুষ্টু তপসে মাছ। হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলেন মেজর?" হাসি শেষপর্যন্ত সামলাতে পারলেন তিনি।

মেজর বললেন, "বলছি, বলছি। এই বজরা আপনার?"

"আর কার হবে? আমাদের মন্টেগোমারি ফ্যামিলির ফ্ল্যাগ দ্যাখেননি? ওটা নিশ্চয়ই ওপরে উড়ছে।" ম্যাডাম সোজা হয়ে বসলেন।

"ওহো। লক্ষ করিনি। আসলে জলে ভিজে—।"

"হ্যাঁ, বিশ্রীরকমের ভিজে গিয়েছেন আপনারা।" ম্যাডাম হাততালি দিতেই ভেতরের দরজায় একটি প্রৌঢ় এসে দাঁড়াল, "জন, এদের দু'জনকে শুকনো পোশাক দাও। আর বজরা ছেড়ে দিতে বলো।"

"আমরা কোনদিকে যাব ম্যাডাম?"

"নিউ জার্সি।"

জনের পেছন-পেছন ওরা পোশাক ছাড়ার ঘরে এল। জন বলল, "সার, আমার স্টকে আপনাদের মানাবে এমন কোনও শার্ট-প্যান্ট নেই। তবে দুটো আলখাল্লা আছে। আপনাদের জামা-প্যান্ট যতক্ষণ না শুকোচ্ছে ততক্ষণ কি ওটা পরে থাকতে অসুবিধে হবে?"

মেজর বললেন, "আলখাল্লা? চমৎকার!"

আলখাল্লা দুটো দিয়ে জন চলে গেলে বজরা দুলে উঠল। অর্জুন পোশাক পালটাতে-পালটাতে জিজ্ঞেস করল, "আপনার সঙ্গে অনেকদিনের আলাপ?"

"অফ কোর্স। নাইনটিন সেভেনটি টু। আমি স্থির করেছিলাম প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় যেসব ঝিনুকে মুক্তো পাওয়া যায় তাদের মুভমেন্ট দেখব। বুঝতেই পারছ বেশ খরচসাপেক্ষ ব্যাপার। আমাদের অভিযাত্রী সঙ্ঘ থেকে আবেদন করা হয়েছিল সাহায্যের জন্য। সেই সময় এডওয়ার্ড আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে।"

"এডওয়ার্ড কে?"

"ওঃ। এডওয়ার্ড হল ম্যাডামের ভাই। যেমন মোটা তেমনই জমাটি লোক। বলল, টাকা-পয়সা নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না তবে ও আমাদের সঙ্গে যেতে চায়। উটকো লোককে সঙ্গে নেওয়া ঠিক নয় বলে প্রথমে আমি রাজি হইনি। তারপর অন্য সবার চাপে রাজি হতে হয়। তা আমরা যখন প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজ দাঁড় করিয়ে রেখে কাজ শুরু করেছি ঠিক তখন আর-একটা বড় লঞ্চে সেখানে হাজির হন ম্যাডাম। এডওয়ার্ড তাঁর একমাত্র ভাই, যদি জলে কোনও বিপদ হয় তাই তিনি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। অথচ এডওয়ার্ড ফিরে যাবে না। শেষপর্যন্ত সদ্য তোলা একটা ঝিনুকের বুক থেকে পাওয়া দারুণ মুক্তো আমি ম্যাডামকে উপহার দিই। সেটা পেয়ে উনি খুব খুশি হন। আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নেন যে আমি ওঁর ভাই-এর দেখাশোনা করব। তারপর আমাদের বেশ দেখাশোনা হত। হঠাৎ কাগজে পড়ি এডওয়ার্ড অতি ওজনের জন্যে মারা গিয়েছে। মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমি আর যোগাযোগ রাখিনি।"

"কিন্তু উনি তো আজ ভাইয়ের কথা কিছু বললেন না?"

"তাই তো দেখলাম। উনি বললেন না বলে আমিও জানতে চাইলাম না। হয়তো ওই প্রসঙ্গ উঠলে ওঁর মনখারাপ হয়ে যাবে।"

সাজগোজ করে ওরা আবার ম্যাডামের সামনে গিয়ে বসল। তখন বজরা চলছে। দূরে স্থলভূমি সরে-সরে যাচ্ছে। মেজর অর্জুনের পরিচয় দিলেন।

ম্যাডাম চোখ তুললেন, "তাই নাকি? তুমি এই বয়সে ওসব করো?"

মেজর বললেন, "ও কিন্তু অনেকদিন ধরেই করেছে। এখন বিখ্যাত।"

"আমি তোমাকে একটা কেস দিতে পারি।"

"বলুন।"

"কেসটা শুনে হয় বলবে পারবে, নয় পারবে না। আমি স্পষ্ট শুনতে পছন্দ করি।" ম্যাডাম জানলা দিয়ে জলের দিকে তাকালেন। তীরভূমি

শব্দসন্ধান

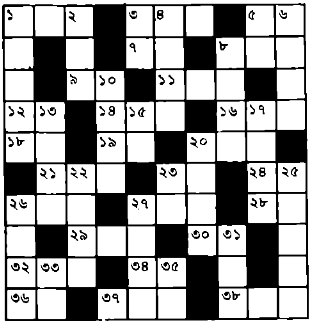

সঙ্কেত : পাশাপাশি : (১) দুর্যোধনের মাতামহ, শকুনির পিতা। (৩) দোকান। (৫) খই। (৭) অত্যন্ত। (৮) পালোয়ানদের লড়াইতে কুস্তির—সরগরম। (৯) কোকিলের — মধুর। (১১) উপাধান। (১২) ছোঁ মেরে নিতে এ-পাখি ওস্তাদ। (১৪) চিঠির বস্তা নিয়ে যে ছোটে। (১৬) শরবতে গোলাপের — দেওয়া। (১৮) তীর, কূল। (১৯) পুস্তক। (২০) — কেটে বসত করি। (২১) নুন আনতে ভাত —। (২৩) ধর্মে যেন — থাকে। (২৪) মরা — লাখ টাকা। (২৬) যা মনে জন্মায়। (২৭) পাতা। (২৮) রাত্রির কোমল রূপ। (২৯) গলা সাফ করার শব্দ। (৩০) ক্ষতির বিপরীত। (৩২) গদাধর শব্দ আদরার্থে। (৩৪) মান্য, সম্মানার্হ। (৩৬) তপস্যা। (৩৭) কপি। (৩৮) রক্তশূন্য।

উপর-নীচ : (১) ভালভাবে বাছাই করা। (২) ঢেউ। (৩) প্রভা, দীপ্তি। (৪) সংসার। (৫) — কথার এক কথা। (৬) পরস্পর বেষ্টন। (৮) — গ্রামের লোকেরা শহরের ফুটপাথে আশ্রয় নিয়েছে। (১০) চিরকাল। (১৩) গাছের ডালে — প্রাণহীন দেহ হাওয়ায় দুলছে। (১৫) 'দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে আমার সময় আর —।' (১৭) যে পথের দিশা হারিয়েছে। (২০) বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে এ-বিদ্যা ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর ও শক্তিলাভের জন্য শিখিয়েছিলেন। (২২) ওস্তাদের — গলার গান ভয়ঙ্কর। (২৩) কুস্তিগির। (২৫) অতিশয় বিরক্ত। (২৬) দারোগার — অভিপ্রায় বুঝতে পারলাম। (২৭) মাপ। (৩১) ভাঁড়ে মা —। (৩৩) অহঙ্কার। (৩৫) জল।

গত সংখ্যার সমাধান

দি	বা	ক	র		ক	ম	লা	লে	বু
য়া			হি	মে	ল		ল		ল
শ	র	ব	ত		র	ম্ভা			বু
লা		দ		খু	ব		কা	ক	লি
ই		মে	য়া	দ			মা	থা	
	সো	জা			ন	শ্ব	র		ট
আ	না	জ		সু	ত		শা		হ
ন			ঘ	র		কো	লা	হ	ল
কো		প্রী		লো	পা	ট			দা
রা	জ	তি	ল	ক		র	ক্তা	ম্ব	র

দেবসেনাপতি

দূরে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ তারা আটলান্টিক সিটি থেকে বেরিয়ে আসছে। অর্জুন কাছেপিঠে মারিওকে দেখতে পেল না। সে বলল, "আপনি স্পষ্ট উত্তরই পাবেন।"

"আমার ভাইয়ের নাম এডওয়ার্ড। মেজর তাকে চেনেন। গত বছর কাগজে বেরিয়েছিল বেশি খেয়ে ওজন বেড়ে যাওয়ায় এডওয়ার্ড মারা গিয়েছে।"

"হ্যাঁ। আমি খবরটা পড়েছি।" মেজর বললেন।

"কিন্তু সে মারা যায়নি।" ম্যাডাম গম্ভীর মুখে বললেন।

"সে কী!" মেজর অবাক!

"তাকে বাঁচিয়ে রাখতে মেরে ফেলতে হয়েছে। ব্যাপারটা খুলে বলি। আমার ভাইয়ের সমস্যা হল সে কিছুতেই ওজন কমাতে পারছে না। অবশ্য সে তার জন্যে ব্যায়াম বা ডায়েটিং করতে নারাজ। বিভিন্ন রকম ওষুধ খেয়ে সে ওজন কমাবার চেষ্টা করছিল। এই সময় তাকে কেউ বলে আফ্রিকায় একধরনের প্রাকৃতিক চিকিৎসা আছে যা করালে হু হু করে ওজন কমে যায়। সেই শুনে সে আফ্রিকায় গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে একজন আফ্রিকান ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ওই ভদ্রলোক নাকি তাকে রোগা করে দেবেন। কিন্তু আমরা দেখলাম লোকটার দেওয়া শেকড় খেয়ে ওর মস্তিষ্ক স্থির থাকছে না। ভদ্রলোক ওকে দিয়ে যা ইচ্ছে করাতে পারতেন। এমনকী আমাদের পারিবারিক সম্পত্তিও ওকে লিখে দিতে বলেন। আমি ভদ্রলোককে শাসানোর পর ওর ওপর দু'বার হামলা হয়। টেলিফোনে শাসানো তো ছিলই। শেষপর্যন্ত ও আমাকে প্রস্তাব দেয় ওকে মৃত বলে ঘোষণা করতে। ফিনল্যান্ডে গিয়ে আমরা ওকে একটা নির্জন স্যানাটোরিয়ামে রেখে আসি। ও মারা গেছে জানার পর ওরা শান্ত হয়ে যায়। আমার ভয় ওরা ওকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে নিয়েছে। এখন পর্যন্ত কেউ কোনও দাবি করেনি কিন্তু আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। তুমি কি সত্যিটা জানতে পারবে?"

"আমি চেষ্টা করব।"

"বেশ। খরচের কথা ভেবো না। আমি সেই লোকটার নাম ঠিকানা দেব।"

"কিছু মনে করবেন না, ওই আফ্রিকান বিশেষজ্ঞের নাম কি মিস্টার আলাম্বা?" অর্জুন সরাসরি প্রশ্ন করল।

"মাই গড! তুমি জানলে কী করে?" চোখ বড় হয়ে গেল ম্যাডামের।

মেজর তখন সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। ওরা যে প্রাণ হাতে করে মারিও-র সঙ্গে পালিয়ে এসেছে তা জানার পর ম্যাডাম বললেন, "তোমরা খুব ভাগ্যবান। মাফিয়াদের ভয় করে না এমন কেউ আমেরিকায় নেই। ওদের ওপর মারিও-র রাগ আছে। তাই তোমরা বেঁচে গেলে। কিন্তু মিস্টার আলাম্বার সঙ্গে ওদের কোনও সম্পর্ক নেই বললে?"

"হ্যাঁ। এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তা ছাড়া আমরা গাড়িতে আছি ভেবে ওরা মিস্টার আলাম্বার মেয়ের গাড়িটাকে টার্গেট করেছিল। নিরপরাধ মেয়েটি আর এক ভদ্রমহিলা সেই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন।"

ম্যাডাম কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কী চাও? ওদের সঙ্গে লড়াই করতে তোমরা পারবে না।"

মেজর বললেন, "কিন্তু ওদের শাস্তি দেওয়া উচিত।"

ম্যাডাম বললেন, "ওপাশে একটা শোওয়ার ঘর আছে। তোমরা ওখানে বিশ্রাম করো। একটা মোটর বোটের আওয়াজ পাচ্ছি। তোমাদের কেউ দেখে ফেলুক তা আমি চাই না।"

জন ওদের নিয়ে গেল ভেতরে। ততক্ষণে জামাপ্যান্ট শুকিয়ে ভাঁজ করে রেখেছে বজরার লোকজন। পোশাক বদলে নিল ওরা। এমনকী যে জুতোজোড়া ভিজে সপসপ করছিল তা এখন খটখটে।

মেজর বললেন, "আর চিন্তা করে কোনও লাভ নেই। আমি একটু বিশ্রাম নিচ্ছি।" ভদ্রলোক সরু বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলেন।

অর্জুন শুনল মোটরবোট বজরার পাশে এসে থামল। কে এসেছে জানার কৌতূহল হচ্ছিল খুব। কিন্তু এখান থেকে বের হলে বিপদ ডেকে আনবে সে। কী করা যায়? অর্জুন ভাবছিল। সুধামাসি যদি এখন মেয়ের কাছে আরও কিছুদিন থেকে যান তা হলে সে স্বচ্ছন্দে দেশে ফিরে যেতে পারে। লকেটটা হাতছাড়া না করে জলপাইগুড়িতে ফিরে গিয়ে ওটাকে না হয় অমলদার বাগানের মাটিতে পুঁতে দেবে সে। এখানে তার কোনও সমস্যা সমাধানের দায় নেই। দায়ের কথা ভাবতেই মনে হল সে একটু আগে ম্যাডামকে কথা দিয়েছে তাঁর ভাইয়ের ব্যাপারটা সমাধান করতে চেষ্টা করবে। কী করা যায়?

হঠাৎ তার খেয়াল হল। ভেজা জামাপ্যান্ট ছাড়ার সময় সে মোজা খুলেছিল। মোজার মধ্যে লকেটটাকে রেখেছিল সে। সে দেখল জুতো আছে কিন্তু মোজা নেই। মেজরের মোজা কিন্তু ঠিকঠাক রয়েছে।

সে দ্রুত দরজা খুলে প্যাসেজে উঁকি মারল। কোনও লোকজন নেই যেখানে ওরা জামাপ্যান্ট বদলেছিল, সেখানে পৌঁছে দেখল মোজা বা লকেট পড়ে নেই। নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজের ওপর রেগে যাচ্ছিল অর্জুন। সে ওপাশে উঁকি মারল। এটা রান্নাঘর। সেখানে একজন কোরিয়ান যুবক রান্না করছে। আর তার বুকে লকেটটা ঝুলছে। খাবার ট্রেতে সাজিয়ে লোকটা ঘুরে দাঁড়াতেই চোখাচোখি হল। যুবকটি বলল, "ফর দি নিউ গেস্ট সার।"

অর্জুন হাত বাড়াল। যুবক অবাক! অর্জুন এগিয়ে এসে ওর গলা থেকে লকেটটাকে খুলে নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল। এবং তখনই মারিও এল, "ওরা এসেছে!"

"কারা?"

"মাফিয়াদের লোক। জিজ্ঞেস করছে তোমাদের ম্যাডাম দেখেছেন কিনা! ম্যাডাম অস্বীকার করেছেন। ওরা খেতে চাইল, খাবার দেওয়া হয়েছে।"

অর্জুনের মনে হল সে বেঁচে গেছে। আর একটু পরে লকেটের খোঁজ করতে গেলে ওরা কোরিয়ান যুবকের গলায় ওটাকে দেখতে পেত। ব্যস। কয়েক মুহূর্ত লাগত ওদের আবিষ্কার করতে।

একটু বাদে মোটর বোটের শব্দ হল। ওরা যে চলে গেল তা বোঝা যাচ্ছে। মারিও বেরিয়ে গেলে অর্জুন খাটে শুয়ে পড়ল। মেজর এখন প্রচণ্ড শব্দে নাক ডেকে চলেছেন।

নিউ জার্সির এক স্টিমারঘাটায় বজরা যখন পৌঁছল তখন মধ্যরাত। ম্যাডাম প্রচণ্ড সাজগোজ করে বজরা থেকে নামলেন। জন এবং মারিয়া ওঁর জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে পেছনে। অর্জুন আর মেজর সবশেষে। একটি লিমুজিন দাঁড়িয়ে আছে সামনে। ম্যাডাম বললেন, "আমার মনে হয় এখান থেকে একসঙ্গে যাওয়াই ভাল।"

ওরা গাড়িতে উঠল। ম্যাডাম জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা এখন কোথায় যাবেন?"

মেজর বললেন, "কুইন্সে।"

"কিন্তু ওখানে তো আপনাদের জন্যে ওরা অপেক্ষা করতে পারে।"

মেজর অর্জুনের দিকে তাকালেন। অর্জুন বলল, "ঠিকই। ক'দিন আমাদের গা-ঢাকা দিয়ে থাকা উচিত। ওরা একটু ভাবুক।"

ম্যাডাম বললেন, "আমার একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে কুইন্সে। ওয়েল ফার্নিস্‌ড। সেখানে থাকতে পারো তোমরা। পোশাক নিয়ে সমস্যা হতে পারে। ক্রেডিট কার্ড দেখিয়ে মেজর সেসব কিনে নিতে পারেন।"

মিনিট পঁয়তাল্লিশ পরে ম্যাডাম মারিওর হাতে চাবি দিয়ে একটা সম্ভ্রান্ত অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সামনে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। যাওয়ার আগে ওঁর কার্ড অর্জুনের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "টাকার জন্যে ভেবো না। কাজটা যদি করতে পারো ওটার সমস্যা হবে না।"

রাত তখন আড়াইটে। মেজর ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বললেন, "আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল! চলো জামাপ্যান্ট কিনে আনি।"

"সে কী? এই রাতে!"

"এখানে একটা দোকান সারারাত খোলা থাকে।"

"ওটা আগামীকাল করবেন। প্লিজ।"

ম্যাডামের এই খালি অ্যাপার্টমেন্ট বেশ সুন্দর। গোটা পাঁচেক ঘর এবং ফ্রিজভর্তি খাবার আছে। যদিও ওরা ডিনার বজরাতেই করে গিয়েছিল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এখান থেকে আপনার ফ্ল্যাট কতদূর?"

জামা ছাড়তে-ছাড়তে মেজর বললেন, "এক কিলোমিটার।"

"মারিওকে ঠিকানাটা বলে দিন। আর চাবিটা।"

"কেন? তুমি কি সেখানে যাবে?"

"আপনার ফ্ল্যাটে যাব না।"

"সর্বনাশ! শুনলে না, ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে।"

"ওরা দেখতে পাবে না।"

"আমি তোমার সঙ্গে যাব?"

"না। আপনি সঙ্গে থাকলে ধরা পড়ে যেতে পারি।"

"তুমি আমাকে আন্ডার এস্টিমেট করছ অর্জুন!"

"না। আপনার চেহারা লুকোতে পারবেন না। বরং এখন এখানে বিশ্রাম নিন। আমি ভোরের আগে ঘুরে আসব।"

ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে অর্জুন মারিয়াকে বলল, "তুমি এখানে অপেক্ষা করো। আমি জায়গাটা চিনতে পেরেছি।"

(ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

ধারাবাহিক উপন্যাস

পাণ্ডব গোয়েন্দা

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

আটত্রিশ

নিশা বলল, "আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে শাক্যবংশের যে রাজকুমার এখানে এসে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন সেই গৌতম বুদ্ধের চরণতলে। সেখানে তাঁর চরণে মাথা রেখে আমার সব কথা আমি তোমাকে খুলে বলব। তারপর স্থির করব কীভাবে কী করা যাবে।"

"এটাই তো বুদ্ধগয়া। এইখানেই সেই বোধিবৃক্ষ আছে না?"

"হ্যাঁ। ওই, ওই দ্যাখো সেই গাছ। আমরা ওই জায়গাটা থেকে আরও একটু এগিয়ে যাব।"

আরও এগিয়ে যাওয়ার পর থাই মন্দির, জাপানি মন্দির অতিক্রম করে সেই ঘনান্ধকারে ওরা এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছল যেখানে আসামাত্রই অভিভূত হয়ে গেল বাবলু। দেখল এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সুবিশাল ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তি নীল আকাশের নীচে বিরাজ করছেন। তাঁর দু'পাশের দুই সারিতে আছেন অন্য বৌদ্ধ শিষ্য ও শ্রমণরা। সেগুলিও বিশাল। কী সুন্দর পরিবেশ সেখানকার। তবে জায়গাটা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। লোহার একটি গেট আছে। সেটিও তালা দেওয়া।

নিশার নির্দেশে বাবলু সেই গেটের মাথায় উঠে হাত ধরে টেনে তুলল নিশাকে। তারপর ওকে নিয়ে ধীরে-ধীরে পৌঁছে গেল সেই বুদ্ধমূর্তির পদতলে।

শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, বিস্ময়ে, আনন্দে ওর মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল। নিজের অজান্তেই কখন যেন ও বিড়বিড় করে উচ্চারণ করে ফেলল, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ধর্মং শরণং —।"

নিশা সেই বুদ্ধমূর্তির পদতলে উপুড় হয়ে কী কান্নাটাই না কাঁদল। বেশ কিছুক্ষণ কেঁদে নিজেকে হালকা করে বলল, "ফ্রেন্ড, আমাকে এখানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমি আমার ভাগ্যদোষে অপরাধ জগতের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছি যে ওই মহাযোগীর করুণা ছাড়া আমার মুক্তির আর অন্য কোনও পথ নেই।"

বাবলু বলল, "তুমি কি ইচ্ছে করলে এই পথ থেকে ফিরে আসতে পারো না?"

"পারি। যদি তোমার মতো কোনও বন্ধু আমার পাশে এসে দাঁড়ায়।"

"আমার মতো কেন? আমিই দাঁড়াতে রাজি আছি। আগে তোমার ব্যাপারে সবকিছু জানি, শুনি, তবে তো?"

নিশা এবারে হাঁটু দুটো মুড়ে একটু টান হয়ে বসল। তারপর বলল, "বুকের পাঁজরে আর মাথায় লেগেছে খুব। যাই হোক, হয়তো সামলে নেব। তুমি কিন্তু মন দিয়ে আমার কথা শোনো।"

বাবলু বলল, "বলো।"

নিশা বলতে লাগল, "নালন্দার মেয়ে আমি। কাজেই গৌতম বুদ্ধের একটি পুণ্য প্রভাব আমার মনের মধ্যে সুপ্ত আছে। তবে কিনা মানুষ তো পরিস্থিতির দাস। আমিও তাই। একবার বক্তিয়ারপুরের কাছে মোটর দুর্ঘটনায় আমার বাবা-মা দু'জনেই মারা যান। ইতিমধ্যে কিছু দুষ্টলোক এসে ভর করে আমার ওপর। তারা আমাকে দিয়ে নানারকম খারাপ কাজ করিয়ে নেয়। আমার মতো আরও কয়েকজন মেয়েকে দিয়ে তারা লোকের পকেট কাটতে বাধ্য করায়। ওরাই আমাকে বন্দুক, রিভলভার ধরতে শেখায়। সাইকেল, স্কুটার, মোটরও চালাতে শেখায়। প্রথম-প্রথম এইসব বাজে কাজ করতে আমার মন সায় দিত না। পরে বুঝলাম আমার বা আমাদের মতো মেয়ের বেঁচে থাকার জন্য এ ছাড়া আর বিকল্প কোনও পথই নেই। তখন থেকেই আমি মনে-মনে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করি। পরে একদিন সুযোগ বুঝে ওই দুষ্কৃতীদের কয়েকজনকে খুন করে কোডারমার জঙ্গলে গা-ঢাকা দিই। কিছুদিন লুকিয়ে থাকার পর বুদ্ধগয়ায় এসে ওই পুরনো বাড়িটা জলের দামে কিনে ওই মেয়েদের কয়েকজনকে নিয়ে মেয়ে পকেটমারের একটা দল করি। কোডারমায় থাকার সময় প্রিন্সের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। একটা সেকেন্ডহ্যান্ড মারুতি উনি আমাকে উপহার দেন। আমি ওঁর স্কাল ডেলিভারির ব্যাপারে একটা কমিশনভিত্তিক কাজে লেগে পড়ি। উনি আমাকে দারুণভাবে উৎসাহ দেন। ওঁর মুখেই দিনকয়েক আগে তোমাদের ব্যাপারে সব শুনি। তোমাকে কেউ জ্যান্ত ধরে দিতে পারলে উনি পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত উপহার দেবেন এমন কথাও বলেন। আমি বহুদিন ধরে স্বপ্ন দেখছিলাম বুদ্ধগয়ায় একটা টুরিস্ট লজ গড়ে তোলবার। কেননা এখানে যে হারে যাত্রী আসে তাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকার ফলে রাত্রিবাস করেন খুব কম লোকই। তাই ভেবেছিলাম ওই কাজটা করে উঠতে পারলে আমার এই পাপের

ব্যবসা ছেড়ে দেব। মেয়েগুলোও আমাকে অবলম্বন করে সৎভাবে বাঁচতে পারবে।"

বাবলু বলল, "চমৎকার! তবে আমার জন্য প্রিন্স এত টাকা অফার করলেন কেন?"

"আরে বোঝো না কেন? এটা ওঁর জেদ। বিয়ে-থা করেননি, কিছু না, শুধু সোনা পাচার, হিরে পাচার, নিষিদ্ধ ড্রাগ পাচার এইসব করে বেড়ান। ছেলেবেলায় একবার এক সামান্য অপরাধের শাস্তি হিসেবে ওঁর গ্রামের মুখিয়া গ্রামবাসীদের নিয়ে ওঁর মাথায় জুতো মেরে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই রাগে উনি পরবর্তীকালে সেই মুখিয়াকে ধরে এনে জুতো পেটা করে মেরে ফেলেন। বিশেষ করে ওঁর নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি চালানের মাধ্যম হিসেবে ওই মাথার খুলিটাকেই উনি বেছে নেন।"

বাবলু বলল, "তা হলে বলছ আমাকে প্রিন্স-এর হাতে তুলে দিতে পারলে তুমি পাঁচ লাখ টাকা পাবে?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু তোমাকে সৎভাবে বেঁচে থাকতে গেলে প্রিন্স-এর সংস্পর্শ তো ছাড়তে হবে। উনি কি তাতে রাজি হবেন?"

"না। সেইজন্যই তোমাকে চাই। আসলে আমি একা তো ঠিক সুবিধে করতে পারব না। কিন্তু আমরা দু'জনে এক হলে ওর অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসতে পারে।"

"আমি রাজি।"

"কিন্তু একটা কথা। কোনওরকমেই তুমি কিন্তু ওকে তোমার পুলিশ বন্ধুদের হাতে তুলে দিতে পারবে না। তা হলে আমাকেও জেলের ঘানি টানতে হবে; সোনা, টাকা সবই হাতছাড়া হয়ে যাবে আমাদের।"

বাবলু বলল, "আমি বাংলার ছেলে। সেখানকার পুলিশই আমার বন্ধু। কিন্তু এখানে কেউ-ই চেনে না আমাকে।"

"তা হলে ওই কথাই রইল? এখন আমাকে শুধু ঘণ্টাখানেক রেস্ট নেওয়ার সময় দাও। এই সময়টুকুর জন্য একটু ঘুমিয়ে নিই আমি। ঠিক এক ঘণ্টা পরে আমাকে ডাকবে।"

"বুঝব কী করে? এখানে তো ঘড়ি নেই।"

"আমার হাতে আছে, এটা দেখে রাখো।"

নিশা সেই গভীর নিশীথে অন্ধকারে ঘাসের গালিচায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে বাবলু বুদ্ধমূর্তির চারপাশে ঘুরে পায়চারি করতে লাগল। আর ভাবতে লাগল, কোনওরকমে একবার প্রিন্সের গোপন ঘাঁটিতে গিয়ে ঢুকতে পারলে...।

ঠিক এক ঘণ্টা পরে নিশা নিজেই উঠে পড়ল ঘুম থেকে। বলল, "কী হল ফ্রেন্ড, তোমাকে না বলেছিলাম ডেকে দিতে?"

"আসলে তুমি যেভাবে ঘুমোচ্ছিলে, তাতে—।"

"কে বলল আমি ঘুমোচ্ছিলাম? ঘুমনোর ভান করে পড়ে ছিলাম আমি। পরীক্ষা করছিলাম তোমাকে। লক্ষ রাখছিলাম তুমি পালাবার চেষ্টা করো কিনা। যাকে বিশ্বাস করলাম সে কতটা নির্ভরযোগ্য সেটাও একবার বাজিয়ে দেখতে হবে তো?"

বাবলু হেসে বলল, "কিন্তু ধরো যদি পালাতাম?"

"তা হলে...।" বলেই কোমরের খাপ থেকে পিস্তলটা বের করল নিশা।

বাবলু বলল, "ওরেব্বাবা!"

নিশা বলল, "আর দেরি নয়, অনেক সময় পার হয়ে গেছে। এখনই তো তিনটে বাজে। বুদ্ধগয়া জেগে উঠবে এবার। পথ চললেও কেউ সন্দেহ করবে না।"

"আমরা এখন কোথায় যাব?"

"পাহাড়পুরের জঙ্গলে। প্রিন্সের লালকুঁয়ার ঘাঁটিতে।"

"তোমার শারীরিক অবস্থা?"

"খুবই খারাপ। তবে সামলে নিয়েছি একটু। এখন না গেলে চারটে পঁচিশের ট্রেনটা আমরা পাব না। তুমি স্কুটার চালাতে পারো?"

"পারি।"

"তা হলে ভালই হল। তুমিই আমাকে ক্যারি করে নিয়ে যেতে পারবে।"

"এখানে তোমার স্কুটার আছে?"

নিশা হাসল। কিছু বলল না।

ওরা সেই গেট পার হয়ে তিব্বতি ধর্মশালার কাছে একটা মেডিসিনের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর টক-টক শব্দ করতে একটি ছেলে বেরিয়ে এসে নিশাকে দেখেই চমকে উঠে বলল, "আরে নিশা, তুম!"

নিশা ঠোঁটে আঙুল রেখে হিস্‌স করে একটা শব্দ করল। তারপর দোকানে ঢুকে গোটা দুই ট্যাবলেট খেয়ে কিছুক্ষণের জন্য ওর স্কুটারটা ধার চাইল।

ছেলেটি কোনওরকম আপত্তি না করে স্কুটারের চাবিটা দিয়ে দিল নিশাকে।

নিশা বলল, "গয়ারাম কি দুকানমে রহেগা।"

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে পাশের গলিতে রাখা স্কুটারটি নিয়ে গয়ার দিকে এগিয়ে চলল ওরা। নিশাকে পেছনে বসিয়ে দ্রুত স্কুটার নিয়ে চলল বাবলু। মানেকার কথা মনে হল একবার। মেয়েটা কি পালাতে পেরেছে? না ধরা পড়ে গেছে ওদের হাতে? কে জানে?

কিছু সময়ের মধ্যেই ওরা গয়া স্টেশনে পৌঁছে গেল। এত ভোরেও জমজম করছে স্টেশন। স্কুটার গয়ারামের চায়ের দোকানে রেখে ওরা ঢুকে পড়ল স্টেশনের মধ্যে।

বাবলু বলল, "এ কী! টিকিট কাটা হল না তো?"

নিশা বলল, "আমাদের টিকিট লাগে না দোস্ত।"

"তোমাদের না লাগলেও আমার লাগে।"

নিশা চোখের পলকে বেরিয়ে গিয়ে একটা টিকিট কেটে এনে বাবলুকে দিল।

বাবলু বলল, "তোমার?"

"বললাম তো আমাদের টিকিট লাগে না।"

"এই তোমার সৎ হওয়ার নমুনা?"

নিশা জিভ ভেংচে বলল, "সরি পাণ্ডব।"

নড়ে উঠল ট্রেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠিক সময়ে পৌঁছে গেল পাহাড়পুরে। প্ল্যাটফর্মের উলটোদিকে নেমে লাইন ধরে দ্রুত চলতে লাগল ওরা আরও পেছনদিকে।

পাহাড় ও জঙ্গলের এইরকম ঘন সন্নিবেশ বোধ হয় এই অঞ্চলের মতো আর কোথাও নেই।

অনেকদূর যাওয়ার পর এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল ওরা।

বাবলু বলল, "কী হল, থামলে যে?"

"অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছ?"

"হ্যাঁ। দুর্গের মতো একটি ভগ্ন প্রাসাদ।"

"ওই সেই লালকুঁয়া। ওকে কেন্দ্র করেই এত রহস্য। প্রিন্সের গোপন ঘাঁটি। যেখানে ওর দু-চারজন বডিগার্ড ছাড়া বিশেষ কারও প্রবেশের কোনও অধিকার নেই।"

"আমরা ওখানে কীভাবে যাব?"

কবিতা

আনন্দে গান গাই

দেবব্রত দত্ত

বাড়ির পাশে গাছ লাগাব
অঢেল সবুজ হবে,
মাটি ও জল ভরাবে মন
সতেজ অনুভবে।

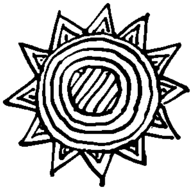

ঠিক জায়গায় আবর্জনা
সময়মতো ফেলে,
ঝকঝকে সব থাকবে কেমন
দেখব দু'চোখ মেলে।

নিয়ম মেনে পথ পেরোলে
কী আর ক্ষতি হয়,
দুর্ঘটনা আর হবে না,
কেউ পাব না ভয়।

বিকট শব্দ করব না কেউ
বাইরে এবং ঘরে,
মিলেমিশে করব সেবা
অসুখ-বিসুখ, জ্বরে।

আমরা যদি হই সচেতন,
একটুখানি ভাই,
থাকবে না আর দূষণ কোথাও
আনন্দে গান গাই।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

"খুব সাবধানে এবং সতর্ক পদক্ষেপে যেতে হবে আমাদের। কেননা এইখানে স্থানে-স্থানে বিদ্যুৎবাহী কয়েকটি তার এমনভাবে জায়গাটাকে ঘিরে আছে, যা কারও নজরে পড়ে না। রাতের দিকেই এগুলো সক্রিয় থাকে বেশিরভাগ। দিনের বেলা এখানে পাহারা দেয় প্রিন্সের কয়েকটি তেজি কুকুর।"

"সেগুলো কি এখনও আছে?"

"কয়েকটা আছে।" বলেই এদিক-সেদিক তাকিয়ে হঠাৎ একটি গাছের গুঁড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "পেয়েছি।"

"কী পেয়েছ?"

"সুইচ বোর্ড।"

বাবলু দেখল একটি গাছের গুঁড়ির নীচে খুব ছোট একটি লাল আলো জ্বলছে। পাশেই লাগানো আছে একটি পিয়ানো সুইচ। নিশা সেটা অফ করতেই লালকুঁয়ার প্রাসাদে বিপদ সঙ্কেত বেজে উঠল। সেইসঙ্গে জ্বলে উঠল রেড লাইট। সেটা একবার জ্বলতে একবার নিভতে লাগল। তারপরই ধেয়ে এল প্রায় দশ-বারোটা হিংস্র তেজি কুকুর।

ভয়ে চিৎকার করে উঠল নিশা। বলল, "সর্বনাশ হয়ে গেছে। এখন উপায়? ওরা যে আমাদের ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলবে। সঙ্কেত না দিয়ে কারেন্ট অফ করাতেই এই বিপর্যয়।"

বাবলু বলল, "উপায় আমিই করে দিচ্ছি। কেননা এখন আর এ ছাড়া বাঁচার কোনও পথ নেই।" বলেই নিশাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েই সেই সুইচটা আবার অন করে দিল বাবলু।

চোখের সামনেই কুকুরগুলো বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণান্ত আর্তনাদ করে স্থির হয়ে গেল একসময়। বাবলু একবার চোখ বুজল। এর পর আবার কারেন্ট অফ করে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল সেই মৃত কুকুরগুলোর কাছে। আকাশের ঘন অন্ধকার তখন সামান্য ফিকে হয়েছে।

নিশাও একসময় ওর পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, "তুমি ঠিক এইখানে এই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকো। আমি একবার ভেতরে ঢুকে দেখে আসি পরিস্থিতি কীরকম।"

বাবলু বলল, "না। তুমি কখনওই একা যাবে না। গেলে আমরা দু'জনেই যাব।"

"যাওয়া যাবে না। আমি হয়তো সামলে নিতে পারব। কিন্তু তুমি পারবে না। এই কুকুরগুলোর মর্মান্তিক পরিণতির ফল যে কী ভয়ঙ্কর তা তুমি জানো না। প্রিন্স তোমাকে জীবন্ত সমাধি দেবে।"

এমন সময় পেছন থেকে কে যেন উত্তেজিত গলায় বলল, "ও ঠিকই বলেছে বাবলু। দলের ক্রমাগত বিপর্যয়ে প্রিন্স এখন উন্মাদ।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "এ কী ল্যাংচা! তুই! তুই এখানে কী করে এলি?"

"সে অনেক ব্যাপার। এখানে বলা যাবে না। তোর খোঁজ করতে-করতে আমরা সবাই এখানে এসে পড়েছি। তবে কিনা কেস খুব গোলমেলে। আমি এখন দলছুট হয়ে একা পড়ে গেছি। ওরা যে কে কোথায় তা জানি না। পঞ্চু ভীষণ তাড়া করে কয়েকজনের পিছু নিয়েছে। ওরাও ওদের পেছনে ধাওয়া করে নিখোঁজ। আমি ওদের জন্যই স্টেশনে অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় দেখি না তোরা দু'জনে ট্রেন থেকে নামলি। আমি তো ওকেই মানেকা ভেবেছিলাম। মানেকা কোথায়?"

"এই মুহূর্তে সঠিক করে তা বলা যাবে না।"

"এই মেয়েটি কে?"

"এর নাম নিশা। রাজকুমারী সুদেষ্ণা মানেকার মতো এও একজন।"

(ক্রমশ)

এবার এসে গেল সুগন্ধি ডালিয়া

ডালিয়ার চাষেও এখন কম্পিউটারের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। মরসুমি ফুলের চাষেও এসেছে পরিবর্তন। লিখেছেন আশিস সরকার

শীতের ফুলের সৌন্দর্যই আলাদা। বেশিরভাগ ফুলের রংবাহার মানুষের মন টানে। তাই শীতকালে হরেকরকম মরসুমি ফুলের চাষ ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। গাছ এবং ফুলের শোভা মন এবং শরীরকে সজীব রাখে। শুধু তাই নয়, এই মরসুমি ফুলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বাণিজ্যও, যাতে আমাদের দেশ ফুল অর্থাৎ 'কাট ফ্লাওয়ার' রফতানিতেও অগ্রণী হয়েছে। একই সঙ্গে চলেছে ফুলগুলিকে উন্নত করার বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা সারা বিশ্বজুড়ে। মরসুমি ফুল বলতে প্রথমেই নাম করতে হয় চন্দ্রমল্লিকা আর ডালিয়ার। এ ছাড়াও রংবাহারি ফুলের তালিকাটা বেশ লম্বা, যা বলে শেষ করা কঠিন। চন্দ্রমল্লিকা বা ক্রিসেন্থিমাসের আদি বাসভূমি সম্ভবত চিনে। কিন্তু এক সময় তা ছড়িয়ে পড়ে জাপানে, আর সেখান থেকে ব্রিটেন এবং আমেরিকা হয়ে উনিশ শতকের মাঝামাঝি চন্দ্রমল্লিকা আসে ভারতে।

চন্দ্রমল্লিকার শ্রেণীবিভাগ করা হয় পাপড়ির বিন্যাস, ফুলের আকার আকৃতি অনুযায়ী। 'লার্জ এগজিবিশন', 'ইনকার্ভড', 'রিফ্লেক্সড', 'ইন্টারমিডিয়েট', 'স্পাইডার', 'অ্যানিমোন', 'পমপন' প্রভৃতি বিভাগে চন্দ্রমল্লিকাকে ভাগ করা হয়। প্রজাতিগুলির নামও নানারকম, যার মধ্যে আছে 'গ্রিন গডেস', 'স্নোবল', 'সোনার বাংলা', 'চন্দ্রমা', 'কিবু বিয়রি', 'চেডার', 'করোনেশন পিঙ্ক', 'পায়ার প্লাস', 'কসাক', 'কসাদ গ্রান্তি', 'আলফ্রেড সিম্পসন', 'পিঙ্ক ক্লাউড' প্রভৃতি। সমতল বাংলায় ফোটানো সহজ ফুলগুলির মধ্যে পমপন এখন রীতিমত জনপ্রিয়। একটি গাছে কয়েকশো ফুল ফুটে একমাস ধরে শোভা দেয় চন্দ্রমল্লিকা পমপন প্রজাতিটি।

বিভিন্ন জাতের চন্দ্রমল্লিকার ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিশ্বজুড়ে চলেছে, আর তার ঢেউ এ-দেশেও এসে পৌঁছেছে।

ডালিয়া নজরকাড়া বড়সড় রঙিন ফুল, তাই এর কদর সকলের কাছেই। এর আদি জন্মভূমি মেক্সিকো বলে মনে করা হয়। সুইডেনের উদ্ভিদবিদ আন্দ্রিয়াস গুস্তাভডালে-র নামে এর নামকরণ হয়েছে। ভারতে ডালিয়া আসে ১৮৫৭ সালে। শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী ডালিয়া 'জায়ান্ট ডেকরেটিভ', 'স্মল' ও 'মিডিয়াম ক্যাকটাস', পমপন ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়। পাপড়ির গঠন ও আকার অনুযায়ী এই শ্রেণীবিভাগ। ডেকরেটিভকে আবার 'ফর্মাল' ও 'ইনফর্মাল ডেকরেটিভ' এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়। সব মিলিয়ে কয়েক হাজার ডালিয়া রয়েছে। সমতল বাংলায় সবচেয়ে বড় ফুলের জাত 'কেনিয়া'। এর এক-একটি ফুলের ব্যাস ১৮ ইঞ্চি বা তারও বেশি হতে পারে। পমপন

ভারতের একমাত্র সুগন্ধি ডালিয়া ফোটো : সনাতন পাল

চন্দ্রমল্লিকা
ফোটো : সন্তোষ ঘোষ

নতুন ডালিয়া

ডালিয়ার ব্যাস দু'ইঞ্চির মধ্যে, আর একটি গাছে অজস্র ফুল হয়। ডালিয়া কন্দজ গাছ, ফলে কন্দ থেকে নতুন শাখা বের হয়ে থাকে। নতুন শাখা কেটে 'হরমোন পাউডার' দিয়ে বালিতে বসিয়ে যে চারা হয়, তাকে কাটিং-এর চারা বলে। এই চারা থেকেই সাধারণ মানুষ ফুল চাষ করে থাকে। এ ছাড়া বীজ থেকেও ডালিয়ার চারা হয়।

নতুন প্রজাতি তৈরির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে গেছে ভারত। দেখা যাচ্ছে ভারতে, বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে ডালিয়ার নতুন-নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করা হচ্ছে। এর জন্য যেমন উন্নত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে, তেমনই অতি সাধারণ উপকরণ দিয়েও ডালিয়া ব্রিড করানো যাচ্ছে। ল্যাবরেটরিতে ডালিয়ার কন্দে সদ্য গজানো গ্যাঁজে অতি অল্পমাত্রায় 'গামা রশ্মি' প্রয়োগ করে কিছু সুফল পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে। এ ছাড়া মুচিশা ও আমতলা অঞ্চলে 'ব্রাশ ব্রিডিং' বা তুলি দিয়ে ফুলের পরাগরেণু তুলে অন্য ফুলের গর্ভকেশরে দিয়ে 'ব্রিড' করেও সুফল পেয়েছেন অনেকে।।

তিনশো বছরের পুরনো আলিপুর এগ্রি হর্টিকালচারাল সোসাইটির ফুলের প্রদর্শনীতে বহু নতুন ডালিয়া ফুটন্ত অবস্থায় দেখা গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে এস পি গ্রুপের ফুলগুলি, যার এস পি রোমিয়া প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ ডালিয়া নির্ধারিত হয়েছে। ডালিয়ায় সুগন্ধ আনার কৃতিত্বও এস পি গ্রুপের এস পি সুগন্ধার। এ ছাড়া নতুন ফুলের তালিকায় 'রেড আর্মি' (ঘন লাল), 'বাপ্পাদিত্য' (সিঁদুরে লাল), 'মাদার টেরিজা' (বেগুনি ও সাদা), 'জয়পেজি' (হালকা গোলাপি), 'ভিক্ষু বুদ্ধ' (গোলাপি ও সাদা টিপ), 'ভিক্ষু বিবেক' (ঘন লাল), 'আদিনাথ' (হালকা কমলা), 'অনন্তদেব' (ঘন লাল), 'টনি' (লাল ও সাদা) প্রভৃতি অজস্র ফুল আছে। চেষ্টা চলেছে ডালিয়াকে আরও বেশিদিন ফুটিয়ে রাখা এবং

শীতের অন্যতম আকর্ষণ বাহারি চন্দ্রমল্লিকা

ফুলে জমাটি ভাব আনা, সঠিক উচ্চতায় ফুল আনা এবং রঙের দিক থেকে নতুন ভাব আনার। ডালিয়ার পাপড়িতে নতুন রঙের ছোপ আনা ছাড়াও পাপড়িগুলির আকৃতি পরিবর্তন করায় মানুষের চেষ্টা ছাড়াও প্রকৃতি থেকেও মাঝেমধ্যেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে নতুন ফুল 'মিউটেশন'-এর মাধ্যমে। ডালিয়ার ওপর কাজ করছে ভারতের বেশ কয়েকটি 'ডালিয়া সোসাইটি' যার মধ্যে অগ্রণী ভূমিকায় আছে 'ডালিয়া সোসাইটি অব ইন্ডিয়া'। এ ছাড়া দিল্লির ডালিয়া সোসাইটিও বেশ ভাল কাজ করছে। ডালিয়া সোসাইটি অব ইন্ডিয়া এখানকার নতুন ডালিয়াগুলিকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য ব্রিটেনে পাঠাচ্ছেন। এখন বেশ কিছু ডালিয়া আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। এ ছাড়া এ-বছর উদ্ভাবিত কিছু ডালিয়া, যেমন গ্লোরি অব ইন্ডিয়া, এস পি রোমিয়া, এস পি সুগন্ধা প্রভৃতি অনুমোদনের জন্য ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক ডালিয়া সোসাইটির কাছে পাঠানো হচ্ছে।

চন্দ্রমল্লিকা আর ডালিয়া সমতল বাংলায় ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ফুটতে পারে, তবে এর পরিচর্যার কাজ চলে সারা বছর। চন্দ্রমল্লিকা আর ডালিয়া দুটো গাছই কাটিং থেকেই বসানো হয়, যদিও বীজ থেকেও এখানে ডালিয়া তৈরি করা যায়। কাটিং বসাতে হয় চন্দ্রমল্লিকার ক্ষেত্রে অগস্ট মাসের পর থেকে, আর ডালিয়ার সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকেই।

চন্দ্রমল্লিকা ও ডালিয়ার কাটিংয়ের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান এক নম্বরে। দেখা যাচ্ছে, ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চলের চেয়ে দক্ষিণ বঙ্গের কাটিংয়ের চারা এখানে তো বটেই, সারা ভারতে সেরা মানের ফুল দিচ্ছে। এ-বছরই মোট প্রায় ১২ লক্ষ ডালিয়া কাটিং এবং প্রায় চার লক্ষ চন্দ্রমল্লিকা কাটিং সারা ভারতে ছড়িয়ে গেছে মুচিশা, আমতলা, ফলতা, ডায়মন্ডহারবার প্রভৃতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার নার্সারি থেকে এবং খড়দহ, ব্যারাকপুর প্রভৃতি উত্তর ২৪ পরগনার নার্সারি থেকে। ১৯৯১ সালে ৬,৫৭৫ হেক্টর জমি থেকে ফুলচাষের জমি এখন পশ্চিমবঙ্গে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯,০০০ হেক্টরের বেশি। একই ঢেউ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও।

অত্যাধুনিক ফুলচাষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে কম্পিউটার। মাইক্রো অ্যামাউন্টে (অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে) সার বা রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে সঠিক পরিমাপের জন্য কম্পিউটারকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ছাড়াও ফুলের বা ফুলগাছের স্বাস্থ্য, জলের চাহিদা, পোকামাকড়ের উপদ্রব ইত্যাদি সবই ধরা পড়ছে কম্পিউটারের পরদায়।

ফোটো : শুভ্রাশিস সিংহরায়

সম্পূর্ণ গোয়েন্দা উপন্যাস

কৃষ্ণধাম কথা

বিমল কর

বাসটা ঠিক জায়গাতেই নামিয়ে দিল। রাস্তা ঘেঁষে বটগাছ। একটার গায়ে গায়ে আরেকটা। বাসস্টপের নাম 'জোড়া বটতলা'। বৃষ্টি পড়ছে তখনও। তবে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। আকাশে মেঘ। চেহারা দেখে মনে হয় সারা দিনেও এই বাদলা ঘুচবে না। আশপাশে গাছগাছালি, ঝোপ, জংলা লতাপাতা। একপাশে একটা ভাঙা মন্দির। অন্যপাশে, সামান্য তফাতে, কোন এক মিশনারিদের অনাথালয়। চারদিকে পাঁচিল তোলা। ফটকটাও দেখা যায়।

বটগাছের তলায় ছাতা হাতে যশোদাজীবন দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরনে ধুতি, মালকোঁচা মেরে পরেছেন যেন। গায়ে একরঙা শার্ট। পায়ে বর্ষা-জুতো, আজকাল বাজারে যা দেখা যায়।

কিকিরা দেখতে পেয়েছিলেন যশোদাকে।

"আমি আধঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে আছি," যশোদা কয়েক পা এগিয়ে এলেন। "বাসটা তা হলে পেয়েছেন! দিনটা বড় খারাপ আজ।"

কিকিরা বললেন, "কেন, সময়েই তো পৌঁছে গেলাম। ক'টা বাজে

এখন ? দশটার বেশি নাকি ?"

"না, না, ওইরকমই হবে। ...এদিককার বাস কম। গোটা তিন-চার। খারাপ হয়ে গেলে তাও কমে যায়। তার ওপর দিন বুঝে বাস চালায়। আজ দিনটা একেবারে পুরো বর্ষার মতন। আসুন—।"

কিকিরা তারাপদকে ইশারা করলেন এগিয়ে যেতে। যশোদাকে বললেন, "কত দূর যেতে হবে ?"

"বেশি নয়। মিনিটবিশেক হাঁটতে হবে। রাস্তা ভাল নয়, কাঁচা। কাদায় পা ডুবে যায়..."

"ঠিক আছে চলুন। তা যশোদাবাবু, বাসটা থেকে আমরা দু'জন মাত্র নামলাম এখানে। আর তো কেউ নামল না।"

"ওইরকমই। এক-আধজনই নামে এখানে। হাটের দিনে অবশ্য ভিড় হয়। ওই ওপাশে মঙ্গলঘাটা বলে একটা জায়গায় হাট বসে রবিবার। পাইকাররা আসে। অন্যদিন ভোঁ-ভা।"

"অনাথালয়টা কাদের ?"

"মিশনারি সাহেব বাবুদের পয়সায় তৈরি। শুনেছি কোন এক নামকরা বিদেশি মেমসাহেব এদিকে একবার বেড়াতে এসে টাকা- পয়সার ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিলেন। অন্যরাও টাকা দেয়। ওদের নিজেদের একটা পুরনো জিপগাড়ি আছে। কাজেকর্মে বাইরে যায়।"

কিকিরারা হাঁটতে শুরু করেছিলেন। কাঁচা রাস্তা। হাত-কয়েক চওড়া মাত্র। জল কাদায় পা রাখা দায়। মাঝে মাঝে ইটের টুকরো, ভাঙা পাথরের চাঁই ফেলা রয়েছে। দু'পাশে নিচু জমি। কোথাও কোথাও আধ খাপচাভাবে চাষ হয়েছে, কোথাও সবজি বাগান, ছোট একটা নার্সারিও চোখে পড়ল।

তারাপদ তেমন খুশি হচ্ছিল না। কিকিরা দিন-দিন যেন ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছেন। কোথাকার কে হীরালাল বলে এক ভদ্রলোক দিন চার-পাঁচ হল তাঁর বাগান থেকে উধাও। ভদ্রলোক নাকি বড়সড় কারবারি, কলকাতা শহরে তিনটে আর হাওড়ায় একটা কাপড়ের দোকান। ছোটখাটো দোকান নয়। মস্ত দোকান। বেশ নামডাক আছে দোকানগুলোর, হাজার-হাজার টাকার কারবার করেন। তা করুন কারবার, ভাল কথা। তা ওই ভদ্রলোক— হীরালালবাবু,—বছর তিন-চার আগে এদিকে অনেকটা জমি কিনে তাঁর শখের 'কৃষ্ণধাম' বলে একটা বাগানবাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন। বাগানবাড়ি বলতে ঠিক যা বোঝায়— তেমন বাড়ি অবশ্য নয়। একটা ছোট বাড়ি, আর আশপাশে বাগান— ফলফুলুরির। লোকজন রেখেছিলেন নিজের পছন্দ মতন। প্রত্যেক হপ্তায় শুক্রবারে হীরালাল তাঁর কৃষ্ণধামে চলে আসতেন। থাকতেন সোমবার পর্যন্ত। ওঁর স্ত্রী বিগত। সংসারে ছেলেমেয়েরা আছে। তাদের বয়েসও কম হল না। বাবার ব্যবসা ছেলেরাই দেখে। হীরালালবাবু নিজে ব্যবসাপত্র থেকে ধীরে-ধীরে সরে এসেছেন। তবু তিনি থাকা মানে মাথার ওপর ছাতা থাকা। ইদানীং ভদ্রলোক কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিলেন। উদাস, নিস্পৃহ। তিনি কোনও ব্যাপারেই মন বা নজর দিতে চাইতেন না। একেই বোধ হয় বলে বৃদ্ধ বয়সের সংসার বৈরাগ্য।

গত শুক্রবার হীরালাল যথারীতি তাঁর কৃষ্ণধামে চলে আসেন। সঙ্গে যশোদা। যশোদা হীরালালের নিত্যসঙ্গী। বন্ধু নয়, কর্মচারী। হীরালালের যৌবনকাল থেকে পাশে পাশে আছেন। দুঃখের দিনের সঙ্গীকে সুখের দিনেও ছাড়েননি হীরালাল। সম্পর্কটা প্রায় বন্ধুর মতন হয়ে উঠেছিল। লোকে জানে, যশোদা হলেন হীরালালের ম্যানেজার এবং বিশ্বস্ত বান্ধব।

গত শনিবার বিকেল থেকে হীরালালকে কৃষ্ণধামে পাওয়া যাচ্ছে না। পাওয়া যাচ্ছে না— সে অন্য কথা। কিন্তু হীরালালের হাতে লেখা যে তিনটি চিরকুট পাওয়া গিয়েছে— সেটাই মারাত্মক।

চিরকুটগুলো পড়লে ধাঁধা লেগে যায়। মনে হয় : (১) হীরালাল আত্মহত্যা করার কথা ভাবছিলেন, (২) আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত তিনি নিয়ে নেন সম্প্রতি, (৩) সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর হীরালাল আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন বলে একটা চিরকুট লিখে রেখে উধাও হয়ে গিয়েছেন।

শনিবার বেলার দিকে হীরালাল যশোদাকে একটা কাজে পাঠিয়েছিলেন। কাজটা মোটেই জরুরি নয়। মাইল চারেক দূরে 'বৈকুণ্ঠ নার্সারি'-তে গিয়ে খোঁজ করতে হবে তারা সত্যি-সত্যি নার্সারি বিক্রি করার কথা ভাবছে কিনা ! যদি বিক্রি করাই ঠিক করে থাকে— তবে জমিজায়গা নার্সারি সমেত দরদাম কী পড়তে পারে !

যশোদা যেতে চাননি। কী হবে নার্সারিতে, বা জমিজায়গায় ! ঈশ্বরের কৃপায় বড়বাবু— মানে হীরালালের তো কম সম্পদ নেই ; তা হলে অযথা আর সম্পত্তি বাড়ানো কেন ? তা ছাড়া একটা পড়তি নার্সারি সম্পত্তি হিসেবেও কেনার কোনও মানে হয় না। আপত্তি সত্ত্বেও যেতে হল যশোদাকে ; হাজার হোক বড়বাবুর হুকুম।

মেঠো রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে যশোদা বৈকুণ্ঠ নার্সারিতে গিয়েছিলেন। ফিরতে ফিরতে বিকেল। ফিরে এসে আর বড়বাবুকে দেখেননি।

আশপাশে কোথাও আছেন ভেবে যশোদাও আর হীরালালের খোঁজ করেননি তখন। যশোদারও বয়েস হয়েছে ; যাওয়া-আসায় আট মাইল। তাও মেঠো পথে। সাইকেল চালাবার ধকল সামলে যশোদা যখন খানিকটা সামলে নিয়েছেন নিজেকে, তখন বড়বাবুর খোঁজ করলেন। ভাদ্রমাসের বিকেল ততক্ষণে মরে গিয়ে অন্ধকার নেমে এসেছে। এখানে ইলেকট্রিক নেই ! কেরোসিনের বাতিতেই কাজ চালাতে হয়। মাঝে মাঝে বড়বাবুর খেয়ালে কৃষ্ণধামের বারান্দায় একটা ছোট পেট্রম্যাক্স বাতি জ্বালানো হয়। চতুর্দিক ফাঁকা, যেদিকে তাকাও মাঠ আর গাছপালা আর অন্ধকার। ওর মধ্যে পেট্রম্যাক্স বাতিটা যেন আকাশের তারার মতন দেখায়। অবশ্য জ্যোৎস্নার দিনে বাতি জ্বালানো হয় না বাইরে। তখন অঢেল জ্যোৎস্না আর জোনাকির নৃত্যই যেন কৃষ্ণধামকে ঘিরে থাকে।

সন্ধের মুখেও হীরালালকে দেখতে না পেয়ে যশোদা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। কাজের লোক তিনজন। একজন রান্নাবান্না নিয়ে থাকে, অন্যজন ঘরদোর সাফসুফ রাখে। তৃতীয়জনের কাজ হল জল তোলা আর চৌকিদারি। বাড়তি দু'জন মালি আসে হপ্তায় তিনদিন। তারা বিকেল বিকেল চলে যায়।

কাজের লোকরা বলতে পারল না বড়বাবু কোথায় গিয়েছেন। তাঁকে বিকেলের পরে তারা দেখেছে। তারপর আর দেখেনি।

যশোদা তখন হীরালালের শোয়ার ঘরে খোঁজ করতে আসেন। এসে দেখেন বিছানার ওপর তিনটুকরো কাগজ রাখা। প্রত্যেকটি কাগজের ওপর ভারী কিছু চাপা দেওয়া— যেন না বাতাসে উড়ে যায় কাগজগুলো।

কাগজের লেখাগুলো পড়েই যশোদার মাথা ঘুরে যায়। তিনি বিশ্বাস করতেও পারেননি। তারপর খোঁজ-খোঁজ পড়ে যায় আবার। এবার যশোদা নিজে বাড়ির কাজের তিনটে লোককে নিয়ে মাঠেঘাটেও খুঁজে বেড়াতে শুরু করেন বড়বাবুকে। আত্মহত্যা করুন আর না করুন, কোথাও হয়তো পড়ে আছেন মাথা ঘুরে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে, সাপেখোপেও কামড়াতে পারে।

লণ্ঠন আর টর্চ নিয়ে ঘণ্টাখানেকের বেশি খোঁজ চলল। রাত্রে আর কত খোঁজ করা যায় ! এদিকে কলকাতা যাওয়ার শেষ বাস চলে গিয়েছে সোওয়া সাতটা নাগাদ। কলকাতায় যাওয়ারও উপায় নেই।

রাতটা উদ্বেগে আর দুর্ভাবনায় কাটিয়ে পরের দিন যশোদা ছুটলেন কলকাতায়। বড়বাবুর বাড়ি বাগবাজারে। তেতলা বাড়ি। ছেলেরা সকলেই একসঙ্গে থাকে। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার।

বড়বাবুর বড় ছেলে বড়দা— মানে কানাইলাল। মেজো ছেলে শ্যামলাল। তিনি হলেন মেজদা। ছোটর নাম কুমারলাল। বড়দা এখন বেনারসে, পুজোর মরসুমে কাশীর চকপট্টি আর তাঁত-মহল্লায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন ব্যবসার কাজে। এখন থেকে না ব্যবস্থা করে রাখলে বিয়ের মরসুমে মনের মতন বেনারসি পাবেন না। তা ছাড়া আজকাল সুতি কাপড়েও বেনারসি ধরনের কাজ হয় কাশীতে। মালের অর্ডার দিয়ে দু-একদিনের মধ্যেই ফিরবেন। তাঁকে হুট করে এ-সময় একটা দুঃসংবাদ দেওয়া যায় না। আর না-জেনে না-দেখে— কেমন করে বড়দাকে খবর দেওয়া যায় যে, বাবা আত্মহত্যা করেছেন, তুমি পত্রপাঠ ফিরে এসো।

মেজো শ্যামলাল স্বভাবে ভিতু আর সাবধানী। তার মোটেই ইচ্ছে নয়, ব্যাপারটা নিয়ে হুট করে থানাপুলিশ করা। বাবা যদি আত্মহত্যা না করে থাকেন— আর থানা-পুলিশ করতে ছোটে বাড়ির লোকে— তবে ভবিষ্যতে বিরাট একটা গোলমাল হবে। আত্মহত্যা করতে চলেছি— এই ব্যাপারটা পুলিশকে জানালেও সেটা বিশ্রী অপরাধ বলে গণ্য হবে। আইনের কত না ফ্যাকড়া !

কুমারলাল এখন ছুটেছে বর্ধমান, আসানসোল, কালনা— যেখানে যেখানে জ্ঞাতি, গোষ্ঠী আছে তাদের— সকলের কাছে গিয়ে বাবার খোঁজ নিতে। মানুষ বুড়ো হলে ভীমরতি ধরে। বাবারও যে ধরেনি কে বলবে !

শ্যামলালের সঙ্গে পরামর্শ করে যশোদা এসে ধরেছিলেন কিকিরাকে। রায়বাবুর সঙ্গে মোটামুটি একটা পরিচয় ছিল যশোদার। অনেককাল আগে একই পাড়ায় থাকতেন দু'জনে।

কিকিরা মন দিয়ে সব শুনেছিলেন ঘটনাটা। কৌতুক এবং কৌতূহল— দুই-ই বোধ করছিলেন। শেষমেশ রাজিও হয়ে গেলেন।

মাথায় ছাতা। গায়ে রেন কোট। মাঠঘাট, জলকাদা ভেঙে, মাঝে মাঝে বুনো ঝোপ সরিয়ে কিকিরারা শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণধামে পৌঁছে গেলেন।

দূর থেকে ভাল করে বোঝা যায় না, আন্দাজ করা চলে। তার ওপর বৃষ্টির বিরাম নেই। কাছে এসে বোঝা গেল, কৃষ্ণধামের কম্পাউন্ড-ওয়াল তেমন উঁচু নয়, হাত তিনেক হবে। তার ওপর অবশ্য ছোট ছোট লোহার খুঁটি জড়িয়ে তারকাঁটা লাগানো। গাছপালাই নজরে পড়ে বেশি, সামনের দিকে। বড় বড় গাছও রয়েছে অনেক : আম, জাম, পেয়ারা। পেছন দিকে কৃষ্ণধাম। বাড়িটা বড় নয়। ছোট। দেড়তলার মতন লাগে তফাত থেকে দেখলে। বাড়ির ছাঁদ অনেকটা মন্দিরের মতন। মানে নকশাটা মন্দির ধরনের। আশপাশে ফুলগাছ, সরু সরু পথ, মোরাম আর নুড়ি পাথর বিছানো পথ।

ভালই লাগে দেখতে।

তারাপদ বলল, "কিকিরা সার, আপনি বললেন বর্ষায় একটু 'ফিশিং' করতে যাবেন ! এই আপনার ফিশিং ?"

কিকিরা বললেন, "দ্যাখো তারাবাবু, আমি অনেক কিছু জানি ; তার চেয়েও বেশি হল যা জানি না। পৃথিবীর একভাগ স্থল, তিনভাগ জল। আমার ব্রেনেরও সেই অবস্থা, সার বস্তু ওয়ান পার্ট ওনলি ! ফিশিংটা আমার শেখা হয়নি বাপু। ছিপ আমি দেখেছি ; মাছ ধরতেও দেখেছি বাবুদের। কিন্তু জীবনে কখনও ছিপ ধরিনি। ... তা সে যাই হোক, তোমাকে আমি এই ফিশিংয়ের ব্যাপারটা বলেছি আগেই।"

"তা অবশ্য বলেছেন।"

"তবে ?"

"ব্যাপারটা আমার কাছে বাজে বলে মনে হচ্ছে। এই বৃষ্টিবাদলায় কেউ এমন অজ গাঁয়ে আসে ! চাঁদু বেঁচে গিয়েছে।"

"বেঁচে গেল, কিন্তু মজাটা জানতে পারল না। চাঁদু কথায় কথায় বাড়ি ছোটে কেন বলতে পারো ?"

"ও বোধ হয় হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে দেবে। বাড়ি গিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিয়ে বসবে।"

"পারবে ?"

"পারবে। মন বসাতে পারলে। চাঁদু দারুণ ছেলে। তবে কিকিরা, চাঁদু কলকাতা ছেড়ে চলে গেলে আমি মরে যাব। ও আমার বন্ধু, ভাই, গার্জেন..."

কিকিরা হেসে বললেন, "তুমি এক কাজ করো।"

তারাপদ তাকিয়ে থাকল।

কিকিরা মজার গলায় বললেন, "কম্পাউন্ডারিটা শিখে নাও। চাঁদুর 'কম্প' হয়ে পাশে পাশে থাকতে পারবে।"

তারাপদ হেসে ফেলল। বলল, "তা ঠিক। ...তবে আমি একটা চিরকুট রেখে এসেছি চাঁদুর কোয়ার্টারে। কাল পরশু ফিরলেই জানতে পারবে।"

॥ ২ ॥

হাত-পা ধুয়ে ভিজে পোশাক পালটে কিকিরারা চা খেতে বসলেন। বেলা প্রায় এগারোটা। বৃষ্টি ধরে রয়েছে, তবে আবার নামবে।

চা খেতে খেতে কিকিরা যশোদাকে বললেন, "কই, সেই কাগজগুলো দিন, দেখি।"

যশোদা আগেই নিয়ে এসেছেন কাগজের চিরকুটগুলো। জামার পকেটেই ছিল। এগিয়ে দিলেন।

কিকিরা হাত বাড়িয়ে নিলেন কাগজগুলো। দেখলেন একবার। একই ধরনের কাগজ। এক্সারসাইজ খাতার সাদা পাতা। লেখার কালি কলমও এক। হীরালালের হাতের লেখা চলনসই।

যশোদা বললেন, "পর পর গুছনো আছে। ওপরেরটা প্রথম...।"

কিকিরা লেখাটা পড়লেন মনে মনে। "আমার বয়েস আটষট্টি হইয়া গিয়াছে। দেশ ছাড়া হইয়া যখন আসি, উনিশ-কুড়ি বয়েস ছিল। লেখাপড়া ঠিকঠাক শেখা হইয়া উঠে নাই। পাঁচ ঘাটের জল খাইয়া কাটা কাপড়ের ব্যবসা শুরু করি। তাহার পর কাপড়ের গাঁঠরি পিঠে করিয়া বাড়ি বাড়ি তাঁতের শাড়ি বিক্রি করিতাম। পরিশ্রম অনেক করিয়াছি। অবশেষে শ্যামবাজারে একটি কাপড়ের দোকান দিতে পারি। ঈশ্বরের কৃপায় ইহা সম্ভব হইয়াছিল। সৎভাবে ব্যবসা করিয়াছি। ভাগ্যও সহায় হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে আমাদের ব্যবসা বাড়িল। তিন-তিনটি দোকান দিলাম। এখন তো অভাব অনটন কিছুই আর নাই। ছেলেরাও দাঁড়াইয়া গিয়াছে। আমার মনে কিন্তু সুখ নাই। অনর্থক আর বাঁচিতে ইচ্ছা করে না। শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণ লইতে ইচ্ছা করে।"

লেখাটা বার দুই-তিন পড়ে কাগজটা তারাপদকে পড়তে দিলেন কিকিরা।

দ্বিতীয় চিঠিটা ছোট। তাতে লেখা : "অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, এবার সংসার হইতে বিদায় লওয়াই আমার উচিত। বাঁচিয়া থাকিলে না জানি কত অধর্ম অন্যায় দেখিতে হইবে। মহাভারতে পড়িয়াছি, স্বয়ং মহাজ্ঞানী ভীষ্মও নিজের ইচ্ছামৃত্যুর জন্য অনুতাপ করিতেন। ভাবিতেন, উহা যেন অভিশাপ। আমি সামান্য মানুষ। আমার আর কতটুকু ক্ষমতা। আমি মনঃস্থির করিয়া ফেলিয়াছি। আমার যাওয়া আর কে আটকায়।"

চিঠিটা তারাপদকে পড়তে দিলেন কিকিরা। শেষ টুকরোটা হাতে নিয়ে যশোদাকে বললেন, "এইটেই শেষ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

চিঠিটা খুবই ছোট। কয়েকটি মাত্র কথা। "আমি শেষ যাত্রায় চলিলাম। স্বেচ্ছায়। আমার পরিণতির জন্য কাহাকেও আমি দায়ী করি না। ঈশ্বর উহাদের মঙ্গল করুন।"

বার দুই-তিন শেষ চিঠিটা পড়ে কিকিরা কাগজের টুকরোটা তারাপদকে এগিয়ে দিলেন।

সামান্য চুপচাপ। পকেট থেকে কিকিরা চুরুট বার করলেন। সরু আঙুলের মতন চুরুট। দেশলাইটা স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছে। চুরুট ধরাতে দশ-বারোটা কাঠি নষ্ট হল।

"যশোদাবাবু ?"

"বলুন ?"

"চিঠি তিনটের হাতের লেখা তো একই লোকের মনে হচ্ছে। হীরালালবাবুর। চিঠির শেষে নামও লিখেছেন, হীরালাল দাশ। আপনি কী বলেন ?"

"হাতের লেখা বড়বাবুরই।"

"নকল নয় তো ?"

"আজ্ঞে না।"

"কালির রং, কলমও একই বলে মনে হচ্ছে।"

"ঠিকই বলেছেন। আমিও কোনও তফাত দেখিনি।"

কিকিরা এবার তারাপদর দিকে তাকালেন। বললেন, "তারা, তুমি একটা জিনিস নজর করে দেখেছ ? চিঠিতে কাটাকুটি বোধ হয় মাত্র দু' তিন জায়গায়। হাতের লেখা স্পষ্ট। কোথাও হাত কাঁপেনি, এলোমেলো হয়নি লেখা। দেখেছ ?"

তারাপদ দেখল। মাথা হেলিয়ে বলল, "হ্যাঁ— কথাটা ঠিকই।"

কিকিরা বললেন, "একজন লোক যখন সুইসাইড নোটের মতন চিঠি লেখে— তখন তার মাথা কতটা ঠাণ্ডা হতে পারে ? তার কোথাও একটু আবেগ থাকবে না, দুঃখ থাকবে না ? তোমার কী মনে হয় ?"

"থাকা বোধ হয় উচিত।"

"বেশ, উচিত বাদ দিলাম। হয়তো হীরালালবাবুর মাথা বেজায় ঠাণ্ডা ছিল। স্ট্রং নার্ভ। তিনি বেশ গুছিয়ে নিজের কথাগুলো লিখেছেন। মনে মনে মক্‌শও করে থাকতে পারেন। কিন্তু আমার যে ধোঁকা লাগছে হে!" বলে কিকিরা যশোদার দিকে তাকালেন। "যশোদাবাবু, আপনাকে খোলাখুলি ক'টা কথা জিজ্ঞেস করি। যা জানেন বলবেন, কথা লুকোবেন না।"

"লুকবো কেন! বলুন।"

"হীরালালবাবুর সঙ্গে আপনি অনেকদিন ধরে আছেন, আমি জানি। তবু ঠিক কত বছর রয়েছেন জানা নেই।"

"আঠাশ-তিরিশ বছর। বড়বাবু যখন শ্যামবাজারে তাঁর প্রথম দোকান করেন— তখন থেকেই আমি তাঁর কর্মচারী। বাবু আমি আর বিনোদ বলে একটা ছেলে দোকান দেখতাম।"

"দ্বিতীয় দোকানটা কবে হয় ?"

"পাক্কা দশ বছর পরে। কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে।"

"তৃতীয়টা ?"

"ভবানীপুরে। সেটা হয়েছিল মেজদার বিয়ের আগে।"

"আর হাওড়ার দোকান ?"

"ওটা তেমন পুরনো নয়। বছর পাঁচ-সাত আগে হয়েছে।"

"দোকানগুলোর মালিকানা ?"

"আগে সবই বড়বাবুর ছিল। পরে তিনি ভাগ করে দেন। আদি দোকান পায় বড়দা, কলেজ স্ট্রিটের দোকান দেওয়া হয় মেজদাকে। ভবানীপুরের দোকানের মালিকানা ছোড়দার।"

"আর হাওড়ার দোকান ?"

"ওটা বড়বাবু অন্যরকম ব্যবস্থা করেন। তাঁর শ্যালক ও শ্যালকের ছেলেদের লিখে দেন। অবশ্য ওই দোকানটায় শালাবাবুদেরও টাকা খাটত।"

"আপনার মনিবই বলুন আর বড়বাবুই বলুন— মানুষ কেমন ছিলেন ?"

"বাবু বড় ভাল লোক ছিলেন। সাদামাঠা, সরল। সৎ মানুষ। ব্যবসাদার হলেও তিনি শুধু লাভের দিকে চোখ রাখতেন না। বরং দশ পয়সার জায়গায় আট পয়সা লাভেই সন্তুষ্ট থাকতেন। ঠাকুর দেবতায় অগাধ ভক্তি ছিল। বউ ঠাকুরন গত হওয়ার পর পুরোপুরি নিরামিষ আহার করতেন। আর গত তিন-চার বছর দোকানের ব্যাপারে মাথা ঘামাতেন না বিশেষ। বাড়ির কাছে বলে শ্যামবাজারের আদি দোকানটায় সন্ধের মুখে এক-আধ ঘণ্টা বসতেন। পুরনো লোকজন এলে কথাবার্তা বলতেন সুখদুঃখের।"

কিকিরা চুরুট টানতে টানতে মাথা নেড়ে যাচ্ছিলেন।

তারাপদ হঠাৎ কিকিরাকে বললেন, "সার, ছেলেদের সঙ্গে মন কষাকষি হয়নি তো ? বুড়োমানুষ, কোনও ব্যাপারে মান-অভিমান হতে পারে।"

যশোদাই জবাব দিলেন। বললেন, "না, তেমন কিছু নয়। তবে বড়দা শ্যামবাজারের দোকানটা বাড়িয়ে নিয়েছিল। পাশের একটা ছোট হোসিয়ারি দোকান কিনে নেয়। আর আজকাল যা ফ্যাশান, দোকানটা হাল কায়দায় সাজিয়ে— ঠাণ্ডা-মেশিন চালু করে দোকানে। বড়বাবুর এটা পছন্দ হয়নি। তিনি সাবেকি মানুষ, নিজের হাতে গড়া দোকান, অত ঝকমকি তিনি মেনে নিতে পারেননি।"

"ও! তা এ নিয়ে ছেলের সঙ্গে মন কষাকষি হয়েছিল ?"

"না। বড়বাবু চুপ করেই থাকতেন। মুখে কিছুই বলেননি। মনে লেগেছিল।"

"দোকান সাজানোর পর বিক্রিবাটা কমেছিল, না, বেড়েছিল ?"

"বেড়েছিল।"

"তবে আর কী! অন্য দোকানগুলোর বেলায় কী হয়েছিল ?"

"না, সেগুলো আগের মতনই ছিল।"

"কেমন চলত ?"

"খারাপ নয়। মেজদার কলেজ স্ট্রিটের দোকানে তিন-চার মাস খুব বেচাকেনা হত— এই পুজোর টাইমে। ভবানীপুরের দোকানও ভাল চলত। ছোড়দা তার দোকানে রেডিমেড পোশাক রাখত। বাচ্চাদেরই বেশি।"

"আর হাওড়ার দোকান ?"

"আজ্ঞে, ওটা আজকাল ভাল চলত না। তবে দোকানটা তো বড়বাবু শালাবাবুকে দান করেছিলেন। কাজেই ওটা হীরালাল দাশ অ্যান্ড সন্সের মধ্যে পড়ে না।"

বেলা হয়ে আসছিল। আবার বৃষ্টি নামল।

কিকিরা বললেন, "যশোদাবাবু, এখন থাক। এবার স্নান-খাওয়া সেরে নিই। দুপুরে একটু জিরিয়ে, বিকেলে কৃষ্ণধামের ঘরদোর দেখা যাবে। চোখে সব দেখে নেওয়া ভাল। আজ আমরা কিন্তু রাত্তিরেও আছি এখানে। মনে আছে তো ?"

যশোদা বললেন, "ও-কথা কেন বলছেন! আপনাদের জন্যে সবরকম ব্যবস্থা করা আছে। যতদিন খুশি থাকতে পারেন!"

চুরুট নিভে গিয়েছিল কিকিরার। সেঁতিয়ে গিয়েছে। তারাপদর কাছে

একটা সিগারেট চাইলেন কিকিরা।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে হঠাৎ যশোদাকে বললেন, "আপনার বড়বাবু পান-তামাক খেতেন না ?"

"আজ্ঞে না। ওঁর কোনও নেশা ছিল না। দু'বেলা দু' পেয়ালা চা খেতেন মাত্র। আর গলা খুসখুস করে কাশি আসত বলে লবঙ্গ মুখে রাখতেন বেশিরভাগ সময়। বড়বাজার থেকে বাবুর জন্যে বাছাই করা ভাল লবঙ্গ আসত। আমিই আনতাম।"

"চলুন ওঠা যাক।" কিকিরা উঠে পড়লেন।

॥ ৩ ॥

বিকেলে কৃষ্ণধামের ঘরগুলো দেখলেন কিকিরারা। নীচের তলায় চার পাঁচটি ঘর। মাঝারি মাপের। রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা সামান্য তফাতে, এক পাশে। বারান্দা প্রায় চারপাশেই। বারান্দার তলায় লতাপাতা আর ফুলগাছের ঝোপ। হাসনুহানা, টগর, বেল— আরও কত। ঘরগুলো পাকাপোক্তভাবে তৈরি। তবে বাহুল্য নেই, বিলাসিতা নেই। একটা ঘরে দু' আলমারি ধর্মগ্রন্থ। দেওয়ালে দুর্গা, কালী, শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীগৌরাঙ্গর পট। সরল সাধাসিধে ঘরদোর। কিন্তু বেশ লাগে।

শেষে হীরালালের শোয়ার ঘরে এলেন কিকিরারা। অবাকই হলেন ঘরটি দেখে। আসবাব যৎসামান্য। একটি পুরনো পালঙ্ক, ড্রয়ার একটি, কাঠের আলমারি, আলনা। দুটি মাত্র চেয়ার। টেবিল নেই। ঘরে চারটি জানলা। কাঠের পাল্লা, গ্রিলও রয়েছে।

যশোদা পালঙ্কটি দেখিয়ে বললেন, "চিঠির টুকরো তিনটি এই বিছানার ওপরেই ছিল।"

কিকিরা আর তারাপদ নজর করে ঘর দেখছিলেন।

কিকিরা বললেন, "যশোদাবাবু, অনেককাল আগে আপনার সঙ্গে দোকানে বেড়াতে গিয়ে একবার হীরালালবাবুকে দেখেছিলাম। চেহারাটি ঠিক মনে নেই। বেঁটে রোগা মতন ভদ্রলোক না ?"

"আজ্ঞে বেঁটে ঠিক নয়, তবে মাথায় খাটো। গায়ের রং ছিল ধবধবে। মাথায় চুল অল্প। ইদানীং সবই পেকে সাদা হয়ে গিয়েছিল।"

"সাজপোশাকও সাধারণ ছিল না ?"

"ধুতি-পাঞ্জাবি। গায়ে ফতুয়া পরতেন। গেঞ্জি কখনও পরেননি। চামড়ার জুতোও পায়ে দিতে পারতেন না।"

"কেন ?"

"পায়ে অনেক কড়া ছিল। ওষুধ বিষুধ করেছেন। কাটিয়েছেন। আবার গজিয়ে যেত। ক্যাম্বিসের পা-ঢাকা জুতো পরতেন।"

"একটা হারমোনিয়াম দেখছি যে মশাই ?"

যশোদা বললেন, "এখানে থাকলে নিজের মনে একটু গান গাইতেন। রামপ্রসাদী গানই বেশি।"

তারাপদ বলল, "ধার্মিক মানুষ।"

"তা ঠিকই। অমন মানুষ কেন যে..."

কথা থামিয়ে কিকিরা বললেন, "চলুন, এবার ওপরে যাওয়া যাক।"

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলে দক্ষিণ দিকে দুটি ঘর। উত্তরে ঘর নেই, ফাঁকা ছাদ। বাড়িটাকে তাই দোতলা না বলে দেড়তলা বলাই ভাল। আকাশে মেঘ রয়েছে। তবে ছেঁড়া ছেঁড়া। বৃষ্টি আপাতত বন্ধ। আলো মরে এসেছে। টুকরো মেঘগুলো জমে গেলেই আবার অন্ধকার হয়ে যাবে।

যশোদা বললেন, "আসুন, ঘর দুটো দেখুন।"

কিকিরারা এগিয়ে গেলেন। পাশাপাশি দুটি ঘর। একটি একেবারে ফাঁকা। মাটিতে একপাশে একটি কার্পেট পাতা। দেওয়ালে মস্ত বড় এক শ্রীগৌরাঙ্গর পট।

যশোদা বললেন, "এটিতে বড়বাবু কখনও-কখনও কীর্তনগানের আসর বসাতেন। বরানগর থেকে বাণীবাবু আসতেন কীর্তন গাইতে। তাঁর দলবল থাকত। আর আমরা থাকতাম। আশপাশের দু'-পাঁচজন।"

কিকিরা দেখলেন ঘরটা। পরিচ্ছন্ন। হীরালাল নেই, তবু ঘরটি যে ঝাঁট পড়েছে, মোছা হয়েছে— বুঝতে কষ্ট হয় না।

পাশের ঘরটি হীরালালের ঠাকুরঘর। একপাশে উঁচু বেদি। বেদির ওপর সাদা মার্বেল পাথরের স্ল্যাব। মাঝখানে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ। কালো পাথরের। আন্দাজে মনে হয়, হাত দুই উঁচু বিগ্রহ। দেখতে সুন্দর। চিৎপুরের পাথর বাজারে যা বিক্রি হয় —সেরকম মামুলি জিনিস নয়। বিগ্রহের দু'পাশে দুটি লম্বা বাতিদান। পেতলের। ঝকঝক করছে। ঘরের ঘোলাটে আলোতেও সেটা চোখে পড়ে। বেদির তিন পাশে গ্লাস ফাইবার, ধোঁয়া রঙের ; সামনের দিকটা খোলা। বেদির তলায় দু' ধাপ সিঁড়ি। সিঁড়ির ধারগুলো আলপনার নকশায় রং করা। দেওয়ালের একটি পাশে দেওয়াল-তাক, কাচের পাল্লা, ভেতরে কয়েকটা রুপোর বাসন, বাটি, চন্দন কাঠ, আরতির পঞ্চপ্রদীপ— এইরকম কত কী ! আর গোল গোল কাচের শিশি। শিশির মধ্যে বাতাসা, কিশমিশ, শুকনো খেজুর, মিছরি। একটা শিশিতে লবঙ্গও রয়েছে। শিশিটা কাত হয়ে গিয়েছে একপাশে।

যশোদা বললেন, "এসব ঠাকুরের।"

"বোঝাই যায়। ... আচ্ছা যশোদাবাবু, ওই ফাইবার গ্লাসগুলো লাগানো হয়েছিল কেন ?"

"ঠাকুরের গায়ে ধুলোময়লা যাতে না পড়ে !"

"ও !" বলে কিকিরা মাথার ওপর তাকালেন, তারপর তারাপদকে বললেন, "দেখেছ ?"

তারাপদ আগেই দেখেছে। এই ঘরের ছাদের ধাঁচটা যেন মন্দিরের চুড়োর মতন।

"চলুন বাইরে যাই," কিকিরা বললেন।

বাইরে, ঠাকুরঘরের পেছনের আর পাশের খানিকটা লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। গ্রিলের রেলিং। হাতকয়েক চওড়া ফাঁকা বারান্দা। ব্যালকনি মতন। ঠাকুরঘরের পেছন দিকের ব্যালকনি থেকে একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়েছে। সিঁড়িটা শেষ হয়েছে যেখানে তার চারপাশে কলাঝোপ আর পাতকুয়ো। কলাঝোপ যথেষ্ট ঘন। তার ওপর বর্ষায় পাতাগুলো যেন বিস্তর বেড়ে উঠেছে। ঝোপ ছাড়ালেই একটা জাম গাছ। জাম গাছের ওপাশে ঢালু জমি। বাঁশঝোপ। তারপর কৃষ্ণধামের পেছন দিকের পাঁচিল।

কিকিরা মন দিয়ে দেখছিলেন।

তারাপদও নজর করে দেখছিল আশপাশ।

কিকিরা বললেন, "যশোদাবাবু, এই সিঁড়িটা দিয়ে নেমে গেলেই কলাঝোপ ?"

"আজ্ঞে।"

"কুয়োর জল কেমন ?"

"ভাল।"

"একটাই কুয়ো নাকি ?"

"না, আরও একটা আছে। গোয়ালঘরের দিকে।"

তারাপদ কী বলতে যাচ্ছিল তার আগেই কিকিরা পায়ের তলা থেকে কী যেন কুড়িয়ে নেওয়ার জন্যে ঝুঁকে পড়লেন। কাচের টুকরো। পায়ে লাগতে পারত। টুকরোটা তুলে নিতে গিয়ে কিকিরার চোখে পড়ল, কয়েকটা লবঙ্গ ছড়িয়ে আছে। বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে অন্যরকম দেখায়।

লবঙ্গগুলো তুলে নিলেন কিকিরা। তারপর চোখের ইশারায় তারাপদকে কিছু বললেন।

তারাপদ বুঝতে পারল।

কিকিরা যশোদাকে নিয়ে অন্যপাশে সরে গেলেন। তারাপদ লোহার সিঁড়ি বরাবর কী যেন খুঁজতে লাগল হেঁট হয়ে।

অন্যপাশে সরে গিয়ে কিকিরা যশোদাকে বললেন, "আপনি হীরালালবাবুর সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোক। উনি যে এরকম একটা কাজ করতে পারেন— আপনাকে আভাসমাত্র দেননি!"

"না।"

"আপনিও বুঝতে পারেননি?"

"না। শুধু বুঝতে পেরেছিলাম উনি মনে-মনে কেমন যেন ভেঙে পড়েছেন। কথায়বার্তায় আফসোস। দুঃখ করতেন।"

"কিসের আফসোস?"

যশোদাজীবন ইতস্তত করছিলেন; শেষে বললেন, "সেভাবে সরাসরি আমায় কিছু বলেননি। বোধ হয় বলতে চাইতেন, পারতেন না। তবে বুঝতে পারতাম, তিনি যা চান না, ভাবতেও পারেন না— এমন একটা ব্যাপার বাড়ির মধ্যে কোথাও হচ্ছে।"

কিকিরা নজর করে দেখলেন যশোদাকে। মনে হল, হীরালালের এই বিশ্বস্ত বন্ধু এবং কর্মচারীটি সঠিক জবাব দিলেন না। কথা লুকোলেন।

কথা পালটে নিলেন কিকিরা। সহজভাবে বললেন, "বাড়িতে তিন ছেলের মধ্যে সদ্ভাব কেমন?"

"আজ্ঞে, হাতের পাঁচ আঙুল যেমন সমান হয় না, সংসারে ভাইবোনরাও সকলে সমান হয় কি! ফারাক থাকবেই।"

"যেমন?"

"যেমন ধরুন, বুদ্ধি-বিবেচনা, সাহস, জেদ, এইরকম আর কি! কেউ ধূর্ত হয় বেশি, লোভী; কেউ যেমন আছে তেমনই থাকতে চায়। কেউ ভিতু, সাবধানী। কেউ বা হালকা স্বভাবের। নিজেরটি নিয়ে থাকে।"

"কথাটা ঠিকই যশোদাবাবু, পাঁচ আঙুল সমান হয় না। ... তা ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান কে?"

"বড়দা কানাইলাল। অতিশয় বুদ্ধিমান বলতে পারেন। সাহসী।"

"মেজো ছেলে?"

"শ্যামলাল— মানে মেজদার কথা আগেই বলেছি। ভিতু ধরনের। শখশৌখিনতাও নেই। সাদামাঠা।"

"আর ছোট ছেলে?"

"কুমারলাল এখনও ঝোঁকের মাথায় চলে। হালকা স্বভাবের, বয়েসও কম। তবে হাল কায়দায় চলতে চায়। তা সে যাই করুক, ভবানীপুরের দোকানের ব্যবসাটা মন্দ চালায় না।"

তারাপদ ততক্ষণে ফিরে এসেছে।

কিকিরা আর কথা বাড়ালেন না। "চলুন, নীচে যাই। ... ভাল কথা, হীরালালবাবু চলে যাওয়ার পর ওপরতলার ঠাকুরঘর, বাইরের এই জায়গাগুলো ঝাঁট পড়েনি? মোছামুছি করেছে তো?"

"মনে হয় করেনি। সকলেই বড়বাবুকে খোঁজাখুঁজিতে ব্যস্ত। আমি না হয় জিজ্ঞেস করব ওদের?"

"করবেন?... আপনিও তো ব্যস্ত। চলুন যাই, চা-টা খেতে হবে।"

কিকিরারা নীচে নেমে গেলেন।

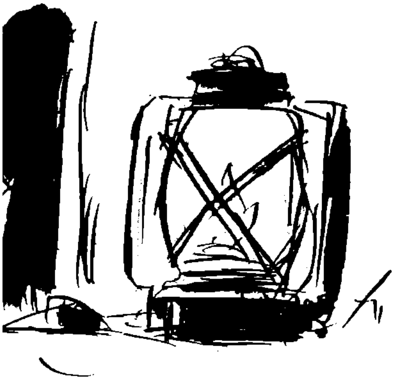

॥ ৪ ॥

কিকিরা আর তারাপদ মুখোমুখি বসে কথা বলছিল। ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে। সন্ধে পেরিয়ে গিয়েছে, তবে রাত নয়। তবুও, এই ফাঁকা জায়গায় সন্ধে-রাতই যেন অনেক। বাইরে বৃষ্টি নেই, ঝিঁঝি ডাকছে। বাঁশবাগান আর কলাঝোপের দিক থেকে ক্রমাগত ব্যাঙ ডেকে যাচ্ছিল।

কিকিরা বললেন, "তারা, চিঠিগুলো— মানে, হীরালালবাবুর লেখাগুলো আমি বারবার পড়েছি। আমার কী মনে হয় জানো ?"

"কী ?"

"ভদ্রলোক ব্যবসাদার হলেও সৎ সরল মানুষ। তিনি শুধু ধর্মকর্ম করতেন না, মনে-মনেও অধর্ম করার কথা ভাবতেন না। তাঁর কাছে ধর্ম ভেক ছিল না। অথচ নিজের সংসারের মধ্যেই এমন কোনও অন্যায় অধর্ম হচ্ছিল যা তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। আবার মুখ ফুটে বলতেও পারছিলেন না।"

"কেন ?"

"এরকম হয়। বুড়োমানুষ, সংসারের সাতপাঁচে থাকতেন না। বলতে গিয়ে যদি বিপত্তি হয়। তা ছাড়া আমার ধারণা, বলার মতন জোর প্রমাণও তাঁর হাতে ছিল না। হয়তো সন্দেহ করেছিলেন। কানাঘুষো শুনেছিলেন..."

"হতে পারে। তবে কিসের সন্দেহ ?"

"সেটাই ভাবছি। যশোদাবাবুর পেটে এখনও কথা আছে। বলতে পারছেন না।"

"তা হলে মামলা ছেড়ে দিন, সার। আমার মনে হয়, আত্মহত্যা করার কথাটা বাজে। এখানে কেউ আত্মহত্যা করলে আজ ক'দিনে তার কোনও হদিস মিলবে না ?"

"তোমার কথাটা ঠিকই। আমারও মনে হয় না, হীরালালবাবু সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করেছেন। ... আরে, একটা মানুষ যখন আত্মহত্যা করতে যায় তখন কি সে ঠাকুরঘরের লবঙ্গর শিশি থেকে এক মুঠো লবঙ্গ তুলে নিয়ে চলে যায় ! অসম্ভব ! তখন তার মনের সে-অবস্থা থাকে না।"

তারাপদ বলল, "আপনি ওপরে লোহার ঘোরানো সিঁড়ির সামনে লবঙ্গ পেয়েছেন সার, আমি সিঁড়ির নীচের ধাপেও গোটা দুয়েক পেয়েছি।"

"ভদ্রলোক যাওয়ার আগে ঠাকুরঘরে ঢুকেছিলেন। হয়তো ঠাকুর প্রণাম করতে। তারপর কাচের আলমারি থেকে এক মুঠো লবঙ্গ তুলে নিয়ে সিঁড়ির পথ ধরেই কলাঝোপ আর বাঁশঝাড়ের আড়াল দিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন কোথাও।"

তারাপদ মাথা নাড়ল। বলল, "বেশ বুদ্ধি করেই পালিয়েছেন। যশোদাবাবুকে কোন এক নার্সারি দেখে আসতে বলে, কাজের লোকদের চোখে ধুলো দিয়ে দিব্যি গা-ঢাকা দিলেন ! কিন্তু সার, ওই বুড়োমানুষ কোথায় যেতে পারেন ! এখানে কাছাকাছি লুকিয়ে থাকার জায়গা কোথায় পাবেন ? সবই তো ফাঁকা।"

কিকিরা মাথা দোলাতে লাগলেন। ভাবছিলেন। পরে বললেন, "শোনো বাপু, আমাকে একটু ভাবতে দাও। হীরালাল আত্মহত্যা করেননি বলেই আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু তিনি কোথায় লুকিয়ে আছেন বুঝতে পারছি না। আরও বুঝতে পারছি না, ভদ্রলোক কেন, কিসের জন্যে এই নাটক করছেন ! বাড়ির গণ্ডগোল একটা কারণ হতে পারে। সেই গণ্ডগোল কেমন ? কে বা কারা করেছে ? কেনই বা ? ... তা আপাতত আমরাও আর এখানে থাকছি না। কালই ফিরে যাব কলকাতায়। আবার আসব আসছে হপ্তায়। শুক্র বা শনিবার। চাঁদুও ততদিনে ফিরে আসছে। তখন একবার চেষ্টা করা যাবে।"

তারাপদ বলল, "এই ক'দিন কী করবেন ?"

"দাশবাবুর পারিবারিক খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করব। দোকানগুলো দেখব। আর ফন্দিফিকির খুঁজব।"

"দেখুন চেষ্টা করে।"

"তুমি একবার যশোদাবাবুকে ডেকে আনো। কথা বলব।"

তারাপদ বাইরে গেল যশোদাজীবনকে ডাকতে।

ক' মুহূর্ত পরেই যশোদা এলেন।

কিকিরা বললেন, "যশোদাবাবু, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।"

"বলুন।"

"আমরা কাল ফিরে যাব। ... না, না, আসব আবার, আসছে হপ্তায়— শুক্র বা শনিবার। এর মধ্যে আপনি যেভাবে খবরটা চেপেচুপে আছেন সেইভাবে থাকবেন। থানা-পুলিশ করবেন না। মেজোবাবু ছোটবাবুকে সামলে রাখবেন।"

"বড়দা ?"

"তাঁকে আলাদা করে খবর না দিলেই ভাল। তবে তিনি যদি নিজেই ফিরে আসেন কাশী থেকে অন্য কথা। ... ক'টা দিন সবুর করে থাকুন, হইচই করবেন না। একটা কথা জানবেন, আপনার বড়বাবু সত্যি-সত্যি আত্মহত্যা করেননি। আর যদি করেও থাকেন তবে এখানে কোথাও নয়। বুঝলেন !"

মাথা নাড়লেন যশোদাজীবন।

॥ ৫ ॥

পরের শুক্রবারই এলেন কিকিরা। একা।

বর্ষাবাদলা নেই। ভাদ্রমাসের চড়া রোদ থাকছে দিনভর। গাছপালার সেঁতানি ভাব শুকিয়ে এসেছে অনেকটা। রাত্রে হালকা জ্যোৎস্না। শুক্লপক্ষ চলছে।

এসেই বললেন, "আপনাদের বড়দা ফিরেছেন নাকি ?"

"না। দু-চারদিনের মধ্যেই আসছেন।"

"বাড়িতে হইচই হচ্ছে ?"

"আজ্ঞে তা তো হবেই। মেজদাকে আমি সামলে রেখেছি। কিন্তু ছোড়দা আর শুনতে চাইছে না। বলছে, বাবার আত্মহত্যা করার কথাটা না

হয় চেপে গেলুম। হারিয়ে যাওয়ার কথাটা তো পুলিশকে জানাতে পারি।"

কিকিরা একটু হাসলেন। বললেন, "মিসিং! তা অবশ্য জানাতে পারেন ; তবে মিসিংয়ের সঙ্গে অনেক ফ্যাকড়া জড়িয়ে আছে। সুতোর জট খুলতে গেলে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আপনাদের ছোড়দার জানা নেই।"

যশোদা মাথা হেলালেন। মানে, তিনি বোঝেন সবই।

সামান্য চুপচাপ থাকার পর কিকিরা হঠাৎ বললেন, "আপনাদের এখানে শুকনো খড় পাওয়া যাবে। খড়ের আঁটি?"

যশোদা অবাক! হকচকিয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা। "আজ্ঞে খড়?"

"খড়ের আঁটি! গোরু গোয়ালঘর যখন রয়েছে এখানে— আপনাদের কৃষ্ণধামে তখন খড় পাওয়া সহজ! না কি!"

"পাওয়া যাবে।"

"ধরুন একটু বেশিই লাগবে।"

"দেখি। খড়ের গাড়ি এ হপ্তায় আসেনি। জোগাড় হয়ে যাবে!"

"আপনাদের এখানে কেরোসিন তেল দিয়েই লণ্ঠন জ্বলে। চার-পাঁচ বোতল বা ধরুন দু'-চার লিটার তেল পাব নিশ্চয়।"

যশোদা কিছুই বুঝলেন না। তাকিয়ে থাকলেন হাঁ করে।

কিকিরা মুচকি হাসলেন। ঠাট্টার গলায় বললেন, "ঘাবড়ে যাবেন না। ভয়ের কিছু নেই। ... শুনুন, কাল আমার জন্য দুই লোক লাগবে। মালি আসবে না?"

"আসতে পারে।"

"ঠিক আছে। ... না এলে আপনাদের এখানে কাজের লোক আছে। দুটো ঠিকে মজুর ধরে দিতে পারবেন না?"

যশোদা কিছু না বুঝলেও মাথা নাড়লেন। পরে বললেন, "তারাপদবাবু এলেন না?"

"কাল আসবে। অফিস সেরে। আমি আগে আগে এলুম কাজ খানিকটা গুছিয়ে রাখতে। একটাই শুধু আমার ভয় মশাই, হঠাৎ করে যদি বৃষ্টি নেমে যায় কাল-পরশু— তবেই বিপদ।"

"আর এখন নামবে বলে মনে হয় না। ক'টা দিন একটু মাঠঘাট শুকুক। তবে ভাদ্রমাস, বলা যায় না কিছুই।"

পরের দিন তারাপদ এল। বিকেল-বিকেল। কাঁধে কিটব্যাগ, হাতেও একটা নাইলনের ছোট হাত-ঝোলা।

কিকিরা বাগানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বোধ হয় অপেক্ষা করছিলেন তারাপদর। বললেন, "সংবাদ কী?"

"ভাল।"

"চাঁদু?"

"সারের অ্যাডভাইস জানিয়ে এসেছি। হাজির থাকবে সময় মতন। আপনার কাজ কতটা এগুলো?"

কিকিরা আঙুল দিয়ে কৃষ্ণধামের কম্পাউন্ড-ওয়ালের দিকটা দেখালেন। বললেন, "দুটো পাশ হয়ে গিয়েছে। বাকি দু' পাশ কাল দুপুরের মধ্যেই হয়ে যাবে। যাও না, একবার দেখে এসো।"

তারাপদ এগিয়ে গিয়ে দেখে এল। বলল, "সার, গর্তগুলো আগুপিছু কেন?"

কিকিরা মুচকি হাসলেন। "একে বলে জিগজাগ ট্রেঞ্চ। অবশ্য এটা ট্রেঞ্চ নয়। মানে, মাটি কাটা নালা নয় হে, ফুট তিনেক অন্তর একটা করে গর্ত। তা গর্তগুলো ফুট দুই-আড়াই হবে, তলার দিকে, ডিপ আর কী! আর গোললাইয়ের মাপও মোটামুটি ওইরকম। ... আগুপিছু— জিগজাগ করার মানে হল, তফাত থেকে দেখলে চোখের ভুল হবে। বোঝা যাবে না, একটা গর্ত থেকে আর-একটা গর্তের মধ্যে হাত কয়েক তফাত। আগুন যখন জ্বলবে, দূর থেকে দেখলে মনে হবে, একটানা দাউদাউ করে জ্বলছে।"

তারাপদ হেসে বলল, "এটা কি আপনার ম্যাজিশিয়ানের টেকনিক?"

"খানিকটা তো বটেই," বলে আবার হাত তুলে একটা জায়গা দেখালেন, "ওই যে দেখছ জায়গাটা, ওখানে যত রাজ্যের গাছের শুকনো পাতা ঝেঁটিয়ে এনে জমানো হয়েছে। আরও দু-চার ঝুড়ি কাল জমানো যাবে। খড় রেডি। কেরোসিন তেল মজুত। আর তুমি তো অন্য মালমশলাও এনেছ!" অন্য মালমশলা বলতে খানিকটা গন্ধক।

বাগান থেকে বাড়ির দিকে হাঁটতে-হাঁটতে তারাপদ বলল, "সবই না হয় হল। আপনি লঙ্কাদহন পর্বটা সারলেন, কিন্তু যার জন্য এত— সেই ভদ্রলোক যদি ধরা না দেন!"

"না দিলে করার কিছু নেই। আমরা যশোদাবাবুকে বলব, আপনারা থানা-পুলিশ করুন, আমাদের দিয়ে হল না।"

তারাপদ যশোদাজীবনকে দেখতে পেল, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। বলল কিকিরাকে।

কিকিরা গলা নামিয়ে বললেন, "তারাপদ, কাল তুমি যশোদাবাবুর ওপর নজর রাখবে। উনি যেন এই বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে যেতে না পারেন। এমনিতেই ভদ্রলোক ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছেন। মগজে কিছুই ঢুকছে না ওঁর। তার ওপর কাল সন্ধের ঝোঁকে যখন বাড়ির চারপাশে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠবে, উনি বোধ হয় পাগলামি শুরু করবেন।"

তারাপদ সে-কথার কোনও জবাব দিল না। শুধু বলল, "হীরালালবাবু এখানেই কাছাকাছি কোথাও আছেন বলে আপনার ধারণা। যদি না থাকেন— ?"

"না থাকেন? দ্যাখো তারাবাবু, আমি ফিশিং এক্সপার্ট নই, তবে শুনেছি এক-একরকম মাছের জন্যে এক-একরকম চার কাজে লাগে। বঁড়শিরও হেরফের হয়। হীরালালবাবুর এই কৃষ্ণধামই আমার টোপ। এই টোপে হয় তিনি ধরা দেবেন, না হয় আমরা হার মেনে নিয়ে ফিরে যাব। ... যাক্ গে, চাঁদুকে সব ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছ তো?"

"দিয়েছি। ও জায়গাটা আন্দাজ করতে পেরেছে। এদিকে একবার ওদের ক্যাম্প বসেছিল। ডাক্তারদের ক্যাম্প। ... ও ঠিক সময়ে হাজির হয়ে নিজের পজিশন নেবে।" তারাপদ হাসল।

"ভাল কথা। দেখা যাক কী হয়?"

বারান্দায় উঠে এলেন কিকিরা। যশোদাজীবন দাঁড়িয়ে আছেন। দেখলেন তারাপদকে। কিকিরা হেসে বললেন, "যশোদাবাবু, আমার চেলা এসে গিয়েছে। বলেছিলুম না, সময় মতন চলে আসবে।"

যশোদা বললেন, "দেখেছি ওঁকে। আসুন, চা তৈরি, ডাকতেই এসেছিলাম আপনাকে।"

"চলুন।"

॥ ৬ ॥

দূর থেকে দেখলে মনে হবে, সত্যি-সত্যিই কৃষ্ণধামে আগুন লেগে গিয়েছে। কম্পাউন্ড-ওয়ালের কাছাকাছি মাটি খুঁড়ে করা গর্তগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া শুকনো খড়, গাছের পাতা জ্বলে উঠেছে দাউদাউ করে। ভাদ্রমাসের বাতাসে দমকা নেই, তবু যেটুকু হাওয়া দিচ্ছিল ফাঁকা মাঠে তাতেই শিখা উঠেছে আগুনের, ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে আশপাশ। বোঝা যাচ্ছে না, একটা গর্তের সঙ্গে অন্য গর্তের হাত কয়েক ফাঁক আছে। এই মাঠে, দু'-পাঁচটা ঝোপঝাড় গাছপালার মধ্যে সামান্য আগুনেই কম হলকা

ছড়ায় না। আর এই সন্ধেবেলার মুখেই ঝাপসা জ্যোৎস্নার মধ্যে কৃষ্ণধামের আগুন কার না নজরে পড়বে ! কাছাকাছি গাঁ-গ্রাম নেই, তবু সামান্য তফাতে দু'-চার ঘরের বসতি তো আছেই, আছে এক-আধটা ছোট নার্সারি-বাগান। লোকজন সাকুল্যে হয়তো দশ-পনরোজন। প্রথমটায় হয়তো এরা হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর মাঠ ভেঙে ছুটে আসতে লাগল।

যশোদাজীবন হতবাক ! কী যে হচ্ছে তিনি বুঝতেই পারছিলেন না। ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা অবস্থা তাঁর। কৃষ্ণধামের কাজের লোক তো তিনটি— তারাও বোকার মতন এই অগ্নিকাণ্ড দেখছিল।

ঠিক যে কতক্ষণ সময় কাটল, বোঝা গেল না। হঠাৎ চন্দনের গলা পাওয়া গেল, চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলছে, "তারা, ধরে ফেলেছি, শিগ্‌গির আয়, ধরা পড়ে গিয়েছেন।"

তারাপদ ফটকের দিকে দৌড়ে গেল। খোলাই ছিল ফটক। চন্দনকে দেখতে পেল তারাপদ, বুড়োমতন এক ভদ্রলোককে জাপটে ধরে রেখেছে চন্দন।

হীরালাল।

বারান্দায় একটা চেয়ারে বসানো হল হীরালালকে। ভদ্রলোকের যেন হুঁশ নেই। কী দেখছেন, কাদের দেখছেন— বোঝাই যায় না। কাঁপছেন তখনও। কপালে ঘাম। চন্দন একবার নাড়ি দেখল ভদ্রলোকের। বলল, "আগে জল দিন ওঁকে, একটা পাখা এনে বাতাস করুন কেউ।"

যশোদা প্রায় কেঁদে ফেললেন, "বড়বাবু !"

জল এল, পাখাও এল।

হীরালাল জল খেলেন, চোখেমুখে দিলেন। একজন পাখার বাতাস করতে লাগল।

আগুন ধরেছে দেখে যারা ছুটে এসেছিল তারা দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর যশোদার কথায় চলে গেল একে-একে। কৃষ্ণধামের গায়ে কোথাও আগুনের চিহ্ন নেই, বাগান ছাড়িয়ে পাঁচিলের গায়ে-গায়ে যা আগুন জ্বলছে তখন, তাও নিভে এসেছে বারোআনা।

হীরালাল কাশছিলেন। যশোদা বড়বাবুর জন্যে লবঙ্গ আনতে বললেন।

প্রায় মিনিট পনেরো পরে হীরালাল খানিকটা সুস্থ হলেন। যশোদাকে বললেন, "এসব কী ? এঁরা কারা ?"

কিকিরাই কথা বললেন, "আমরা আপনার খোঁজেই এসেছিলাম। আমি কিঙ্করকিশোর রায়, লোকে বলে কিকিরা। এরা দু'জন আমার চেলা, তারাপদ আর চন্দন। ... আমরা নিজের গরজে আসিনি মশাই, যশোদাবাবু আমার চেনা লোক, উনিই আমায় ধরে এনেছিলেন।"

"আপনারা পুলিশ... ?"

"না। আপনি যা করেছিলেন— তাতে থানা-পুলিশ করা যেত। করা হয়নি। আপনি বুড়োমানুষ, আপনার মতন মানুষের কাণ্ডজ্ঞান থাকার কথা। তবু এমন ভীমরতি ধরল কেন ? আপনি কি জানেন না, আত্মহত্যা করার শাসানিও পুলিশ ভাল নজরে দেখে না। কেন আপনি এসব থিয়েটার করতে গিয়েছিলেন ! কেন ?"

হীরালাল কথা বলতে পারছিলেন না। অসহায়ের মতন মুখ করে যশোদার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ জলে ভরে আসতে লাগল। বিপন্ন, হতবুদ্ধি মানুষ।

কিকিরা বললেন, "কী হয়েছিল আপনার ? ... আমি আপনার লেখা কাগজের টুকরোগুলো পড়েই বুঝেছিলাম— আত্মহত্যা করার মানুষ আপনি নন। এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছেন।"

হীরালাল আধ-বোজা গলায় বললেন, "আপনারা আমায় ধরে আনলেন !"

"আমরা নিমিত্ত ; আপনাকে ধরে এনেছে— আপনার কৃষ্ণধাম। আপনার এত সাধের, এমন ভক্তি-ভালবাসার বাড়ি, বিগ্রহ পুড়ে যাবে— সে কী আপনি জীবন থাকতে সইতে পারেন ! দেখুন মশাই— মানুষ যা ভালবাসে অন্তর দিয়ে, ভক্তি করে, বিশ্বাস করে— তার ক্ষতি সইতে পারে না। আপনি ধার্মিক মানুষ, বিশ্বাসী মানুষ, ন্যায়-অন্যায় বোধ রয়েছে। সৎ সহজ ভদ্রলোক আপনি। এই কৃষ্ণধাম আপনাকে টেনে এনেছে। কিন্তু কোন আঘাতে অভিমানে আপনি চিঠিগুলো লিখেছিলেন বলুন তো ?"

হীরালাল প্রথমটায় কথা বলতে পারছিলেন না। ঠোঁট কাঁপছিল।

"বলুন ! সত্যি কথাই বলুন।"

"আমার বড় ছেলে—" হীরালাল বললেন। "আমার বড় ছেলে কানাই যা করতে যাচ্ছিল তার চেয়ে বড় অন্যায় অধর্ম কী হতে পারে !"

"কী করতে যাচ্ছিল ?"

"আমাদের শ্যামবাজারের আদি দোকানে আগুন লাগাবার ফন্দি করেছিল। দোকানের গায়ে একটা ছোট দরজির দোকানও আছে। ভাল চলে না আজকাল। আমাদের দোকান অনেক আগেই ইনসিওর করিয়ে নিয়েছিল ছেলে। পরে আরও মোটা টাকায় ইনসিওর করায়। দোকান বেড়েছে, মালপত্র বেড়েছে, কাজেই অসুবিধে হয়নি।"

কিকিরা তারাপদদের দিকে তাকালেন।

হীরালাল বললেন, "হঠাৎ একদিন আমার কানে গেল, কানাই দোকান থেকে তলায় তলায় দামি শাড়ি কাপড়চোপড় সরাচ্ছে। এর পর ভাড়াটে লোক দিয়ে আগুন ধরাবে। তারপর ইনসিওরেন্স থেকে টাকা নেবে। বখরার ব্যবস্থাও করে রেখেছিল বোধ হয়। দোকান পুড়িয়ে সে নতুন করে সাজিয়ে পশার বসাবে। এয়ারকন্ডিশন করবে। দরজির দোকানটাকে কিছু টাকা দিয়ে তুলে দেবে। ... বলুন, এ অধর্ম নয়, পাপ নয়, জুয়াচুরি নয় ! আমি আমার কাঁধে, মাথায় শাড়ির বোঝা বয়ে জীবন শুরু করেছিলাম। অনেক রক্ত জল করে আমার ওই দোকান। প্রায় চল্লিশ বছরের... ! সেই দোকানে আজ ও আগুন লাগাবে !" হীরালাল কপাল চাপড়ে ছেলেমানুষের মতন কেঁদে ফেললেন।

তারাপদ বলল, "আপনি ছেলেকে বলতে পারেননি কিছু ?"

"না বাবা, পারিনি। যদি অস্বীকার করত ! তা ছাড়া কী জানো ? সন্তানস্নেহ মানুষকে শুধু অন্ধ করে না, তার বিবেককেও বোবা করে রাখে। ধৃতরাষ্ট্রের কথাই মনে করো।"

কিকিরা বললেন, "আপনার বড় ছেলে দেখছি অতি ধূর্ত, সে নিজে গিয়ে কাশীতে বসে থাকল কাজের ছুতোয়, আর এখানে দোকান পোড়াবার জন্যে লোক লাগিয়ে গেল ! যেন তাকে কেউ সন্দেহ না করে।"

"ঠিকই বলেছেন আপনি। ... আমি ভেবেছিলাম চিঠিগুলো ছেলেদের হাতে পড়লে হয়তো..."

"আপনার মেজো ছেলে, ছোট ছেলে— এসব কিছু জানে না ?"

"না।"

"আপনি কোত্থেকে জানলেন ?"

হীরালাল মুখে বললেন না কিছুই। শুধু ঘাড় তুলে একবার যশোদার দিকে তাকালেন।

"তা কোথায় লুকিয়ে ছিলেন এতদিন ?"

"মিশনারিদের বাড়িতে। ওখানকার সরকারবাবু আমার জানাশোনা। বন্ধুর মতন। ওঁর আশ্রয়েই ছিলাম।"

কিকিরা তারাপদদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

(সমাপ্ত)

ছবি : দেবাশিস দেব

আমি অর্জুন

সমরেশ মজুমদার

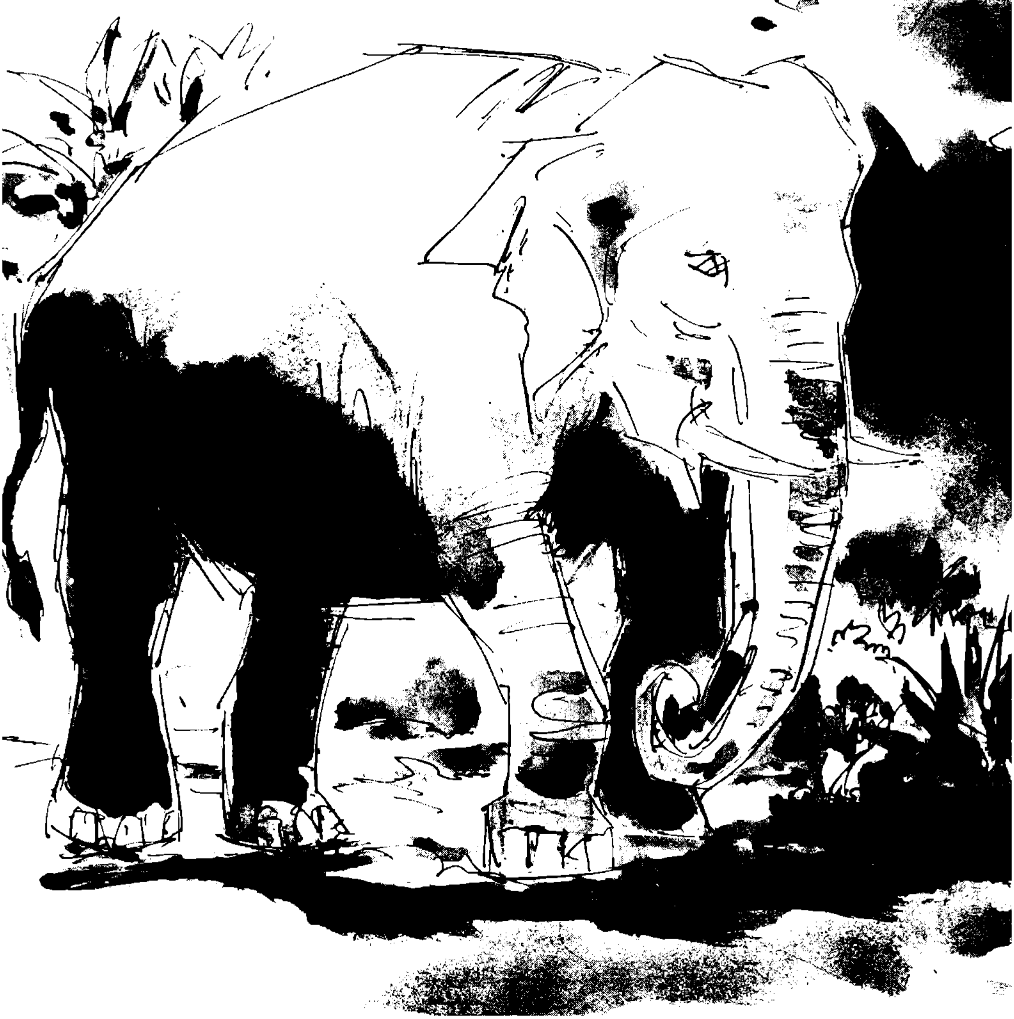

সম্পূর্ণ গোয়েন্দা উপন্যাস

কদমতলার মোড়ে পানুর চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে আড্ডা মারছিল অর্জুন। অনেকদিন বাদে স্কুলের বন্ধুরা একসঙ্গে হওয়ায় আড্ডাটা জমেছিল। কলেজ পার হয়ে ওদের অনেকেই এখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে ভাল চাকরি করছে। জলপাইগুড়িতে আসাই হয়ে ওঠে না, যখন আসে তখন সবাই একসঙ্গে হয় না। এবার হয়েছে। শঙ্কর বলল, "তুই বেশ আছিস অর্জুন!"

"কীরকম?" অর্জুন চায়ে চুমুক দিল।

"গোলামি করতে হয় না। সবসময় অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে থাকিস। আর সেইসঙ্গে বিদেশে ঘুরে আসছিস। কপাল করেছিলি বটে!"

সুবোধ বলল, "তবু কিন্তু ওর নিশ্চয়তা নেই। মানে, কাল কোনও কেস আসবেই এমন তো কথা নেই। না এলে ঝুঁকি বাড়বে। আমাদের মতো মাস গেলে মাইনের নিশ্চয়তা ওর নেই।"

শঙ্কর প্রতিবাদ করল, "একজন উকিল বা ডাক্তারও একই কথা বলতে পারেন। আর অর্জুনের প্রফেশন ততদিন থাকবে যতদিন পৃথিবীতে মানুষ বাস করবে। খুনখারাপি এবং প্রতারণা তো বন্ধ হবে না কখনও।"

অর্জুন কিছু বলছিল না। সে মিটিমিটি হাসছিল আর চা খাচ্ছিল। সত্যসন্ধানী হওয়ার পর আত্মীয়স্বজনের ধারণা হয়েছে অর্জুনের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। এ-দেশে শার্লক হোম্‌স হওয়ার চেষ্টা করা বোকামি। কিন্তু অর্জুন সেই বোকামিই করতে চায়।

অজিত বলল, "এতদিন পরে আমরা একসঙ্গে হলাম, চল ডুয়ার্সের কোনও বাংলোয় গিয়ে আমরা একরাত কাটিয়ে আসি।"

ব্যাপারটা সবার মনে ধরল। কোন বাংলোয় যাওয়া হবে এই আলোচনা চলল। সবাই কথা বলছে তাদের স্কুলজীবনের শোনা অভিজ্ঞতা থেকে। শেষপর্যন্ত অর্জুন বলল, "যেতে হলে চাপড়ামারি চল।"

অজিত জিজ্ঞেস করল, "চাপড়ামারি?"

অর্জুন বলল, "জলপাইগুড়ি থেকে তিস্তা নদী পেরিয়ে বার্নিশ, ময়নাগুড়ি, লাটাগুড়ি হয়ে হাইওয়ে ধরে ডান দিকে ঘুরে খুনিয়ার মোড়।

সেখান থেকে বিন্দুর দিকে কিছুটা এগিয়ে গেলে ডান দিকে চাপড়ামারি ফরেস্ট। জঙ্গলটা বেশ ঘন, প্রচুর বন্যপ্রাণী ঘুরে বেড়ায়।"

শঙ্কর জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে যাব আমরা ?"

অজিত বলল, "একটা অ্যাম্বাসাডারেই সবাই যেতে পারব। কাকার গাড়িতে হয়ে যাবে। জঙ্গলে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুধু আড্ডা মারব। আঃ !"

গাড়িটা অজিতই চালাচ্ছিল। ওর কাকার বুড়ো ড্রাইভারকে সঙ্গে আনেনি, এতে একটু জায়গা যেমন বাড়ল তেমনই বন্ধুদের মধ্যে খোলামনে কথাও বলা যাবে। অর্জুন ডি এফ ও অফিসে ফোন করে বাংলোয় জায়গা করে রেখেছিল। ওরা রওনা হয়েছিল দুপুরে, খেয়েদেয়ে। লাটাগুড়ি বাজারে পৌঁছে গাড়ি থামাল অজিত। ভালমন্দ খেতে হলে এখান থেকে বাজার করে নিয়ে যেতে হবে। সুবোধ আর শঙ্কর বেরিয়ে পড়ল।

অজিত বলল, "জায়গাগুলো খুব পালটে গেছে, তাই না ?"

অর্জুন বলল, "পালটালেও মূল চরিত্র একই আছে।"

অজিত বলল, "ডুয়ার্সের সৌন্দর্য অসাধারণ। ঠিকমতো প্রচার হলে টুরিস্টরা দলে-দলে আসবে। কেন যে প্রচার হয় না ?"

ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল তার সামনেই একটা চায়ের দোকান। দোকানের বাইরে বেঞ্চিতে তখন একজনই খদ্দের বসে চা খাচ্ছিলেন। তার দিকে তাকিয়ে অর্জুনের মনে হল, ইনি স্থানীয় মানুষ নন। সঙ্গে একটা ঝোলা আর ক্যামেরা নিয়ে স্থানীয় মানুষ এখানে বসে চা খাবেন না।

মাঝবয়সী ভদ্রলোক চায়ের দাম মিটিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। অর্জুন বুঝল উনি বাসের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

এই সময় সুবোধরা ফিরে এল। এক রাতের জন্যে ওরা যা বাজার করেছে তার অর্ধেকও শেষ হবে না। মুরগিই নিয়েছে তিন-তিনটে। ওগুলো গাড়ির ডিকিতে তুলতেই ওই ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, "এক্সকিউজ মি।"

শঙ্কর সাহেবি কেতায় মাথা নাড়ল, "ইয়েস।"

ভদ্রলোক ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কি ন্যাশনাল হাইওয়ের দিকে যাচ্ছেন ? আসলে আমি এখানে আউটসাইডার। বাস কখন আসবে বুঝতে পারছি না। যদি আপনাদের অসুবিধে না হয় তা হলে একটা লিফ্‌ট চাই।"

অজিত জিজ্ঞেস করল, "আপনার পরিচয় ?"

ভদ্রলোক কার্ড বের করে অজিতকে দিলেন। অজিত সেটা দেখে অর্জুনকে দিল। অর্জুন পড়ল, আর এন প্রসন্ন, ফ্রিলান্স জার্নালিস্ট, হিন্দু অ্যান্ড ন্যাশনাল জিওগ্রাফি। বাঙ্গালোরের ঠিকানা।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি এখানে ?"

"ছবি তুলতে। ডুয়ার্সের জঙ্গলের ওপর স্টিল ছবি তুলে যদি মনে হয় ইন্টারেস্টিং তা হলে পরে ভিডিও নিয়ে আসব ডিসকভারি চ্যানেলের জন্যে। আমি জলদাপাড়া থেকে আসছি। যে ট্যাক্সিটা নিয়েছিলাম সেটার এঞ্জিন গোলমাল করাতে ড্রাইভার আমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে গেল।"

"আপনি এখন কোথায় যাবেন ?"

"ম্যাপ বলছে ন্যাশনাল হাইওয়ের ওপাশে গভীর জঙ্গল আছে। ওখানে যদি থাকার জায়গা পাওয়া যায় তা হলে—।"

"পাশেই তো গোরুমারা ফরেস্ট রয়েছে। সেখানে যাচ্ছেন না কেন ?"

"জলদাপাড়ায় যাওয়ার পথে গিয়েছিলাম। বড্ড ফাঁকা, ইন্টারেস্টিং ফিচার কিছু পাইনি। বড্ড বেশি মানুষের যাতায়াত ওখানে।"

অর্জুন বলল, "ঠিক আছে, আপনি গাড়িতে উঠতে পারেন।"

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, "অনেক ধন্যবাদ আপনাদের।"

গাড়ি চালাতে-চালাতে অজিত জিজ্ঞেস করল, "আপনি যখন বাঙ্গালোরের তখন এরাপল্লি প্রসন্ন নিশ্চয়ই আপনার কেউ হন, তাই না মিস্টার প্রসন্ন ?" অজিতের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটেছে, আয়নায় দেখতে পেল অর্জুন।

"নো, নো। উনি কত বড় ক্রিকেটার। আমরা ওঁর জন্যে গর্বিত। কিন্তু আমার সঙ্গে আত্মীয়তা দূরে থাক, আলাপ পর্যন্ত নেই।" মিস্টার প্রসন্ন বললেন।

কিন্তু আপনি যদি বলতেন উনি আপনার দাদা, তা হলে আমরা তাই মেনে নিতাম, আপনারও খাতির বেড়ে যেত।" অজিত হাসল।

"সরি মিস্টার। আমি যা নই তা সাজার মতো ইচ্ছে যেন কখনও আমার না হয়। মিথ্যে কথা বলা আমি ঘেন্না করি।" বেশ জোরের সঙ্গে কথাগুলো বললেন মিস্টার প্রসন্ন।

ভদ্রলোককে ভাল লেগে গেল অর্জুনের। বাঙ্গালোরের একটি মানুষ এতদূরে চলে এসেছেন জঙ্গলের ছবি তুলবেন বলে, এটাও তো কম কথা নয় !

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার প্রসন্ন, আপনি কি খুব অল্পে উত্তেজিত হন ?"

ভদ্রলোক হকচকিয়ে গেলেন, "কেন ?"

"আমার বন্ধু আপনার সঙ্গে রসিকতা করছে। আপনি কিছু মনে করবেন না।" অর্জুন কথাগুলো বলতেই মিস্টার প্রসন্ন হাসলেন।

দু'পাশে জঙ্গল, মাঝখানে সরু পিচের রাস্তা ধরে গাড়ি ছুটে যাচ্ছিল। গোরুমারা ফরেস্ট ঢোকার পথটা পেরিয়ে এল ওরা। অজিত বলল, "ছেলেবেলায় তো কেউ আমাদের জঙ্গলে নিয়ে যায়নি। তখন গোরুমারার নাম শুনলেই মনে হত জঙ্গলের গোরুদের বাঘ মেরে খেয়ে নেয় বলেই ওই নামকরণ।"

সুবোধ হাসল, "তা হলে সেগুলো বুনো গোরু।"

সবাই হাসল। শুধু মিস্টার প্রসন্ন চুপচাপ। তিনি বাংলা বোঝেন না।

হাইওয়েতে পড়ে ডান দিকে বাঁক নিয়েই অর্জুন বলল, "মিস্টার প্রসন্ন, আমরা চাপড়ামারি ফরেস্টে যাচ্ছি। আপনি কোথায় যাবেন ?"

মিস্টার প্রসন্ন একটা নোটবই বের করে দেখে নিয়ে খুব খুশি হয়ে বললেন, "তা হলে তো খুব ভাল হল। ওই ফরেস্টের নাম আমার

ডায়েরিতে রয়েছে। ওখানেই যাই তা হলে।"

শঙ্কর বলল, "কিন্তু থাকবেন কোথায় ? আপনার তো বুকিং নেই।"

মিস্টার প্রসন্ন মাথা নাড়লেন, "একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

অর্জুন বুঝল এইভাবে বাংলো পর্যন্ত মিস্টার প্রসন্নের সঙ্গে জুটে যাওয়া বন্ধুরা পছন্দ করছে না। কিন্তু ভদ্রলোককে তো জোর করে নামিয়ে দেওয়া যায় না। খুনিয়ার মোড় থেকে বিন্দুর রাস্তাটা আরও সুন্দর। সোজা গেলে জলঢাকা হাইড্রোইলেকট্রিক্যাল প্রজেক্টে পৌঁছনো যায়। দু'পাশে শুধু জঙ্গল। বাঁক ঘুরতেই অজিত ব্রেক কষল। তিরিশ গজ দূরত্বে রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক হাতি। তার মুখ খাড়ির দিকে। অজিত চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী করব ?"

সুবোধ ফিসফিস করল, "ব্যাক কর। বুনো হাতি। ডেঞ্জারাস।"

অর্জুন বলল, "না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক। এখন নড়াচড়া করলেই ও তেড়ে আসবে। স্টার্ট বন্ধ করে দে।"

অজিত তাই করল। হাতিটা নড়ছে না। মিনিট-তিনেক সময়কে অনন্তকাল বলে মনে হচ্ছিল ওদের। তারপর শুঁড় তুলে হাতিটা আওয়াজ করতেই পাশের জঙ্গল থেকে পিলপিল করে গোটাদশেক হাতি বাচ্চাসমেত বেরিয়ে এল। তারপর লাইন বেঁধে রাস্তা পার হয়ে উলটো দিকের জঙ্গলে ঢুকে গেল। শেষ হাতিটি চলে গেলে শুঁড়টি নেড়ে বড় হাতিটি রাস্তা ছেড়ে অনুসরণ করল সঙ্গীদের।

ইতিমধ্যে ক্রমাগত ক্যামেরার শাটার টেপার আওয়াজ হচ্ছিল। রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেলে শঙ্কর বিরক্ত হয়ে বলল, "আপনি তো অদ্ভুত লোক। ক্যামেরার শব্দ শুনে হাতি যদি এগিয়ে আসত তা হলে আমরা সবাই মারা পড়তাম। এই সময় কেউ ছবি তোলে ?"

কথাগুলো ইংরেজিতে বলায় মিস্টার প্রসন্ন বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলেন, "শাটারের শব্দ তো খুব হালকা, ও শুনতে পায়নি। তা ছাড়া এত কাছ থেকে ওদের দেখে ছবি না তুললে সারাজীবন আফসোস থেকে যেত। কিন্তু একটি ব্যাপার আমাকে খুব অবাক করেছে।"

অজিত গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করল, "সেটা কী ?"

ওদের লিডারের শরীরের পেছন দিকে কিছু একটা আটকে আছে। জিনিসটা কী বুঝতে পারিনি। কিন্তু কোনও ফরেন এলিমেন্ট হাতি শরীরে কিছুতেই রাখবে না। অথচ এ রেখেছে।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি সেটার ছবি তুলেছেন ?"

"হ্যাঁ। জুম করে ওটাকে ধরেছি। কিন্তু প্রিন্ট না করা পর্যন্ত বোঝা যাবে না।" বিষণ্ণ দেখাল মিস্টার প্রসন্নকে।

অর্জুন অজিতকে বলল, "এই, গাড়ি ঘোরা।"

"কেন ?" অজিত অবাক হল।

"নাগরাকাটায় যাব। কাছেই। আধঘণ্টা নষ্ট হবে।"

চাপড়ামারি ফরেস্ট বাংলোটি সত্যি সুন্দর। বাংলোকে ঘিরে প্রায় পনেরো ফুট লম্বা দশ ফুট গভীর খাদ কাটা রয়েছে, যাতে বন্যজন্তু ঢুকতে না পারে। একটা কাঠের সাঁকো দিনের বেলায় খাদের ওপর ফেলে রাখা হয় যাতায়াতের জন্যে। নীচের লনে নুড়ি-পাথর ছড়ানো। খাদের চারপাশে ঘন জঙ্গল, শুধু সামনের দিকটায় ঢালু জমি নেমে গিয়েছে বিরাট এক জলাশয়ে। প্রথম ও শেষ রাতে ওখানে বনের পশুদের জল খাওয়ার আসর বসে।

বাংলোর ওপরে দুটো ঘর, চারটে বিছানা। সামনে বারান্দা। সেখানকার বেঞ্চের চেয়ারে বসে গল্প করছিল ওরা। মিস্টার প্রসন্ন ওপরে ওঠেননি। তিনি গাড়ি থেকে নেমেই তাঁর ক্যামেরা নিয়ে ঢুকে গেছেন জঙ্গলে। এই সময় চৌকিদার চা নিয়ে এল, "উনি কোথায় গেলেন ?"

প্রশ্নটা যাঁকে নিয়ে তিনি যে এ-দলের কেউ নন তা লোকটা জানে না। অর্জুন বলল, "বোধ হয় ছবি তুলতে গিয়েছেন।"

"তা হলে ওঁকে ডাকুন সার। ক'দিন থেকে একটা চিতাবাঘ এদিকে ঘুরছে। হাতির সঙ্গে লড়াই করে জখম হয়েছে বেচারা। মাথা ঠিক নেই।"

সুবোধ বলল, "হাতির সঙ্গে লড়াই করেছে কেন ?"

চৌকিদার হাসল, "কখনও কখনও এমন হয় সার। ওঁকে ডাকুন।"

অর্জুন বলল, "আমরা কোথায় খুঁজব ওঁকে ?"

কিন্তু কিছুই করতে হল না। মিস্টার প্রসন্নকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল পাশের জঙ্গল থেকে। তাঁর বাঁ হাতে ক্যামেরা আর ডান হাতে একটা লম্বা সাপের মাথা মুঠোয় ধরা।

অজিত উঠে দাঁড়িয়ে রেলিং-এ ঝুঁকে চেঁচাল, "এ কী ! আপনি সাপ ধরেছেন ? কী সাপ ওটা ?"

"আমি সাপ চিনি না। এ-ব্যাটা আমাকে দেখে ছোবল তুলেছিল, আমি চট করে ধরে ফেললাম। এখন ছাড়তে পারছি না। আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন ? প্লিজ !" মিস্টার প্রসন্ন চেঁচিয়ে বললেন।

ওরা চা ফেলে রেখে দুদ্দাড় করে নীচে নেমে এল। মিস্টার প্রসন্ন তখন কাঠের সাঁকোর ওপর এসে দাঁড়িয়েছেন। চৌকিদার বলে উঠল, "আই বাপ। এ তো শঙ্খচূড়। ভগবানের সাপ। একবার দাঁত বসালে ভগবানও বাঁচাতে পারবে না। আপনি এঁকে ধরেছেন ? সাপুড়েরাও ওকে ধরতে ভয় পায়।" কথাগুলো বলতে বলতে লোকটা বারংবার নমস্কার করে যাচ্ছিল।

শঙ্খচূড়। অর্জুন ভাল করে দেখল। শরীর থেকে অনেকটা দূরে হাত সরিয়ে রাখায় সাপটা কোনও অবলম্বন না পেয়ে ক্রমাগত বেঁকেচুরে যাচ্ছে। শঙ্খচূড়ের মাথায় যে ছাপ থাকে তা দেখা যাচ্ছে না ওটা মুঠোর মধ্যে আটকে থাকায়। মিস্টার প্রসন্ন আবার বললেন, "হেল্প মি প্লিজ।"

ততক্ষণে চৌকিদার একটা দড়ি নিয়ে এসেছে। দড়িটা সাপের শরীরের মাঝ বরাবর তিনবার ফাঁস দিয়ে আটকে তার এক প্রান্ত সামনের গাছের ডালে বেঁধে দিল সে। দিয়ে বলল, "সাপকে ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে সরে যান।"

মিস্টার প্রসন্ন বাংলা না বুঝলেও ব্যাপারটা অনুমান করতে পারলেন। চকিতে হাত ছেড়ে দৌড়ে গেলেন তিনি খানিকটা দূরে। সাপটা এবার

গাছের ডালে বাঁধা দড়ির শেষে ঝুলতে লাগল। প্রাণপণে সে মাথাটাকে ওপরে তুলে দড়িটাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছিল। ওর পেটে দড়ি চেপে বসে যাওয়ায় শক্তি যথেষ্ট কমে গিয়েছিল কিন্তু তাতে রাগ পড়েনি। মাঝে-মাঝেই তার আস্ফালন শোনা যাচ্ছিল।

মিস্টার প্রসন্ন কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি বিষাক্ত সাপ?"

অর্জুন দোলনার মতো দুলতে থাকা সাপটার দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ। কামড়ালে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।"

"মাই গড।"

কিন্তু ওইভাবে সাপটাকে ঝুলিয়ে না রেখে মেরে ফেলাই ভাল। অর্জুন সেটা বলতে চৌকিদার তীব্র আপত্তি করল। ওটা ভগবানের সাপ, মারলে ভগবানই মারবেন। ও যাতে কাউকে না কামড়ায় তাই এই ব্যবস্থা। ওকে মারলে ওর জোড়া সাপটি যদি দেখতে পায় তা হলে আর রক্ষে থাকবে না। বরং এইভাবে ঝুলতে ঝুলতে ও আপনিই মরে যাবে।

অর্জুনের ভয় হচ্ছিল। কেউ যদি না দেখে ওর কাছাকাছি চলে আসে তা হলে নির্ঘাত সাপের ছোবল খাবে। এটা শুনে সুবোধ বলল, "ভালই হল। আমাদের আর একজন পাহারাদার বাড়ল।"

মিস্টার প্রসন্ন সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেললেন। তারপর চৌকিদারের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। তিনি নাকি নীচের ডাইনিং রুমেই রাত কাটাবেন। ডাইনিং রুমটি মন্দ নয়। মেঝের ওপর কার্পেট পাতা, টেবিল-চেয়ারের সঙ্গে লম্বা সোফাও রয়েছে।

বিকেল হয়ে গিয়েছিল। চার বন্ধু বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে সামনের জলাশয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। ঝিঁঝির বীভৎস একটানা তীক্ষ্ণ শব্দ ছাপিয়ে এখন শ'য়ে-শ'য়ে পাখির ডাকে চারপাশ মুখরিত। সন্ধের মুখে যে যার গাছের ডালে ফিরে আসছে ওরা। গোটাপঞ্চাশেক টিয়া জলাশয়ের ওপর চার-পাঁচবার এমনভাবে পাক খেয়ে গেল যেন তারা সার্কাসের খেলা দেখাচ্ছে। সামনের গাছের ডালে সাপটা তখনও লড়ে যাচ্ছে প্রাণপণে।

ঝুপঝুপ করে সন্ধে নয়, একেবারে রাত নেমে গেল জঙ্গলে। প্রথমেই ঘন অন্ধকার। বাংলোয় ইলেকট্রিক নেই। চৌকিদার দু-দুটো বড় হ্যারিকেন জ্বেলে দিয়ে গেল দু'ঘরে। অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করল, "ফোটোগ্রাফার সাহেব কী করছেন?"

"ডাইনিং রুমের সোফায় শুয়ে আছেন।"

"এখানে কী-কী দেখতে পাওয়া যায় ভাই?" সুবোধ জানতে চাইল।

"কপাল ভাল হলে হাতি, বাইসন, হরিণ তো পাবেনই, ভেতরের দিকে চিতাও দেখতে পারেন। আজ তো দেরি করে চাঁদ উঠবে।"

ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে অজিত বলল, "চাঁদ উঠবে!"

"হ্যাঁ। দু'দিন আগে পূর্ণিমা গেল না?"

চৌকিদার নীচে নেমে গেলে অর্জুনরা গল্প শুরু করল। তাদের স্কুল-জীবনের মাস্টারমশাইদের গল্প। সুশীলবাবু, কমলাকান্তবাবু, সুধাময়বাবু, শিশিরবাবু থেকে হেডমাস্টারমশাই নারায়ণচন্দ্র চন্দ মশাইয়ের কথা আন্তরিকভাবে বলাবলি করতে লাগল ওরা। অর্জুনের ভাল লাগছিল। তারপরেই হঠাৎ আলোচনা বাঁক ঘুরে চলে এল অর্জুনের গল্পে। সবাই জানতে চাইল লাইটার রহস্যের সমাধানে আমেরিকায় গিয়ে কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল? হঠাৎ অর্জুন কী করে সত্যসন্ধানের ক্ষমতা অর্জন করল? অমল সোম লোকটি কীরকম? ইত্যাদি।

নিজের কথা বলতে অস্বস্তি হয় অর্জুনের। তবু বন্ধুদের কৌতূহল সে মেটাচ্ছিল। এই সময় একটা এঞ্জিনের আওয়াজ হল। তারপর জঙ্গলের মধ্যে আবছা আলো দ্রুত এগিয়ে আসছে— দেখতে পেল ওরা। হঠাৎই জঙ্গল ছেড়ে সেই আলো গাড়ির হেডলাইট হয়ে জলাশয়ের ওপর বাঁক

খেয়ে বাংলোর ওপর আছড়ে পড়ল। এখন খাদের ওপর সাঁকোটা নেই। সন্ধের আগেই ওটাকে সরিয়ে রেখেছে চৌকিদার। হেডলাইট না নিভিয়ে হর্ন বাজাতে লাগল গাড়িটা।

অর্জুন উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে দেখল চৌকিদার বাংলো থেকে বেরিয়ে নুড়িপাথরের ওপর এসে দাঁড়াল।

গাড়ি থেকেই হুকুম হল "ব্রিজ লাগাও।" হুকুমটা হল হিন্দিতে।

"বাংলোতে জায়গা নেই সার।"

"জায়গা আছে কিনা আমরা বুঝব। যা বলছি তাই করো।"

"কিন্তু সার অর্ডার নিয়ে বাবুরা এসে গিয়েছেন। তাঁদের ঘর খুলে দিয়েছি। আপনারা অন্য কোথাও চেষ্টা করুন।" চৌকিদার বলল।

"এটা দেখতে পাচ্ছ? কথা না শুনলে তোমাকে মরতে হবে। আমরা এখানে থাকতে আসিনি। কাজ শেষ করে চলে যাব।" লোকটা জানলা দিয়ে তার যে হাতটি বাড়িয়ে ধরল তাতে কিছু একটা ধরা আছে। চৌকিদার এবার কাঠের সাঁকো টেনে খাদের ওপর তুলে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি থেকে চারজন নেমে পড়ল।

সুবোধ বলল, "মনে হচ্ছে এরা গুণ্ডা। কী করবি?"

অর্জুন বলল, "কিছু করার দরকার নেই। চুপচাপ বসে থাক।"

ওরা বেতের চেয়ারে বসতেই লোকগুলো দুপদাপ শব্দ করে ওপরে উঠে এল। একজনের হাতে রিভলভার, বাকিরাও হিংস্র প্রকৃতির, সন্দেহ নেই। ওরা পাশাপাশি ঘর টয়লেট দেখে বাইরে এল। রিভলভারধারী হিন্দিতে বলল, "টর্চ ফেল।"

সঙ্গে-সঙ্গে টর্চের আলো পড়ল অর্জুনদের মুখে। একে-একে চারজনকে দেখে নিল ওরা। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার? কী চাইছেন আপনারা?"

"লোকটা কোথায়?" চাপা গলায় বলল রিভলভারধারী।

"কোন লোক?"

"দেখুন ভাই, আপনাদের সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই। কিন্তু আজ এখানে আসার সময় লাটাগুড়ির বাজারে দাঁড়িয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"সেখানে একজন লোক, ফোটোগ্রাফার আপনাদের কাছে লিফ্ট চেয়েছিল ?"

অর্জুন এতক্ষণে বুঝতে পারল, "আপনারা জানলেন কী করে ?"

"লোকটা যে চায়ের দোকানের চা খেয়েছে তার দোকানদার মিথ্যে কথা বলবে না। তার জানের ভয় আছে।"

"আচ্ছা। হ্যাঁ ওঁকে লিফ্‌ট দিয়েছি আমরা।"

"কেন ?"

"আশ্চর্য। উনি এদিকের লোক নন, বিপদে পড়ে সাহায্য চাইছেন, গাড়িতে যখন জায়গা আছে তখন না বলব কেন ?"

"লোকটা কোথায় নামল ?"

"আপনি তখন থেকে রিভলভার উঁচিয়ে কথা বলছেন এটা আমার ভাল লাগছে না। ওটা নামিয়ে ভদ্রভাবে কথা বলুন।" অর্জুন বলল।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা বিশ্রী গালাগাল করল লোকটা। করে বলল, "আমার সঙ্গে কেউ এভাবে কথা বলার সাহস করে না। লোকটা কোথায় না বললে তোকেই মালবাজারে তুলে নিয়ে যাব।"

"আচ্ছা ! মালবাজারের লোক আপনারা। কার লোক ? সুচা সিংহ না লড্ডন খান ? এর বাইরে তো ওখানে কারও দল নেই।"

লোকটা বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি লড্ডন খানকে চেনেন ?"

"চিনি। আপনি ওকে অর্জুনের নাম বলবেন। আর সেই সঙ্গে বলবেন এইভাবে রিভলভার দেখিয়ে তুই-তোকারি করেছেন কিন্তু আমি ভদ্রতা বজায় রেখেছি।"

লোকটা কিছু ভাবল। তারপর রিভলভার পকেটে ঢুকিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে আপনি জানাশোনা লোক। কিন্তু ওই লোকটাকে আমার চাই।"

"কেন ?"

"ও জলদাপাড়ায় যেসব ছবি তুলেছে তারপর ওকে ছেড়ে দেওয়া যায় না।"

"কী ছবি তুলেছে ?"

"তা আমি জানি না। যে আমাকে কাজটা দিয়েছে সেটা তার সমস্যা। শুধু ওকে খুঁজে দেওয়াই আমার কাজ।"

"তার মানে তুমি টাকা নিয়ে কাজটা করছ ?"

"যার যা কাজ তা তাকে করতেই হয়।" লোকটা বলল, "কিন্তু লোকটাকে এখানে খুঁজে পাচ্ছি না। অবশ্য এই অন্ধকারে জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে পড়লে ওকে পাওয়া যাবে না।"

এই সময় নীচ থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল। ওরা কাঠের রেলিং ধরে নীচের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল চতুর্থ লোকটি চৌকিদারকে চেপে ধরেছে এবং সে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে বলছে, "একটু আগে নীচেই ছিল, এখন কোথায় গিয়েছে বলতে পারব না।"

সঙ্গে-সঙ্গে এই তিনজন নীচে নেমে গেল। বাংলোর চারপাশে গভীর খাদ। সেটা ডিঙিয়ে বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। ওরা বাংলোচত্বর, চৌকিদারের ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজল কিন্তু মিস্টার প্রসন্নকে কোথাও পাওয়া গেল না।

শেষপর্যন্ত ওদের নেতা কাঠের সাঁকোর দিকে তাকাল। তারপর বলল, "আমরা যখন ভেতরে ঢুকেছিলাম তখন ও কোথাও লুকিয়ে ছিল, ফাঁক বুঝে ওই ব্রিজ দিয়েই বাইরে চলে গিয়েছে।"

"তা হলে কী হবে ওস্তাদ ?" একজন জানতে চাইল।

"যাবে কোথায় ? জঙ্গলের ভেতরে ঢুকলে মারা পড়বে আর হাইওয়ের দিকে গেলে আমরা আছি। নাঃ, আজ রাতের ঘুমটা আর হবে না। চলো।" বলে সে চৌকিদারের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, "আমরা চলে গেলে এই ব্রিজটা তুলে নেবে। কাল সকালের আগে যেন এটা আর না লাগে। বুঝতে পেরেছ ?"

চৌকিদার মাথা নাড়তেই ওরা কাঠের সাঁকো বেয়ে এগোতেই চাঁদ উঠল। হালকা আলো ফুটল জঙ্গলে। দু'জন গাড়িতে উঠল, আর বাকি দু'জন বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল নিচু গলায়। বাংলোর বারান্দা থেকে অর্জুনরা কোনও সংলাপই শুনতে পাচ্ছিল না।

অর্জুন জঙ্গলের দিকে তাকাল। চাঁদ উঠলেও তার শরীর এখন ছোট। যে হালকা জ্যোৎস্না এখন পৃথিবীতে নেমেছে তা জঙ্গলের শরীর ভেদ করতে অক্ষম। ফলে গাছপালাকে জমাট অন্ধকার বলেই মনে হচ্ছে। তার কোথায় মিস্টার প্রসন্ন লুকিয়ে আছেন তা কেউ বলতে পারবে না। হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। এমনকী পাখিরাও চমকে ডেকে উঠল গাছে-গাছে। ততক্ষণে গাড়ির ভেতর থেকে টর্চের আলো পড়েছে বাইরে। একটি লোক হাত চেপে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। আর টর্চের আলোয় দেখা গেল শঙ্খচূড়টা প্রবলভাবে দুলছে দড়িতে বাঁধা অবস্থায়। কিন্তু দড়ির বাঁধন অনেক নীচে নেমে গিয়েছে। দুলতে-দুলতে ঝুপ করে পড়ে গেল সাপটা। সঙ্গে-সঙ্গে রিভলভারের গর্জন শোনা গেল।

বন্ধুরা ওপরে দাঁড়িয়ে থাকলেও অর্জুন দ্রুত নীচে নেমে এল। যে লোকটি ছোবল খেয়েছে সে মাটিতে ছটফট করছে। একটু দূরেই মৃত সাপটা পড়ে রয়েছে। তিনজন লোক কী করবে বুঝতে পারছিল না। অর্জুন দৌড়ে বাইরে এসে লোকটার জামা ছিঁড়ে দেখল কনুইয়ের কাছে দাঁত বসেছে। লোকটা হয়তো কথা বলতে-বলতে ওপরে হাত তুলেছিল। অর্জুন সঙ্গে-সঙ্গে ছেঁড়া জামার টুকরো দিয়ে কনুইয়ের ওপরে বাঁধন দিতে লাগল। তারপর চেঁচিয়ে বলল গাছের দড়িটা টেনে নামাতে। সেটা নামানো হলে আরও শক্ত বাঁধন কনুই থেকে প্রায় কাঁধ পর্যন্ত সে শক্ত করে বাঁধল। লোকটা গোঙাচ্ছে। অর্জুন বলল, "তাড়াতাড়ি ওকে হাসপাতালে নিয়ে যান। বিষ যদি এর মধ্যে ভেতরে চলে না গিয়ে থাকে তা হলে ও বেঁচে যাবে।"

তাড়াতাড়ি করে লোকটাকে গাড়িতে তুলল ওরা। তীব্রবেগে গাড়ি

ঘুরিয়ে চলে গেল হেডলাইটের আলোয় অন্ধকার কেটে।

ততক্ষণে বন্ধুরা নেমে এসেছে নীচে। অজিত বলল, "আশ্চর্য ব্যাপার। ওই সাপটা এতক্ষণ বেঁচে ছিল ? লোকটা ঠিক মরে যাবে।"

"সম্ভবত নয়।" অর্জুন বলল।

ঠিক তখনই মিস্টার প্রসন্নকে দেখা গেল। পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "প্লিজ, আমাকে বাঁচান।"

উনি হাঁটতে পারছিলেন না ভাল করে। কোনওরকমে বাংলোর একতলায় নিয়ে আসার পর দেখা গেল ওঁর সমস্ত শরীরে মোটা মোটা পাহাড়ি জোঁক ঝুলছে। এমনকী জামাপ্যান্টের ভেতরেও ঢুকে গেছে সেগুলো। রক্ত খেয়ে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। সুবোধ বলল, "এত জোঁক ধরল কী করে ?"

ডাইনিং টেবিল থেকে লবণ নিয়ে জোঁক ছাড়াতে-ছাড়াতে অর্জুন বলল, "ভয়ে নড়াচড়া করতে পারেননি। শব্দ হলে ধরা পড়ে যেতেন।"

সুবোধ গুনল। প্রায় ছত্রিশটা জোঁক ছাড়ানো হল মিস্টার প্রসন্নর শরীর থেকে। চৌকিদার আলু কেটে তার রস ক্ষতস্থানগুলোতে লাগিয়ে দিতে দিতে বলল, "দু'দিনেই ঠিক হয়ে যাবে।"

কাঠের সাঁকোটা খুলে নেওয়া হল। রাত বাড়লে খাওয়াদাওয়ার পর মিস্টার প্রসন্ন একটু সুস্থ হলেন। সুস্থ হয়েই ব্যাগ থেকে একটা টিউব বের করে মলম লাগাতে লাগলেন ক্ষতস্থানগুলোতে। অর্জুন তাঁর পাশে এসে বসল, "কী হয়েছিল ?"

মিস্টার প্রসন্ন মাথা নাড়লেন, "বিশ্বাস করুন, আমি কিছু জানি না।"

"নিশ্চয়ই অকারণে ওরা এতদূরে ছুটে আসেনি ?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওরা আপনাকে জলদাপাড়ায় কিছু বলেনি ?"

"হ্যাঁ বলেছে। পরশু বিকেলে আমি জঙ্গলে ঢুকে ছবি তুলছিলাম। তুলতে-তুলতে সন্ধে হয়ে গেল। আমি হলং-এর বাংলোয় জায়গা পেয়েছিলাম। হঠাৎ একটা লোক এসে আমাকে বলল আজ যেসব ছবি আমি তুলেছি তার ফিল্ম দিয়ে দিতে হবে। আমি রাজি না হওয়ায় সে খুব শাসাল। সে চলে যাওয়ার পর একটা নেপালি কর্মচারী এসে চুপিচুপি বলে গেল, 'সাব আপ ভাগ যাইয়ে। আপকো জান খতরামে হ্যায়।' শোনার পর সত্যি আমি ভয় পেলাম। আমার তোলা ছবিগুলো কেন ওদের দরকার বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু আমি পালালাম। হলংয়ের জঙ্গল এত ঘন নয়। মাদারিহাটে পৌঁছে সেই রাত্রেই একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে অনেকটা পথ চলে এসেছিলাম। ভোরের দিকে ট্যাক্সি খারাপ হল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে লাটাগুড়িতে পৌঁছে অনেকক্ষণ বিশ্রাম করে ভেবেছিলাম ওদের হাত থেকে বাঁচতে পেরেছি। কিন্তু ওরা যে এখানেও পৌঁছে যাবে তা আমি বুঝতে পারিনি।" মিস্টার প্রসন্ন বললেন।

"ঠিক আছে। আপনি আজ বিশ্রাম করুন। আপনার কোনও ভয় নেই।" অর্জুন উঠে গেল।

রাত্রে ওরা হাতিদের জল খাওয়া দেখল জ্যোৎস্নায়। হাতিরা চলে গেলে এল বাইসনদের দল। নিজেদের মধ্যে মারামারি করল তারা। তারপর এল হরিণের ঝাঁক। ভোরের দিক তখন।

সকালের চা দিতে এসে চৌকিদার জানাল মিস্টার প্রসন্ন নেই। খাদের ওপর কাঠের সাঁকো টেনে তিনি বেরিয়ে গেছেন।

অর্জুন বলল, "অনুমান করেছিলাম। তাড়াতাড়ি চা খেয়ে বেরিয়ে পড়। ভদ্রলোক হেঁটে নাগরাকাটায় পৌঁছবার চেষ্টা করছেন।"

"কেন ?" অজিত জিজ্ঞেস করল।

"যে-কোনও শিল্পীর যেমন তাঁর সৃষ্টির ওপর সবচেয়ে বেশি দরদ থাকে ঠিক তেমনই মিস্টার প্রসন্নর আগ্রহ ও মমতা থাকবে নিজের তোলা ছবিগুলোকে পাওয়ার। গতকাল এখানে আসার পথে আমরা নাগরাকাটার ফোটোর দোকানে যে ফিল্মগুলো প্রিন্ট করতে দিয়ে এসেছিলাম সেগুলো উনি হাতছাড়া করতে চাইছেন না। সেটাই স্বাভাবিক।"

গাড়ি চালাতে-চালাতে অজিত বলল, "একদিনেই দারুণ অভিজ্ঞতা হল। তুই যেখানেই যাবি সেখানেই এরকম হবে, তাই না অর্জুন ?"

অর্জুন হাসল। গাড়ি জঙ্গলের পথ ধরে এগোচ্ছিল। হঠাৎ একটা গাছের নীচে কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখে গাড়ি থামাতে বলল অর্জুন। নেমে কাছে গিয়ে দেখল একটা বড় ঝোলা। তাতে জামাপ্যান্ট ইত্যাদি। সে ওপরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করল, "মিস্টার প্রসন্ন নেমে আসুন।"

অনেক ওপরে ভদ্রলোককে দেখা গেল। অসহায়ভাবে ডাল ধরে বসে আছেন। কোনওরকমে নেমে এলেন। এবার তাঁর শরীর জুড়ে লাল পিঁপড়ে দেখা গেল। ওদের কামড়ে মুখ ফুলে ঢোল। জানা গেল ভোরের পথে চলতে-চলতে হাতির দলের সামনে পড়েছিলেন। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে গাছে ওঠার সময় ঝোলা পড়ে গিয়েছিল নীচে।

তাঁকে গাড়িতে তুলে অর্জুন বলল, "আমাদের অবিশ্বাস করলেন কেন ? আপনার তোলা ছবি আপনারই থাকবে।"

মিস্টার প্রসন্নকে এখন খুব লজ্জিত এবং সঙ্কুচিত দেখাল।

নাগরাকাটার ছবির দোকান খুলল সকাল দশটায়। প্রিন্ট হয়ে গিয়েছিল। প্যাকেট বের করে প্রৌঢ় দোকানদার জিজ্ঞেস করলেন, "এই ছবি কোন জঙ্গলে তোলা হয়েছিল ?"

অর্জুন বলল, "কেন ?"

"এ ছবি আমি দিতে পারব না। আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আমি থানা হয়ে আসছি। ওই যে পুলিশ এসে গিয়েছে।"

দোকানদার বলতেই একটি পুলিশের জিপ এসে দাঁড়াল। দারোগাবাবু দোকানে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কই, কী ছবি দেখি ?"

দোকানদার দেখালেন। দারোগা বললেন, "আরে। এ তো লড্ডন খান। পরিষ্কার মার্ডার। এঁরা কে ?"

দোকানদার বললেন, "এঁরাই প্রিন্ট করতে দিয়েছিলেন।"

অর্জুন বলল, "ইনি প্রফেশনাল ফোটোগ্রাফার। জঙ্গলের ছবি তুলেছিলেন। ছবিটা দেখতে পারি ? হ্যাঁ, এটি লড্ডন খান। মুখ পরিষ্কার উঠেছে।"

দারোগা জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা। আপনি লড্ডনকে চেনেন ? মহাশয়ের নাম কি জানতে পারি ?"

"আমি অর্জুন। জলপাইগুড়িতে থাকি।"

"অর্জুন ? মানে—মানে—মানে— !"

অজিত বলল, "হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন।"

দারোগা উচ্ছ্বসিত, "আরে মশাই, আপনার নাম এত শুনেছি। উঃ ! চোখে দেখব ভাবতে পারিনি। লড্ডনকে ফাঁসাতে পারছিলাম না। এই ছবি খুব কাজে লাগবে। আপনারা আসুন, থানায় বসে এক কাপ চা খেয়ে আমাকে ধন্য করুন।"

অর্জুন বলল, "শুধু চা হলে চলবে না। ব্রেকফাস্ট চাই।"

"অবশ্যই।"

থানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল গাড়ি দুটো। মিস্টার প্রসন্ন নিচু গলায় অজিতকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। উনি কী বললেন ? আমি অর্জুন। মানে কী ? অর্জুন তো মহাভারতের চরিত্র। আমি মানে কী ?"

অজিত হাসল। তারপর বলল, "আমি মানে আই। আই অ্যাম অর্জুন। আন্ডারস্ট্যান্ড ?"

(সমাপ্ত)

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস

সাদা মিথ্যে

রমাপ্রসাদ বণিক

"জানলার দিকে তাকিয়ে কী দেখছ ?" টেবিলের ওপরে ডাস্টার ঠোকার শব্দটা কানে যেতেই প্রশান্ত সারের দিকে ফিরে তাকাল চেতন। চেতনের চোখে বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। অব্যর্থ টিপে জানলার ধারের ডেস্কটায় চকের টুকরোটা ছুড়ে দিয়ে প্রশান্ত সার বললেন, "ইউ, ইউ, তোমাকে জিজ্ঞেস করছি। কী দেখছিলে ?"

চেতন যা দেখেছে তার মধ্যে কোনও মিথ্যে নেই। একটা মুখ। একবার নয়, দু'-দু'বার উঁকি মেরেছে লোকটা। শেষবার চেতনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই খুব দ্রুত আড়ালে চলে গিয়েছে। চেতনদের এই ক্লাসরুমটায় ঢোকার পথটা ডান দিকে। চেতন বসে বাঁ দিকের দেওয়াল ঘেঁষে। বাঁ দিকের দেওয়ালেই দুটো জানলা। দুটো জানলাই ভেতর দিকে খোলে। ওভাবেই বানানো হয়েছে উপায় নেই বলে, কেননা ক্লাসরুমের

দেওয়াল যেখানে শেষ হয়েছে তার ইঞ্চি বারোর মধ্যেই স্কুলের একদিকের সীমানা। পাঁচিলের পেছনেই খ্রিস্টানদের সমাধি। স্কুলের বিরাট প্লে-গ্রাউন্ড ছেড়ে চেতন ওর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে স্কুল কম্পাউন্ডের শেষ সীমানায় মাঝে-মাঝে 'ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন গেম' খেলতে আসত ঠিকই, কিন্তু প্রাইমারি প্রিফেক্টের কড়া নির্দেশে ইদানীং সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ওদের ক্লাসের মোটু এই ক্লাসরুমের দেওয়াল আর সমাধির পাঁচিলের মাঝখানে আটকে গিয়েছিল। অর্থাৎ এই সরু ফাঁকের মধ্যে একটা বড় মানুষের গলে আসা প্রায় অসম্ভব। অথচ একটু আগেই ওখানে দাঁড়িয়েই একটা মুখকে দু'-দু'বার উঁকি মারতে দেখেছে চেতন। কিন্তু প্রশান্ত সারকে সেই কথাটা বলতে যাওয়া এখন বিরাট বোকামির কাজ হবে। বিশেষত ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন গেমের পাণ্ডা হিসেবে স্কুলের টিচাররা তাকে কল্পনাপ্রবণ বলেই জানেন।

ব্ল্যাক বোর্ড ছেড়ে প্রশান্ত সার এবার চেতনের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। চেতনও উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রশান্ত সার কুলপি-জমা গলায় বললেন, "বলো কী দেখছিলে ?"

মিথ্যে কথাটা চট করে চেতনের মুখ দিয়ে বেরোয় না। দাদু ভীষণ রাগ করেন। দাদু মানে চেতনের বাবার বাবা। একসময়ে জেলাশাসক ছিলেন। এখন পার্ক স্ট্রিটে ওর বাবার কমপ্লেক্সেই থাকেন। বাবা আই. পি. এস.। পুলিশের বড় কর্তা। মিথ্যে বলার চলটা ওদের বাড়িতে মোটেই নেই। চেতন কোনওরকমে ওর চোখ দুটো তুলে দেখল প্রশান্ত সার তখনও ওর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছেন। ইচ্ছে করলেই একটা কিছু বানিয়ে বলে দিতে পারে চেতন, পুডিং খাওয়ার লোভে অনেক সময় পেটের গোলমালের কথাটা মায়ের কাছে বেমালুম চেপে যায় সে, কিন্তু নিজের টিচারকে কেমন করে মিথ্যে বলবে ? অথচ কথাটা এমন, বললেও ক্লাসসুদ্ধু সকলেই তাকে ভাববে গুলবাজ !

একটু আগে ডেস্কে এসে পড়া চকের টুকরোটা বাউন্স করে তার ঠোঁটের তলায় লেগেছে। জায়গাটা সামান্য ফুলেও উঠেছে। ওপরের ঠোঁট দিয়ে ব্যথার জায়গাটা চেটে নিয়ে চেতন বলল, "সরি সার।"

স্কুলের সব টিচারই চেতনের স্বভাবটা জানেন। এমনও হয়েছে স্রেফ অন্য বন্ধুদের দোষ বাঁচাতে নিজের কাঁধে দুষ্টুমির অপরাধ তুলে নিয়েছে। তাই চেতন কী দেখছিল সেই প্রশ্নে না গিয়ে ইতিহাসের টিচার বললেন, "কী পড়াচ্ছিলাম ?"

"আকবরের রাজসভায় নবরত্ন।"

"নবরত্নের মধ্যে কারা কারা ছিলেন ?"

"আবুল ফজল, ফৈজি, বিহারীমল, টোডরমল, বীরবল, আবদুর রহিম, খান-ই-খানান, তানসেন, হাকিম হুমায়ুন।"

প্রশ্নের উত্তরগুলো এক নিশ্বাসে বলে ফেলেই খুব ব্যস্ত হয়ে কী একটা খুঁজতে থাকে চেতন। মেঝের দিকে তার দৃষ্টি। প্রশান্ত সার একটু প্রশ্রয়মাখা গলায় বললেন, "তুমি এত ছটফটে কেন বলো তো ? কী খুঁজছ ?"

চেতন খুঁজতে খুঁজতেই বলে, "চকটা। যেটা আপনি ছুড়েছিলেন। ওই কালারটা আমার কালেকশনে নেই।"

টেবিলে পড়ে থাকা দুটি দু' রঙের চক তুলে নিয়ে প্রশান্ত সার বললেন, "নাও।"

একগাল হেসে প্রায় নোবেল প্রাইজ নেওয়ার আনন্দে প্রশান্ত সারের টেবিলের সামনে এগিয়ে গেল চেতন। ওর হাতে চক দুটো দিয়ে প্রশান্ত সার বললেন, "দশম রত্ন !"

ক্লাসরুমে যেন জলতরঙ্গ বেজে উঠল। ঈর্ষাহীন তারিফের এই হাস্যমুখর কলরব একমাত্র ভোরের পাখিরাই বুঝি করতে পারে।

চেতনের ঠোঁটের তলাটা এবার বেশ টসটসে হয়ে ফুলে উঠেছে। সেখানে চোখ পড়তেই প্রশান্ত সারের দৃষ্টিতে কেমন একটা অপরাধ বোধ ফুটে উঠল। বললেন, "বাইরে গিয়ে ঠোঁটের তলায় একটু ঠাণ্ডা জল লাগিয়ে এসো। যাও।"

প্রশান্ত সারের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই এক ছুটে ক্লাসরুমের বাইরে চলে গেল চেতন। প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চাদের জলখাওয়ার কলগুলো বাঁ দিকে। কিন্তু চেতন গেল ঠিক উলটোদিকে। চেতনকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েই প্রশান্ত সার বোর্ডে কিছু লেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তাই চেতনের এই অস্বাভাবিক আচরণটা তাঁর নজরে এল না। কিন্তু সোহম গলা নামিয়ে নিয়ে প্রতীককে বলল, "ব্যাটা শিওর কিছু দেখেছে !"

॥ ২ ॥

কাল রবিবার। ছুটি। হোম টাস্কও এমন কিচ্ছু নেই। আগামীকাল করলেও চলবে। আজ ক্লাসরুমের বাইরে থেকে উঁকি-দেওয়া-মুখটা চেতনকে ভীষণ ভাবাচ্ছে। প্রশান্ত সারের ক্লাসে বাইরে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে আসলে সে সরু প্যাসেজটাতেই গিয়েছিল, কিন্তু কাউকেই সেখানে দেখা যায়নি। এমনকী কেউ যে সেখানে আদৌ এসেছিল তার কোনও চিহ্নও মেলেনি। পুলিশের ছেলে হওয়ার সুবাদে ওর ভেতরে কেমন একটা গোয়েন্দা গোয়েন্দা ভাব আছে, সেটা নিজেও বুঝতে পারে চেতন। তবে দাদু বলেন, "মিথ্যে কল্পনা করলেই নাকি ভয় বাড়ে। যেমন ভূত। আর সত্যিটাকে খুঁজে বার করতে পারলে সাহস বাড়ে।" এই কথাটাই এখন ভাবছে চেতন। আজ জানলার ওপাশে যে মুখটা ও দেখেছে সেটা তো কল্পনা নয়। আবার একটা মানুষ তো উঁকি দিতেই পারে, সেটা নিয়েই বা এত ভাববার কী আছে ? বাবা বলেন, "মিথ্যে আশঙ্কা করে চারপাশে ভয় ছড়ানো একটা ক্রাইম।" আসলে খটকাটা চেতনের মনে জাগছে অন্য কারণে। বাইরের কত লোকই তো ওদের স্কুলে ঢুকছে, বেরোচ্ছে। কিন্তু সকলেই স্কুলের মেন গেটই ব্যবহার করে। এই লোকটি হঠাৎ সমাধিস্থলের চোরা পথটা ব্যবহার করতে গেল কেন ? এবং তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মুহূর্তের মধ্যে ভ্যানিশ হয়েই বা গেল কেন ? অবশ্য এইটুকু সন্দেহ থেকে বিরাট কিছু ভেবে নেওয়ার সময় এখনই নয় এবং এই কারণেই বন্ধুরা বারবার জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও সে একটি কথাও বলেনি।

চেতনের পড়ার ঘরে মা এসে বললেন, "কী করছ চুন ? বাড়ির সবাই চেতনকে চুন বলেই ডাকে। আদরের নাম। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে সুমনা বললেন, "হোম টাস্ক শেষ ?"

"টাস্ক করছিলাম না। একটা অন্য কথা ভাবছিলাম। পড়াশোনার কিচ্ছু না।" ছোট্ট করে জবাব দিল চেতন।

এইরকম একশো ভাগ সত্যি একটা স্বীকারোক্তি যে-কোনও বাবা-মাকেই মুগ্ধ করতে পারে, তবে চেতনের ব্যাপারে ওর মায়ের বাড়তি কোনও আবেগ নেই, কেননা এটাই চেতনের স্বাভাবিক ধরন। সুমনা পালটা প্রশ্ন করেন, "কী কথা ভাবছিলে ?"

"একটা ব্যাপারে একটু রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।" খুদে ব্যোমকেশের মতো কথাগুলো কেটে কেটে বলে চেতন।

সুমনা মজা পেয়ে মুখ টিপে হাসেন। বলেন, "কিসের রহস্য ?"

"সেটা এক্ষুনি বলা যাবে না।"

সুমনা বুঝতে পারেন 'ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন গেম'-এর একটা নতুন কোনও আইডিয়া এখন ছেলের মাথায় ঘুরছে। কথা না বাড়িয়ে বলেন, "খেতে এসো। বাবা, দাদু তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

এ-বাড়ির একটা নিয়ম আছে। রাত্রি ন'টার মধ্যে খাওয়ার পাট চুকোতে হবে এবং রাত্রি দশটার মধ্যে অতি অবশ্যই সমস্ত ঘরে বাতি নিভে যাওয়া চাই। চেতনের দাদু অবসরপ্রাপ্ত জেলাশাসকেরই তৈরি এই নিয়মটা। ছেলে পুলিশে চাকরি করে, তাই প্রশাসনিক প্রয়োজনে ডাক পড়লে মাঝেমধ্যে ছাড় পাওয়া যায় তবে সেটা ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়।

চিনে মাটির চামচে বাটি থেকে গরম-গরম সুপ তুলে খুব সাবধানে ঠোঁটের কাছে এনে প্রশ্ন করে চেতন, "বাবা, ক্রিমিনালদের দেখতে কেমন হয় ?"

দাদু তাঁর সুপের পাত্রে গোলমরিচ ছড়াচ্ছিলেন। নাতির প্রশ্নে তাঁর শরীরটা নিঃশব্দে দুলে ওঠে।

বাবা অবশ্য চিরকালই ছেলেকে বেশ একটা মান্যিগন্যি লোক ভেবেই ছেলের সঙ্গে কথা বলেন। টেবিল থেকে হালকা সবুজ সুতির রুমালটা তুলে নিয়ে ঠোঁট পরিষ্কার করে বলেন, "কেমন আবার হবে ? সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে গেলে বোঝাই যাবে না। কাগজে রেল-ডাকাতদের ছবি বেরিয়েছিল, দেখিসনি ? কীরকম গোবেচারা-গোবেচারা দেখতে ? বাইরে থেকে দেখে বোঝা যাবে ভেতরে ভেতরে অত শয়তানি বুদ্ধি ?" হাত বাড়িয়ে বেতের ঝুড়ি থেকে একটা লম্বা পাউরুটি তুলে নেন মনন।

"যারা পেশাদার খুনে তাদের দেখতেও আমাদের মতো ?" মায়ের দিকে চোখ পড়তেই চেতন চামচের বাকিটুকু গিলে ফেলেই বলে, "তা হলে দাগি আসামি বলো কেন তোমরা ?"

সুপের শূন্য পাত্রটা পাশে সরিয়ে দিয়ে দাদু বলেন, "তুই কি ভাবছিস যারা খুনটুন করে তাদের মুখে কাটাছেঁড়া দাগ থাকে ? যারা অপরাধ করে বারবার পুলিশের নজরে পড়ে পুলিশের খাতায় তারা 'মার্ক্‌ড'। অর্থাৎ 'চিহ্নিত'। তাই দাগি।"

মনন চট্টোপাধ্যায়ের ঘরে ফোন বাজছে। সুমনা স্বামীকে বলেন, "তুমি বোসো। বলছি।"

হট কেসের ঢাকনা খুলে দুটো রুটি তুলে নেন দাদু। তারপর মাংসের পাত্রে ছোট টুকরোর সন্ধান করতে থাকেন। চেতন বলে, "তুমি মাংস খাবে ?"

"হ্যাঁ খাই একটু।"

"এ মা,আমি ভেবেছিলাম তুমি খাবে না। আমি তো এঁটো করে টেস্ট করেছি। তুমি তো রেড মিট খাও না।"

"তাতে কী হয়েছে ?"

"না, ছোটদের এঁটো করা খাবার গুরুজনদের দিতে নেই।"

"তোর বাবাও তো খাবে।"

"বাবা তো বন্ধু।"

ব্রিজভূষণ এগিয়ে এসে বলেন, "চুন দাদা,তোমার ফোন।"

"আমার ফোন !" খুব বিরক্তি নিয়ে কপাল কুঁচকে বলে, "আমি স্কুলের সকলকে বলেছি রাতে ফোন করবি না ! সরি দাদু।" টেবিল ছেড়ে ফোন ধরতে চলে যায় চেতন।

সুমনা রান্নাঘর থেকে পুডিং নিয়ে ফেরেন। ছেলেকে টেবিলে দেখতে না পেয়ে প্রশ্ন করেন, "কোথায় গেল চুন ?"

"তোমার ছেলের ফোন এসেছে।" ছোট্ট করে জবাব দেন মনন।

হাড়টা প্লেটে ঠুকে বোন-ম্যারো বার করবার চেষ্টা করতে করতে শ্বশুরমশাই বলেন, "তোমার এঁটো মাংসটা দিব্যি হয়েছে বুঝলে বউমা।"

"এঁটো মাংস মানে ?"

"তোমার পুত্র বোধ হয় লুকিয়ে লুকিয়ে চেখে রেখেছে। আমি হাত দিতেই তার বিবেক দংশে উঠেছে। বলে এঁটো মাংস—আমি গুরুজন তো তাই খেতে দেবে না।"

"আপনার নাতি আপনি বুঝবেন। ভাল হলেও আপনার, খারাপ হলেও আপনার।"

জেলাশাসক আরও একটুকরো মাংস তুলে নেন নিজের প্লেটে। বেশ রসিয়ে টুকরোটাকে বাগে এনে বলেন, "আমার বাবা আমার নাম দিয়েছিলেন মানস, আমি আমার ছেলের নাম দিয়েছিলাম মনন, আর তোমরা তোমাদের ছেলের নাম দিয়েছ চেতন। অনেক স্বপ্ন নিয়েই মানুষ নাম দেয়। আমার নাতির নাম তো 'পচা' দেওয়া হয়নি যে, কেউ ছুঁয়েও দেখবে না।"

চেতন ফিরে আসতেই বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "কে ফোন করেছিল ?"

উত্তর দিতে যেন একটু সময় নিল চেতন। তারপর খানিকটা আপন মনেই বলল, "স্টুপিড। হবে কোনও স্কুলের বন্ধু।"

খাওয়াদাওয়ার পর চেতন সোজা উঠে এল নিজের ঘরে। মনটা খুব খারাপ লাগছিল তার। আজ বাধ্য হয়েই দু'-দু'বার মিথ্যে বলতে হয়েছে তাকে। প্রথমবার তো সেই প্রশান্ত সারের ক্লাসে। আর একটু আগে বাবাকে। আসলে ফোনটা ছিল ভারী অদ্ভুত। চেতনের স্কুলের কোনও বন্ধু-টন্ধুর নয়। একটা অচেনা লোকের। ফোনটা ধরতেই লোকটা বলল, "তুমি জানলার ধারেই বোসো। তোমাকে ভাল করে দেখতে চাই। আমাকে একটা বিপদে তুমি সাহায্য করবে ?" তারপরই লাইনটা কেটে দিল।

কথাটা বললে এক্ষুনি দাদু, বাবা, মা, ব্রিজভূষণ ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। এমনকী তার স্কুলে যাওয়াও হয়তো বন্ধ হয়ে যেত কয়েকদিন। অথচ লোকটা তো কোনও থ্রেট করেনি। কীরকম বন্ধুর মতো তার সাহায্য চাইছিল আকুল হয়ে ! কেন ? যাই হোক, স্কুলের জানলার পাশে আবার সে তো আসবেই।

॥ ৩ ॥

ওদের বাড়ি থেকে স্কুলের যা দূরত্ব খুব সহজে হেঁটেই এর চেয়ে আগে পৌঁছে যাওয়া যেত। বাবার সবটাতেই বাড়াবাড়ি। পার্ক স্ট্রিটের জ্যামে ফেঁসে বাবার হাত টেনে বারেবারে ঘড়ি দেখছিল চেতন।

"ডোন্ট ওয়রি। তুমি ঠিক সময়ে পৌঁছে যাবে স্কুলে।" মনন চট্টোপাধ্যায় শান্ত করবার চেষ্টা করেন ছেলেকে।

"সাব ম্যায় গোঁদ মে লেকর পৌঁছা দুঁ ?"

"না, কোলে চেপে যাব না।" সুখরাম চাচার হাস্যকর প্রস্তাবে প্রতিবাদ করে ওঠে চেতন।

সুখরাম চাচা চেতনের বাবার খাস লোক। পুলিশেই চাকরি করেন। এমনিতে খুব ভাল। এদের নাকি পুলিশে রাখাই হয়েছে প্রয়োজনে গায়ের জোর খাটানোর জন্য, বুদ্ধির জন্য তো রোগাপাতলা অফিসাররা আছেনই। জ্যামে আটকে—এই কথাটাই ভাবছিল চেতন। একবার ঘুরে সুখরাম চাচার দিকে তাকায় চেতন। বাবার চোখ এড়িয়ে সুখরাম চাচা একমনে খৈনি ডলছেন।

যাক জটটা খুলেছে। জিপটা স্কুলের গেটের কাছে থামতেই এক লাফে নেমে গেটের দিকে ছুট লাগাল চেতন। টা টা করবার সময়ও পেছন ফিরে দেখল না।

প্রার্থনা শেষ না হওয়া অবধি ক্লাসরুমের মুখেই দাঁড়িয়ে রইল চেতন। প্রার্থনা শেষে সবাই বসলে চেতন বলল, "মে আই কাম ইন সার ?"

ক্লাস টিচার শিলাদিত্য বিশ্বাস এমনিতে চেতনকে খুবই ভালবাসেন, কিন্তু নিয়মরক্ষার জন্যেই হয়তো বললেন, "যাও, ফাদারকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে এসো। ইউ আর লেট।"

ফাদারের ঘরে যেতে যেতে এবার বাবার ওপরে আরও রাগ হচ্ছিল

(এর পরে ৩৪ পাতায়)

ফটাস
ফট
?
প্রচণ্ড গরমে টায়ার ফাটছে ...
কুট্টুস ! ...
কুট্টুস !
ও, তুই ওখানে ? কী করছিস ? যখন ডাকলাম এলি না কেন ? আয় !
কুট্টুস নড়তে পারছে না ... মনে হচ্ছে ... মনে হচ্ছে ... অসাড় হয়ে গেছে !
বাঁচাও টিনটিন, বাঁচাও !
বেচারা কুট্টুস !
এ কী...? ও, এখন বুঝতে পারছি, প্রচণ্ড তাপে রাস্তার পিচ গলে গেছে...
তারাটা চুলোয় যাক !
হায় !... ওরা যদি জানত ! ...
টং টং
টং টং
টং টং
টং
?
রায় বেরিয়েছে । দুঃখের সময় । পৃথিবীর শেষ ঘনিয়ে এসেছে ।
?
আমি ভবিষ্যদ্বক্তা ফিলিপলাস ! আমি ঘোষণা করছি, শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর ! ... মানুষ সব ধ্বংস হয়ে যাবে ! যারা বাঁচবে তারা মরবে খিদেয়, ঠাণ্ডায় । ...মড়ক, দুর্ভিক্ষ, হাম !

আশ্চর্য উল্কা

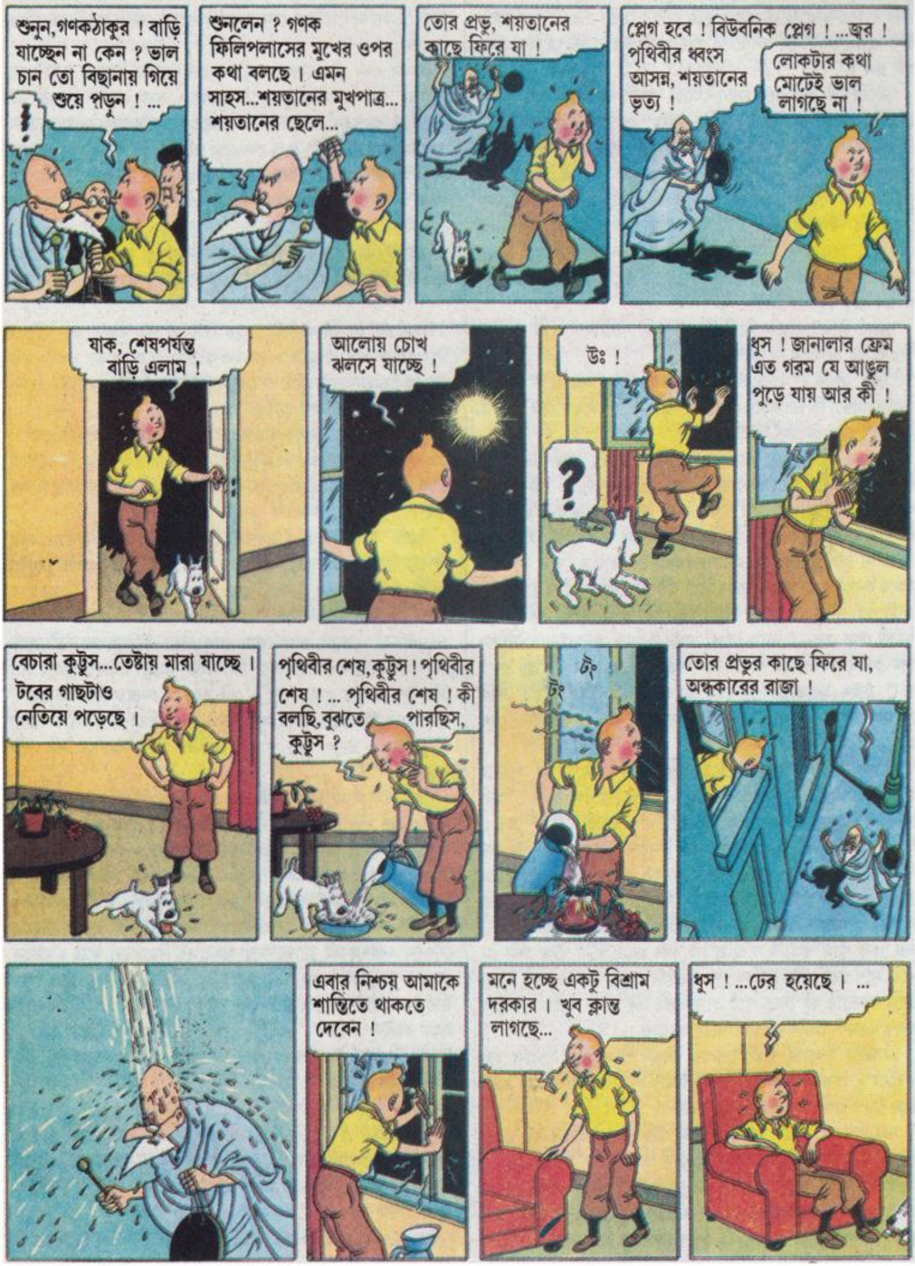
শুনুন, গণকঠাকুর ! বাড়ি যাচ্ছেন না কেন ? ভাল চান তো বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ুন ! ...
শুনলেন ? গণক ফিলিপলাসের মুখের ওপর কথা বলছে । এমন সাহস...শয়তানের মুখপাত্র... শয়তানের ছেলে...
তোর প্রভু, শয়তানের কাছে ফিরে যা !
প্লেগ হবে ! বিউবনিক প্লেগ ! ...জ্বর ! পৃথিবীর ধ্বংস আসন্ন, শয়তানের ভৃত্য !
লোকটার কথা মোটেই ভাল লাগছে না !
যাক, শেষপর্যন্ত বাড়ি এলাম !
আলোয় চোখ ঝলসে যাচ্ছে !
উঃ !
ধুস ! জানালার ফ্রেম এত গরম যে আঙুল পুড়ে যায় আর কী !
বেচারা কুট্টুস...তেষ্টায় মারা যাচ্ছে । টবের গাছটাও নেতিয়ে পড়েছে ।
পৃথিবীর শেষ, কুট্টুস ! পৃথিবীর শেষ ! ... পৃথিবীর শেষ ! কী বলছি, বুঝতে পারছিস, কুট্টুস ?
টং
টং
তোর প্রভুর কাছে ফিরে যা, অন্ধকারের রাজা !
এবার নিশ্চয় আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবেন !
মনে হচ্ছে একটু বিশ্রাম দরকার । খুব ক্লান্ত লাগছে...
ধুস ! ...ঢের হয়েছে । ...

(উপন্যাস : সাদা মিথ্যে ■ ৩১ পাতার পর)

চেতনের। সকলের সামনে অপমানিত হতে চেতনের খুব লজ্জা করে। এসব ভাবতে-ভাবতেই করিডর ধরে এগোচ্ছিল চেতন। হঠাৎ পাশ থেকে কেউ বলে গেল, "আই অলওয়েজ প্রেফার আ উইন্ডো সিট হোয়েন এভার আই ফ্লাই।"

উইন্ডো সিট শব্দ দুটো কানে যেতেই চেতন বোঁ করে ঘুরে পেছনে তাকাল। তারপর নিজেই লজ্জা পেয়ে গেল। ওটা সেকেন্ডারি সেকশনের এক দাদা। ওদের প্রি-টেস্ট চলছে। তাই বই খুলে পায়চারি করতে করতে কোনও অংশ মুখস্থ করছে বোধ হয়। কিন্তু ওদেরও তো দশটা থেকে পরীক্ষা! এখানে এখনও কী করছে? ঠিক সেই সময় সেকেন্ডারি বিল্ডিং-এ একটা টানা ঘণ্টা পড়ল আর দাদাটাও দুমদাম শব্দ করে ছুটে চলে গেল বড় স্কুলের দিকে। ঘটনাটা শনিবারের রাতের ফোনটাকে মনে করিয়ে দিল চেতনকে। তবে কি আজও আবার লোকটা আসবে নাকি জানলার ধারে?

ফাদার নিজেই ডেকে নিলেন চেতনকে। বললেন, "এসো। একটু পরে আমিই তোমাকে ডেকে পাঠাতাম।"

"কেন ফাদার?" চেতনের গলায় সামান্য ভয়। তা হলে জানলার পেছনের মুখটা কি ওর বন্ধুদের মধ্যে আরও কেউ দেখেছে? সেই কথাটাই কি ফাদার ওকে জিজ্ঞেস করবেন?

চেতনের হাতে মেলে ধরা স্কুল ডায়েরিটা নিজের কাছে টেনে লেট কলামে সই করতে করতে ফাদার বললেন, "চেতন, গরমের ছুটি পড়বার আগে এবারও স্কুলে সায়েন্স এগজিবিশন আর ড্রামা হবে। তোমাকে প্রাইমারি মনিটার হতে হবে। টিফিন ব্রেকে আমার ঘরে এসো। যাও।"

চেতন সিঁড়ি বেয়ে নিজের ক্লাসরুমের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। ড্রামার কনসার্টটা এখন তার বুকের মধ্যে বাজছে। বিরাট দায়িত্ব।

নিজের ডেস্কে বই রাখতে গিয়ে নুড়ি পাথর চাপা দেওয়া একটা ছোট্ট চিরকুট পেল চেতন। তাতে লেখা, "ব্যাটা হিংসুটে, ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন গেম ক্লাব থেকে তোকে আমরা বাদ দিলাম।" তলায় লেখা, "কচু খেগে যা!" ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন গেম ক্লাবের সদস্য সংখ্যা সাত। বাকি ছ'জনের দিকে তাকাল চেতন। একসঙ্গে ছ'-ছ'টা মুখই ঘুরে গেল ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে।

নিজের বাড়িতে যেভাবে বেড়ে উঠছে চেতন তাতে ওর ভাববার ক্ষমতাটা ওর বয়েসী ছেলেদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। অন্য যে-কোনও ছেলে হলেই হয়তো উলটো লিখে পাঠাত, "বয়েই গেল। আমিও মনিটার হয়েছি। স্কুলের সব অনুষ্ঠান থেকে তোদেরও বাদ দিলাম!" কিন্তু এমনটা চেতন কখনওই ভাবতে পারবে না। বরং ওর মনে হল বন্ধুদের ওর ওপরে খেপে যাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। ওরা কল্পনা করে রহস্য পাকিয়ে তোলে, আবার কল্পনা দিয়েই সেসবের জট খোলে। আর রহস্য খুঁজে পাওয়ার মতো সত্যিই যখন একটা ঘটনা ঘটল তখন সে নিজে মুখে তো সেটা ওর বন্ধুদের জানায়নি। মনে মনে ভাবল, টিফিন ব্রেকে ফাদারের ঘর থেকে ঘুরে এসে অন্তত এই ছ'জন বন্ধুকে সব খুলে বলবে, এমনকী সেদিন রাতের ফোনের কথাটাও।

ক্লাসরুমে সকলের খাতা খোলার খসখস শব্দে হঠাৎ খেয়াল হল চেতনের। চেতনও দ্রুত ওর ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড কম্পোজিশনের খাতা টেনে বার করল ওর বটল গ্রিন ব্যাগ থেকে।

সার বললেন, "রাইট অ্যান এসে অন হুইচএভার সাবজেক্ট ইউ লাইক বাট ইট মাস্ট বি সাবমিটেড বিফোর দ্য বেল রিংগস্।"

বাইরে একটু একটু মেঘ জমছে। ক্লাসের ভেতরেও কারও কোনও সাড়াশব্দ নেই। সবাই জানে এই রচনাগুলোর মধ্যেই কয়েকটা বাছাই হয়ে স্কুলের ম্যাগাজিনে ছাপা হবে। চারপাশটা চুপচাপ হয়ে গেলেই চেতনের মনখারাপ হয়ে যায়। মনে হয় কেমন যেন একা-একা হয়ে গেছে সে। তার খেলার সঙ্গীসাথীরা যেন সকলেই তাকে খেলা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে।

চেতন এখন ক্লাস ফোরে পড়ে। বাবার চাকরির কারণেই এরই মধ্যে দু-দু'বার স্কুল পালটেছে, জয়পুরে থাকবার সময় একটা তুলোর উট পেয়েছিল সে স্কুল থেকে। আর পুনেতে যখন ট্রানমিশনে পড়ত তখন পনেরোই অগস্টে একটা ছোট্ট পেতলের তলোয়ার! খেলনা দুটো কোথায় যে গেল কে জানে? জয়পুর পুনের বন্ধুগুলোর মতো ও দুটোও হারিয়ে গেছে। তাই বন্ধু হারাবার কথা ভাবলেই এখন কেমন ভয় করে চেতনের।

বাইরে মেঘ ডাকছে। বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে খুব সাবধানে চোখের জল মুছে নিয়ে চেতন লিখতে শুরু করে, 'দ্য লস্ট টয়েস..."

ফাদারের ঘর থেকে মিটিং সেরে বেরিয়েই স্কুল চার্চের বড় ঘড়িটার দিকে নজর গেল চেতনের। সর্বনাশ করেছে, পৌনে একটা! আর মাত্র পনেরো মিনিট আছে হাতে। সোহম, প্রতীকদের সঙ্গে ঝগড়াটা যেমন করেই হোক মিটিয়ে নিতে হবে।

বড় স্কুল ছোট স্কুলের ছাত্রদের ইউনিফর্মে কোনও তফাত নেই। স্কুল-কম্পাউন্ডের ভেতরে তিন-তিনটে খেলার মাঠে দূর থেকে সবাইকে একই রকম দেখায়। যেখানেই থাক ওরা ছ'জন একই সঙ্গে থাকবে সন্দেহ নেই।

ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ক্লাবের যে ক'টা গুপ্ত স্থান ছিল স্কুল কম্পাউন্ডে, দশ মিনিটের মধ্যে তার সবক'টিতে খুঁজে এসেও কোনও হদিস পেল না ওদের। নাঃ; এবার টিফিনটা খেতে হয়। ওরা ইচ্ছে করেই আজ চেতনকে এড়িয়ে চলছে। বোধ হয় আর কথাও বলবে না কোনওদিন। ভেবেই কান্না পেয়ে গেল ওর। টিফিনগুলো মাঠে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ট্যাপ-ওয়াটারে ধুয়ে নিল টিফিন বাক্সটা। বেশ জোরে চাপ দিয়ে জল ঢালতে লাগল মুখে। সেই সুযোগে কেঁদেও নিল অনেকটা। তারপর শার্টের হাতায় মুখের জল মুছতে-মুছতে ধীরে-ধীরে উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। ভাবল বেল পড়বার আগেই নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়বে।

ক্লাসরুমে ঢুকেই চমকে উঠল চেতন। ওরা ছ'জন জানলার ধারের আসনগুলো দখল করে বসে আছে। চেতনকে দেখেও না দেখার ভান করল ওরা। চেতন লক্ষ করল চেতনের ব্যাগটাও ওরা রেখে দিয়েছে একেবারে ঢোকার মুখে ফার্স্ট বেঞ্চে। এখন থেকে যে পর পর দুটো পিরিয়ড হবে সেটা নীতিবিজ্ঞানের ক্লাস। এই ক্লাসটা মাসে একদিন হয় এবং এই ক্লাসটায় কারও বসবার জায়গা ঠিক না রাখলেও চলে। দুটো সেকশন একসঙ্গে এই ক্লাসটা করে বলেই এই নিয়ম চালু আছে। চেতন বুঝতে পারে ওর ছ'বন্ধু সেই সুযোগটাই নিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ ওরা জানলার পাশটাই বা বেছে নিতে গেল কেন? এখন ওদের দিকে তাকাতেই লজ্জা করছিল চেতনের। ভালই হল,বেল পড়তে শুরু করেছে।

এত সহজ ইংরেজিতে কথা বলেন ফাদার ইউজেনিও যে, ইংরেজিটাকেও মাতৃভাষা বলে মনে হয়। জীবনে কোনটা ভাল কোনটা খারাপ এসব দারুণ দারুণ গল্প বলে বুঝিয়ে দেন ফাদার।

আজ এমন একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছেন যে, চেতন কখনও শোনেনি। ফাদারের কথাগুলো খুব সাবধানে বুঝে বুঝে নিজের ভাষায় চালান করতে থাকে নিজের মনেই। দাদুও বলেন, "অন্য ভাষা রপ্ত করবার এটাই সবচেয়ে বড় কায়দা!"

"সত্যির তো সবটাই সত্যি। তাই বলে মিথ্যেরও সবটাই মিথ্যে নয়।

মিথ্যেরও একটা সত্যি থাকে। কখনও কখনও মিথ্যের সেই সত্যিটা সত্যির সত্যি চেয়েও বড়-সত্যি হয়ে যায়।" ফাদার বলতে যাচ্ছিলেন চেতনের বাধা পেয়ে থামেন।

"প্লিজ এক্সপ্লেন ফাদার।"

"আই উইল।"

ফাদারের কথা শোনাবার পর, হোয়াইট লাই ! সাদা মিথ্যে ! শব্দ দুটো মনের মধ্যে গেঁথে নিল চেতন।

ফাদার ইউজেনিওর ক্লাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এমন সময় একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল ক্লাসরুমে। মোট্টু মানে শুভব্রত মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে জানলার বাইরে কোনও একটা ভয়ঙ্কর কিছুর অস্তিত্ব বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল আঙুল তুলে। শুভব্রত ছ'জনের একজন। জানলার ধারে বসা ওর বাকি পাঁচ বন্ধুও ভীষণ ভয় পেয়ে ছুটে চলে গেল ফাদারের পেছনে। মুহূর্তের মধ্যে জানলার ধারের সব বেঞ্চ ফাঁকা হয়ে গেল। রীতিমত আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে ক্লাসরুমের ভেতরে। চেতনের বেশ কয়েকজন বন্ধু ভয় পেয়ে কাঁদতেই শুরু করে দিয়েছে। শুভব্রত ওর জায়গায় বসে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। ঘটনার আকস্মিকতায় ফাদারও ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছেন। শুভব্রত লুটিয়ে পড়তেই ফাদার ছুটে ওর পাশে গিয়ে ওকে বারবার ঝাঁকিয়ে জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করতে করতে প্রশ্ন করলেন।

"হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার ? হোয়াট ওয়াজ হি ট্রাইং টু পয়েন্ট আউট ?"

শোরগোলের মধ্যে প্রায় না শুনতে পাওয়ার মতো করে সোহম যে কথাগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে বলল তা মুভিতেই দেখতে পাওয়া যায়।

"ফাদার, আ পারসেন উইথ এ গান ! হি ওয়াজ ট্রাইং টু শুট সাম ওয়ান !"

শুভব্রতকে কোলে তুলে ফাদার দ্রুত ক্লাসরুমের বাইরে যেতে যেতে সবাইকে বললেন, "ফলো মি।"

শুধু চেতনের শরীর নড়ল না। নিজের জায়গায় পাথরের মতো শক্ত হয়ে বসে রইল চেতন।

॥ ৪ ॥

আজ তিনদিন হল স্কুল বন্ধ। সোমবারের সেই ঘটনার পর থেকেই পূর্ণ তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্কুল বন্ধ রাখবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি। কী হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই জানতে পারছে না চেতন। বাবা বলেছেন স্কুলের কোনও বন্ধুর বাড়ি যাওয়া বা ফোন করা চলবে না এবং স্কুলের কোনও বন্ধু যদি চেতনকে ফোন করে তবে রিসিভ করা চলবে না। এতে নাকি তদন্তের অসুবিধে হবে, প্রয়োজন হলে পুলিশই ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। চেতন বুঝতে পারছে তার বাবার ওপরে স্কুলের ফাদাররা খুব নির্ভর করছেন। চেতন স্কুলের ছাত্র হওয়ায় বাবাকেও বিশেষভাবে চিন্তিত দেখাচ্ছে ক'দিন ধরেই। কিন্তু মজার কথা হল, বাবা কিন্তু এই ক'দিনে ফাদার ইউজেনিওর ক্লাসের ঘটনা সম্পর্কে একটি কথাও জিজ্ঞেস করেননি তাকে। চেতন সেদিন বাড়ি ফিরে যেটুকু বলেছিল সেটুকুই খুব মন দিয়ে শুনেছিলেন, এই অবধি। পুলিশ কি চেতনকে কিছুই প্রশ্ন করবে না ? অবশ্য করবেই বা কেন ? ওর যে ছয় বন্ধু নিজেদের চোখে দেখেছিল লোকটাকে তাদেরই জিজ্ঞেস করা স্বাভাবিক। কিন্তু চেতনের কাছেই যে সবচেয়ে বড় তথ্য আছে সেটা তো চেতন ছাড়া আর কেউই জানে না। স্কুলের স্বার্থে তবে কি কথাগুলো তার নিজেরই পুলিশকে জানানো উচিত ? একটা ভাবনাতেই একটু খটকা লাগছে, চেতনকে যে ফোন করেছিল সে তো চেতনকেই জানলার ধারে বসতে বলেছিল এবং অসহায় ভাবে সাহায্য চেয়েছিল। চেতনই যদি তার সেদিনের টার্গেট ছিল তবে ফার্স্ট বেঞ্চের বিপরীত দিকে বসা চেতনকে মারবার জন্য তো লোকটির প্রায় ঘরের মাঝের জানালা অবধি আসতেই হত। কিন্তু সোহম, শুভব্রত যে জায়গায় ওকে দেখেছিল সেখানে দাঁড়িয়ে যদি কাউকে লোকটা নিশানা করেই থাকে তবে তা বাঁ দিকে বসা কোনও বন্ধুকে। তাই চেতন এখনও নিশ্চিত নয় যে, সেদিন শুভব্রতরা যাকে দেখেছিল এবং যে চেতনের সাহায্য চেয়েছে দু'জন একই লোক কি না। তাই চেতন মনে মনে ঠিক করল যতক্ষণ না কেউ তাকে কিছু প্রশ্ন করছে ততক্ষণ সে নিজে আগ বাড়িয়ে কিছু বলবে না।

বাইরে বেল বাজছে। চেতন চট করে দেওয়ালঘড়িটার দিকে তাকায়। বিকেল পাঁচটা সাঁইত্রিশ। বাবার তো এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কথা নয়। কে এল ? দরজা খুলতে যাচ্ছিল চেতন, ব্রিজভূষণ বললেন, "নেহি। তুমি খোলবে না। হামি দেখছি।"

দরজার ওপাশে শুভব্রতর বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। ব্রিজভূষণের তাঁকে চেনার কথা নয়। ব্রিজভূষণ বলেন, "আপ ?"

শুভব্রতর বাবা চেতনকে দেখতে পেয়ে একটু হাসেন। চেতন বলে, "ইনি আমার বন্ধুর বাবা। ভেতরে আসুন আঙ্কেল।" চেতন অভ্যর্থনা করে শুভব্রতর বাবাকে বসাতেই ব্রিজভূষণ একরকম জোর করে চেতনকে টেনে নিয়ে ভেতরে যেতে-যেতে বললেন, "বৈঠিয়ে। মা জি ঘর পে হ্যাঁয়।"

সুমনা বসার ঘরে ঢুকতেই শুভব্রতর বাবা হাত জোড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সুমনা বললেন, "বসুন বসুন।"

শুভব্রতর বাবা খানিকটা সময় নিয়ে বললেন, "আপনি আমাকে বোধ হয় চিনবেন না।"

"চুন বলেছে। আপনি শুভর বাবা তো ?"

প্রথম পর্বটা সহজ করে দেওয়ার জন্যেই যেন কথাগুলো বললেন সুমনা।

"আসলে একটা প্রার্থনা নিয়েই আপনার কাছে এসেছি, মানে শুভর মা আপনার কাছে পাঠাল।"

"বলুন।"

ড্রয়িংরুমের বাইরে পরদার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে চেতন। বড়দের কথা এভাবে আড়ি পেতে শোনা অন্যায় সে জানে, তবু কী হচ্ছে তাকে একটু জানতেই হবে।

সুমনাকে বলতে শোনা যায়, "তার আগে বলুন আপনার ছেলে এখন আছে কেমন ? চুনের বাবা বলছিল ও নাকি মাঝেমধ্যেই ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠছে ?"

"ঘটনাটা যেদিন ঘটেছে সেদিন এমনিতে রাত্রিতে মোটামুটি ঘুমিয়েছে। কিন্তু তারপরই ওই ওর স্কুলের বন্ধুদের কাছ থেকে কোনও ফোন পেয়ে কেমন হয়ে গেল আবার। এখন তো সামলানোই যাচ্ছে না।"

পরদার এপাশে দাঁড়িয়ে চেতনের একটু অভিমানই হল বাবার ওপরে। এই তো তার বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে দিব্যি কথা বলছে ফোনে। যত বাধা শুধু তার বেলাতেই।

সুমনাই নীরবতা ভাঙেন, বলেন, "কোনও ডাক্তার দেখিয়েছেন ?"

"আপাতত ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানই দেখছে। বলছে তো এখনই অন্য কোনওরকম ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন নেই, সব নাকি ঠিক হয়ে যাবে।"

"হ্যাঁ, আমার কাছে কীজন্য এসেছিলেন ?"

"আসলে পুলিশ শুভকে গত দু'দিন ধরে বড্ড বেশি প্রশ্ন করছে। এতে ওর ওপরে একটা চাপ পড়ছে। মোর ওভার কয়েকটি অস্ত্র নিয়েও ওকে দেখিয়েছে।"

"অস্ত্র !"

(এর পরে ৩৮ পাতায়)

অ্যাসটেরিক্স

গল্প : গোসিনি
ছবি : ইউদেরজো

কুটির
এর পর কে ?
কুটির
গ্রইক !
গ্রইক !
একটু পরে...
পরের জন !
সেরে গেল ?
কিছুটা । পুরোহিত ওকে দু'পায়ে হাটতে শিখিয়ে দিলেন ।
ঘোঁত ঘোঁত
কুটির
একটু পরে...
সেরে গেছি ! আকাশ মাথায় ভেঙে পড়ার ভয় নেই । মাথা যে নীচে !
দারুণ চিকিৎসা ! ইনি এটাসেটামিক্সকে সারিয়ে দেবেন ।
আপনারা যান !
আসুন ।
শুয়ে পড়ুন ।
আমি ?
?!

(উপন্যাস : সাদা মিথ্যে ■ ৩৫ পাতার পর)

"হ্যাঁ, ওই বন্দুকটন্দুক আর কি ! মানে ওরা শুভর কাছে জানতে চাইছিল যে, লোকটার হাতে ওইরকমই কোনও অস্ত্র ছিল কি না। ম্যাডাম, আপনি যদি আপনার হাজব্যান্ডকে একটু বুঝিয়ে বলেন—"

"দেখুন এ-ব্যাপারে তো আমি ওকে কিছু বলতে পারব না ; বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা সাঙ্ঘাতিক। পুলিশকে বেশি মাত্রায় সাবধানী হতে হবে। তবে এইটুকু বলতে পারি ও আপনার ছেলেকে নিজের ছেলের চেয়ে এতটুকু কম করে ভাববে না।"

"অনেক ধন্যবাদ। ওটুকু হলেই হবে।" যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ান ভদ্রলোক।

সুমনাও দরজা অবধি এগোতে-এগোতে বলেন, "যতদিন না একটা সমাধান হচ্ছে ছেলেদের তো স্কুলে পাঠানোও যাবে না। আপনার ছেলে এমনিতে কোনও ডেসক্রিপশনও দিতে পারছে না, না ?"

"এক-একবার এক-একরকম বলছে,মানে শকটা এত মারাত্মক ছিল ! বুঝতেই পারছেন। আবার কখন বলছে চেতন সব জানে। শয়তানটা চেতনকে ফোনও করেছিল—"

"সে কী !" সুমনা চমকে ওঠেন।

তড়িৎপ্রবাহ শব্দ দুটো এর আগেও শুনেছে চেতন। মানেও জানে, এ বার যেন হাড়ে-হাড়ে টের পেল ! এক ছুটে নিজের ঘরে ঢুকেই প্রথমেই দরজাটা বন্ধ করল চেতন। স্কুল বিল্ডিংটা পুরো চক্কর দিয়েও কখনও এতটা হাঁপায় না ও, এখন যতটা হাঁপাচ্ছে। একটু পরেই হয়তো মা এসে কথাগুলো জানতে চাইবেন, কিন্তু তার চেয়েও যেটা বেশি অবাক করেছে তাকে যে চেতনের দেখা সেই মুখটার কথা যদিও বা শুভব্রত আন্দাজ করে বলে থাকে কিন্তু ফোনের ব্যাপারটা ও জানবে কোথা থেকে ?

চেতনের একটা ডায়েরি আছে। ডায়েরিটাতে আবার তালাচাবি দেওয়া। সেবারে দাদু আমেরিকাতে বেড়াতে গিয়ে কিনে এনেছিলেন চেতনের জন্য। যদিও সেটা চিনে তৈরি। সারাদিনে যা যা হয় চেতন তারিখ এবং সময় বসিয়ে সেই তালাবন্ধ ডায়েরিটায় নোট ক'রে রাখে। শুধু নীতিবিজ্ঞান ক্লাসে ফাদার ইউজেনিওর পিরিয়ডে যে-ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটেছিল তার বিবরণটা আর লেখা হয়ে ওঠেনি। সত্যি বলতে কী, সেদিনের পর থেকে ডায়েরিটায় আর হাত লাগিয়েও দেখেনি চেতন। ওর সর্বসময়ের সঙ্গী ওই ডায়েরিটা এখনও ওর বটলগ্রিন ব্যাগের সাইড পাউচেই পড়ে আছে চেনবন্দি হয়ে। হঠাৎ কী মনে হতে ওর স্কুল-ব্যাগ এনে সাইড পাউচের চেনটা সশব্দে খুলে ফেলল চেতন। কাঁপা হাতে ডায়েরিটা বার করল। এবার ছোট্ট চাবিটা দিয়ে ডায়েরির লকটা খোলার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু চাবিটা ঘুরছে না। ডায়েরিটা হাতে নিয়ে ঘোড়ার নালের মতো পেতলের বন্ধনীটায় চাপ দিতেই ওটা খুব সহজেই হাতে উঠে এল। যা সন্দেহ করেছিল তাই ! সেদিন টিফিনের পর ক্লাস শুরুর আগেই ওরা ছ'জন মিলে এই কীর্তিটি করেছে ! তার মানে ওরা চুরি করে ওর ডায়েরি পড়েছে ! ডায়েরি থেকেই তা হলে জেনেছে সব ?

দরজায় টোকা পড়ছে। শিরদাঁড়া সোজা হয়ে উঠল আপনা থেকেই। এক্ষুনি মা জিজ্ঞেস করবেন ফোনের কথাটা। কী জবাব দেবে সে ? মুহূর্তের মধ্যে মাথায় খেলে গেল শব্দ দুটো। হোয়াইট লাই। সাদা মিথ্যে। ডায়েরিটা ইচ্ছে করেই টেবিলে খুলে রেখে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল চেতন।

"দুধ পি লেও।"

প্রায় ধমকের সুরে কথাটা বলে চেতনের পড়ার টেবিলেই ছোট্ট ট্রেতে দুধের গেলাস নামিয়ে রেখে চলে গেলেন ব্রিজভূষণ-নানা। বাবা-মা চাচা বলে ডাকেন বলে ব্রিজভূষণ চেতনের নানা। ধমক দিয়ে খাওয়াবার অভ্যেস নানার। তবে দুধের সঙ্গে বিস্কুটে মাখন লাগিয়ে দিতে ভোলেননি। চিনি লাগানো মাখনগুলো চেটে খেতে-খেতে ভাবল চেতন, একটু পরে বাবা ফিরলেই মা নিশ্চয়ই বাবাকে জানাবেন শুভর বাবার কাছ থেকে শোনা নিউজটা। এবং তারপরেই দাদুকে সঙ্গে নিয়ে ঘর বন্ধ করে শুরু হয়ে যাবে মিটিং। মাঝে-মধ্যে ব্রিজভূষণ-নানা ঘরে ঢুকে তাঁর মতামতও দিয়ে আসবেন, এটাও জানে চেতন।

আজ যতরকম জেরার মুখেই পড়তে হোক না কেন, সাদা মিথ্যের ওপরে ভর করেই চেতনকে চলতে হবে। ওকে জানতেই হবে লোকটা কে ? কী চায় ?

বাইরে জিপের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওটা বাবার। সব জিপের আওয়াজ এক হলেও বাবারটা ও আলাদা করে চিনতে পারে। বাবা ফিরেছেন। এবার ?

চেতন একটু অবাকই হয়েছে। সারাটা সন্ধে কোনও তলবই আসেনি তার জন্য। এই এক্ষুনি খাবার টেবিলে গিয়ে যোগ দেওয়ার জন্য ডাক পড়েছে।

খাবার টেবিলে বসে নিশ্চিত হল চেতন যে, তাকে নিয়ে সকলের মধ্যে একদফা আলোচনা হয়ে গিয়েছে। সবাইকেই খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। চেতন লক্ষ করল, খাওয়ার কারও তেমন কোনও আগ্রহ নেই। দাদু বা বাবার প্লেটে এটা ওটা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছেন মা, কিন্তু নিজে প্রায় কিছুই খাচ্ছেন না। একটা সময় বাবার প্লেটে একটু বেশি মটর-কিমা পড়ে যাওয়ায় মায়ের ওপরে বেশ বিরক্ত হলেন বাবা। ভাগ্যিস দাদু পাশে আছেন। না হলে মাকে হয়তো ধমকই লাগিয়ে দিতেন। ভীষণ রেগে থাকলে বাবার গলা দিয়ে ওই আওয়াজটা বেরোয়। বাবার ধমকের চাইতেও ওই আওয়াজটাকে বেশি ভয় করে চেতন।

আজ খাওয়াটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ পর্যায়ে চলে এল। ব্রিজভূষণ-নানা শেষ পাতের সুইট ডিশ সার্ভ করতে এলেন। চেতন লক্ষ করল, চারটে বাটির ভেতরে একটা বাটিতেই দুটো চামচ গুঁজে দিয়েছেন নানা,আর একটি বাটিতে চামচই নেই। বুঝতে পারল ব্রিজভূষণ কোনও কারণে অমনোযোগী হয়ে আছেন। ট্রে-টা টেবিলে নামিয়ে রেখে চলে যাচ্ছিলেন নানা, হঠাৎ বাবা বললেন, "চাচা, ফোনের লাইনটা আমার শোয়ার ঘর থেকে খুলে এনে এ-ঘরের পয়েন্টে দিয়ে দাও তো। রাতে বেশ কিছু ইমপর্ট্যান্ট কল আসতে পারে, শুধু শুধু বাবার ঘুম ভাঙবে।"

ব্রিজভূষণ-নানা চলে যাওয়ার পর বাবা হঠাৎ চেতনকে বললেন, "আচ্ছা চুন,তোমার যে ছ'জন বন্ধু সেদিন ওই লোকটাকে বন্দুক হাতে দেখেছিল ওরা সব কেমন ছেলে ?"

"পড়াশোনায় সবাই খুব ভাল।"

"আমি জানতে চাইছি ছেলে হিসেবে কেমন ? অনেস্ট ?"

"খুব একটা না। মিথ্যেও বলে মাঝে-মাঝে। কেন ?"

"আমি তোমার থেকে জানতে চাইছি তুমি আমার থেকে নও।"

সারা শরীরটা বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেল চেতনের। মুখের ভেতরের জমা কাসটার্ডটা এক নিমেষে গলে গেল জিভের ওপরে। কোনওক্রমে ঢোক গিলে বলল, "সরি পাপা।"

হঠাৎ গলা নামিয়ে বাবা বললেন, "কাসটার্ডটা তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, গরম হয়ে গেলে ভাল লাগবে না।"

দাদু ওয়াশ-বেসিনে হাত ধুতে উঠে গেলেন। ব্রিজভূষণ ফোনের লাইন খুলে নিয়ে ফিরে এসেছেন। মা দাদু, বাবার এঁটো প্লেট তুলে নিচ্ছেন। বাবার দিকে চোখ পড়তেই চেতন লক্ষ করল চেতনের কাসটার্ড শেষ হওয়ার অপেক্ষায় আছেন তিনি। চেতনেরও আর খেতে ইচ্ছে করছিল না। বাটিটা নামিয়ে রাখতেই বাবা বললেন, "আজ তোমার বন্ধু শুভব্রতর বাবা এসেছিলেন জানো নিশ্চয়ই।"

চেতন ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ল। বাবা বললেন, "উনি তোমার মাকে বলে গেছেন শুভ নাকি মাঝেমধ্যেই বলছে তুমি সব জানো, মানে ওই লোকটির ব্যাপারে, যাকে ওরা দেখে ভয় পেয়েছে। সত্যি কিছু জানো ?"

ঠোঁটের দু'কোণে লেগে থাকা কাসটার্ডের ছোঁয়া নিজের জিভ দিয়ে ভাল করে পরিষ্কার করে নিয়ে চেতন বলল, "ওরা কাকে দেখেছে আমি জানি না। তবে আমি কাউকেই দেখিনি।"

বাবা আর কোনও প্রশ্ন না করে উঠে গেলেন হাত-মুখ পরিষ্কার করতে। দাদু এসে বসেছেন এবার। বললেন, "শনিবার রাতে আমরা যখন সবাই একসঙ্গে এখানে বসে খাচ্ছিলাম তখন তোর একটা ফোন এসেছিল। মনে আছে ?"

"মনে হয় কোনও বোকা বন্ধুর। বলেছিলাম তো মনে নেই ?"

"সে কি ফোনে তোকে কিছু বলেছিল ?"

"গলা পালটেই কীসব যেন বলছিল। তারপর তো লাইনটা কেটেই গেল।"

এর পরই অভাবনীয় একটা কাণ্ড ঘটে গেল। ব্রিজভূষণ এ-ঘরে লাইনটা গুঁজে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা বাজতে শুরু করল। দাদুই প্রথম উঠে গিয়ে ফোনটা ধরলেন। দাদুর বারবার হ্যালো বলা সত্ত্বেও কেউ কথা বলল না ওপাশ থেকে। দাদু রেগে গিয়ে ফোনটা বাবাকে দিলেন।

'হ্যালো'—'হ্যালো'—নাঃ, কোনও জবাব নেই। রিসিভার একহাতে চেপে দাদুকে বললেন বাবা, "মনে হয় কেউ ইচ্ছে করে বজ্জাতি করছে !"

বাবার হঠাৎ কী একটা মনে হতেই চেতনকে ডেকে নিলেন ফোনের কাছে। বললেন, "চুন,কথা বল তো।"

কাঁপা হাতে ফোনের রিসিভারটা কানে ঠেকাল চেতন। কোনওক্রমে বলল, "হ্যালো—"

ওপাশ থেকে সেদিনের সেই পরিচিত গলাটা শুনতে পেল চেতন। খুবই আস্তে শোনাচ্ছে গলাটা।

"তোমার বন্ধুরা কাউকে দ্যাখেনি। আমি স্কুলের ধারেকাছেও যাইনি। জ্বরে ভুগছি ক'দিন থেকে। মশারি টাঙিয়ে শোবে রোজ। খুব ম্যালেরিয়া হচ্ছে।"

চেতন লক্ষ করল বাবা খুব কাছে এগিয়ে এসেছেন। বোঝাবার চেষ্টা করছেন কিছু। চেতনও সেটা বুঝে খুব জোরে 'হ্যালো' 'হ্যালো' বলে যেতে লাগল। ভাবটা এমন করল যেন ওপাশ থেকে এখনও কোনও সাড়া মিলছে না। চেতনকে আর এই খেলা চালিয়ে যেতে হল না। সত্যি লাইনটা কেটে গেছে এবার। রিসিভারটা বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "কেটে দিয়েছে তো।"

দাদু খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপরই বাবাকে বললেন, "কাল থেকে এই নাম্বারে যত ফোন আসবে সব ট্যাপ করতে বলবি।"

বাবার মুখ দেখে মনে হল দাদুর সঙ্গে একমত হলেন।

॥ ৫ ॥

মুক্তিপণ দাবি করে শিশু অপহরণ এবং পরে পুলিশের ভয়ে সেই শিশুদের মেরে ফেলা, এমন কয়েকটা কেস হিস্ট্রি পুলিশের ফাইলে থাকলেও কোনও মোটিভ ছাড়াই স্কুলের শিশুদের ওপরে অকারণে গুলি চালানোর কোনও ঘটনা অন্তত কলকাতায় ঘটেনি কখনও। সেই কারণেই পুলিশের বাঘা-বাঘা কর্তারা ঘন-ঘন বৈঠকে বসছেন। বিশেষত যখন পুলিশের কর্তা মনন চট্টোপাধ্যায়ের ছেলের ক্লাসেই ঘটনাটা ঘটতে যাচ্ছিল।

রহস্যের জট খুলতে এই পাঁচদিনে পুলিশ মহল চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেনি। তিহার জেল থেকে সদ্য ছাড়া পাওয়া এইরকম বিকৃত মস্তিষ্কের দুই আসামির ছবিও আনিয়েছে পুলিশ। '৭১ সালে দেরাদুনে এবং সেই একই বছরে ভোপালে মোট সতেরোটি স্কুলের শিশুকে এরা গুলি করে মেরেছিল স্রেফ খেয়ালবশে। যদি কোনও কারণে এরা দু'জনই এখন এই শহরে এসে থাকে তাই কোনও ঝুঁকি নেয়নি পুলিশের ওপরমহল। একটা সমস্যা অবশ্য ছিল। এই দুই খুনির যা ছবি পাওয়া গিয়েছিল সেই দুটো ছবিই প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগের ছবি। তাই এখন তারা কেমন দেখতে হতে পারে তার প্রায় সঠিক চেহারাটা দফতরের বিশেষজ্ঞরা তৈরি করে দিয়েছেন। এই দুই খুনির এবং সঙ্গে আরও কিছু দাগি আসামির ছবি চেতনের ছ'জন বন্ধুকে দেখিয়ে একটা সূত্র পাওয়ার চেষ্টা করছে পুলিশ।

সুইং ডোর ঠেলে ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়েই অনুমতি চাইল অখিলেশ, "মে আই কাম ইন সার ?"

এই ঘরটিতে এতক্ষণ সবাই যেন তাঁরই প্রতীক্ষায় ছিল। মননের ব্যাকুলতাই সবচেয়ে বেশি। বললেন, "আসুন, আসুন, ইনস্পেক্টর মিত্র আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম সবাই। কিছু বোঝা গেল ?"

"একটু জল খেয়ে আসব সার !" বলাবাহুল্য বাঘা বাঘা পুলিশ কর্তাদের সামনে অখিলেশ কার কাছেই বা জল চাইবে ? রীতিমত ঘামছে সে।

নিজের কুলার থেকে জল ঢেলে মনন বললেন, "নিন।"

ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেল অখিলেশ। "সার আপনি ?"

জলটা অখিলেশের হাতে তুলে দিয়ে মনন চট্টোপাধ্যায় বললেন, "এটা একটা টিম ওয়ার্ক। এখানে বেশিটাই 'আমরা', 'আমিটা' কম।"

চেতনদের স্কুলটা যে থানার অন্তর্ভূত সেই থানারই সাব ইনস্পেক্টর অখিলেশ। ফাদার ইউজেনিওর ক্লাসে সেদিনের ওই অভাবনীয় ঘটনার বিবরণ যেহেতু অখিলেশের থানাতেই নথিভুক্ত করা হয়েছিল তাই তদন্তকারী অফিসার হিসেবে অখিলেশকেই এই দায়িত্ব নিতে হয়েছে।

ধূসর রঙের বাটিতে ঢালা বরফ-ঠাণ্ডা জলটা একচুমুকে শেষ করে অখিলেশ বলল, "সার, আর একটু।"

দ্বিতীয় পাত্রে চুমুক মারতে মারতে অখিলেশ বলল, "ছ'টা বাড়িতেই গিয়েছিলাম। আমাদের কালেকশনের ক্রিমিনালদের সব ছবিই দেখিয়েছি কিন্তু ওরা কাউকেই আইডেন্টিফাই করতে পারল না। উলটে এক-একজন এক-একরকম বর্ণনা দিচ্ছে লোকটার। মোর ওভার গত পরশুর দেওয়া স্টেটমেন্টের সঙ্গে আজকের দেওয়া অনেক স্টেটমেন্টই মিলছে না। তবে শুভব্রত নামে ছেলেটা একটা অদ্ভুত কথা বলছে—"

"কী বলছে ?" মননের গলায় একটা সতর্কতার ছোঁয়া।

"আপনার ছেলের কাছে নাকি একটা ডায়েরি আছে। আর সেটা থেকে নাকি অনেক কিছু জানা যাবে। আরও একটা অবিশ্বাস্য কথা বলছে—" মাঝপথে থামে অখিলেশ। এতই নীরব এখন ঘরের পরিবেশ যে, অখিলেশের ঢোক গেলাটাও শুনতে পাওয়া গেল।

"এত হেজিটেট করছেন কেন ? বলুন।" উত্তেজনার পাশাপাশি মননের গলায় একটু বিরক্তিও প্রকাশ পায়।

"মানে লোকটাকে নাকি আপনার ছেলে চেনেও। ফোনে নাকি কথাও হয়েছে ওর সঙ্গে !"

বাবা পুলিশে চাকরি করেন বটে কিন্তু বাবাকে কখনওই পুলিশ-পুলিশ মনে হয় না চেতনের। এই প্রথম কোনও পুলিশের সামনে বসে সওয়ালের জবাব দিচ্ছে চেতন। চেতনের মনে মনে একটু আফসোসই হচ্ছে তার

জবাবদিহিটা থানায় ডেকে পাঠিয়ে নেওয়া হল না বলে।

টেলিভিশনের দৌরাত্ম্যে এখন ঘরে বসেই ছোটরা অনেক কিছু দেখছে, জানছে, শিখছে। চোখেমুখে কথা বলার একটা ধরন তৈরি হচ্ছে। সোজাসুজি অখিলেশের মুখের দিকে তাকিয়ে খুব স্বাভাবিক গলায় বলল চেতন, "বলুন কী জানতে চান ?"

"তোমার কাছে কোনও ডায়েরি আছে ? তোমার বন্ধু শুভব্রত বলছিল ?"

"আছে।"

"আমাকে একবার দেখাতে পারো তোমার ডায়েরিটা ?"

"নিশ্চয়ই।" পড়ার টেবিল থেকে ডায়েরিটা তুলে অখিলেশের দিকে এগিয়ে দিল চেতন।

ডায়েরির দু-একটা পাতায় একটু চোখ বুলিয়ে প্রশ্ন করল অখিলেশ, "তুমি রোজ ডায়েরি লেখো ?"

"মাঝখানে দু-একদিন লিখতে ভুলে গেছি।"

"কী কী লেখো ?"

"কার কার সঙ্গে দেখা হল। কে কী বলল। দাদুর সঙ্গে কোথায় কোথায় বেড়াতে গেলাম, এইসব।"

জিভ দিয়ে একটা বিরক্তির শব্দ করেন দাদু। নিজের ছেলের উদ্দেশে বলেন, "তোমরা তাড়াতাড়ি পয়েন্টে এসো। চুন এখনও চান করেনি।"

"কিন্তু আমাদের কাজটা তো করতে হবে বাবা।" জেলাশাসকের উদ্দেশে খুব ছোট্ট করেই জবাব দেন মনন।

"যা ইচ্ছে করো।" নাতির এই হ্যারাসমেন্ট সহ্য হচ্ছে না দাদুর। ঘর থেকে বেরিয়ে যান তিনি।

চেতনের পড়ার ঘরের দোরগোড়ায় মা দাঁড়িয়ে ছিলেন। দাদু বেরিয়ে যাওয়ার পর বাবা উঠে পড়ার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। এবার চেতনের একটু ভয় করতে লাগল। দাদু, মা পাশে থাকায় একটু আগে পুরো ব্যাপারটাই চেতনের কাছে ওর ক্লাবের ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন গেমের মতোই মনে হচ্ছিল,কিন্তু এখন মনে হল ব্যাপারটা আর খেলা খেলা লাগছে না।

অখিলেশ মিত্রর হাত থেকে চেতনের ডায়েরিটা তুলে নিয়ে মনন চট্টোপাধ্যায় বললেন, "উইথ ইয়োর পারমিশন অফিসার।চেতন—"

বাবা চেতন বলে সম্বোধন করছেন। চুন বলে আর ডাকছেন না। এবার বাবাকে পুলিশ পুলিশ মনে হচ্ছে। চেতনও বলে ফেলল, "ইয়েস সার—"

"তোমার ডায়েরিতে একটা ফোনের কথা লিখেছ। কেউ একজন তোমাকে ফোন করে বলেছে, তুমি জানলার ধারেই বোসো। তোমাকে ভাল করে দেখতে চাই। আমাকে একটা বিপদে তুমি সাহায্য করবে ? এই লোকটি কে ?"

সাদা মিথ্যে কথা দুটো ভোলেনি চেতন। চটপট উত্তর দিল, "কেউ না। ওটা আমি ইমাজিন করে লিখেছি। তেমন লোক আমাকে সত্যি সত্যি ফোন করেনি।"

"মিথ্যে বোলো না। যে ডেট এবং টাইম তুমি লিখেছ তোমার ডায়েরিতে আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে সেদিন সেই সময়ে খাবার ঘরে এসে ব্রিজভূষণ বলেছিলেন তোমার একটা ফোন এসেছে। এবং তুমি ফোনটা ছেড়ে এসে আমাদের বলেছিলে তোমার কোনও নির্বোধ বন্ধু ফোন করেছিল। পরে জানিয়েছিলে সে নাকি গলা পালটে তোমাকে কী সব বলছিল !"

বিন্দুমাত্র সময় না নিয়ে চেতন বলল, "আর একটা মাত্র পাতা পেছনে উলটে দ্যাখো। আমি লিখেছি, আজ আমি আমার ক্লাসরুমের বাইরে একটা অদ্ভুত লোককে দু'-দু'বার উঁকি মারতে দেখেছি। চোখাচোখি হতেই লোকটা সরে গেল। কী মতলবে এসেছিল লোকটা ? লেখা আছে না ?"

ডায়েরিতে চোখ বুলিয়ে ছেলের কথার মিল খুঁজে পেলেন মনন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কপালের ভাঁজ স্পষ্ট হয়ে উঠল। অবাক হওয়াটাও গলার আওয়াজে লুকনো গেল না। বললেন, "এসবের মানে কী ?"

"আমাদের ক্লাসরুমের বাইরে সেদিন এইরকম কোনও লোককেও আমি দেখিনি। এটাও ইমাজিনেশন। আমার স্কুলের সব দেওয়ালেই নানারকম ছবি আঁকা আছে। আমার ক্লাসরুমের জানলা দিয়ে যে দেওয়ালটা দেখা যায় সেটাতে র‍্যাম্বোর একটা ছবি আছে। জিত ব্রহ্ম বলে একটা ছেলের আঁকা। অন্য সেকশনে পড়ে। ওর আঁকা ওই ছবিটার দিকে তাকাতে তাকাতে আমাদের ক্লাবের ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন গেমের জন্য একটা আইডিয়া আমার মাথায় আসছিল। তাই লিখে রেখেছিলাম। সেদিন রাতে আমার এক বন্ধু গলা পালটে দুষ্টুমি করছিল ঠিকই কিন্তু আমি ইমাজিন করেছি অ্যাজ ইফ এই লোকটারই ফোন।"

মনন চুপ করে কী যেন একটা ভাবছেন। অখিলেশ বলে, "তার মানে তুমি বলতে চাইছ তোমার বন্ধুরা যেটা করছে, যা বলছে সবটাই তোমার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন গেমের ফল ?"

"ওরা সত্যি কিছু দেখেছে কি না সেটা আমি কেমন করে বলব ?"

"তোমার ডায়েরি তুমি তোমার বন্ধুদের দেখতে দাও ?"

"নেভার। এমনকী আমার আইডিয়ার কথাও আমি বলি না। আমাদের ইনভেস্টিগেশনে তো আমি গোয়েন্দা প্রধান। বাকিদের আমি ঠিক করে দিই কে কী সাজবে। তারা তাদের মতো প্লে করে। আমি শুরুটা বলে দিই। যেমন, একটা লোক ক্লাসরুমে প্রায়ই এসে উঁকি মারে। কেন ? নাউ ফাইন্ড আউট ! শুভব্রতটা একদম বোকা। ও ক্রিমিনাল সেজে আমাকেই এসে জিজ্ঞেস করে এইভাবে করব মার্ডারটা ? ওই স্টুপিডটাই চুরি করে আমার ডায়েরি পড়েছে সেদিন। এই দেখুন ডায়েরির লকটা ভাঙা।"

মনন এবং অখিলেশ দু'জনেই লক্ষ করেন চেতনের কথা মিথ্যে নয়। মননের আদেশের জন্যই যেন অপেক্ষা করতে থাকে অখিলেশ। মনন ছেলেকে বলেন, "চুন, তুমি যাও। তোমার স্নানের দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

চেতন লাফিয়ে উঠে বলে, "থ্যাঙ্ক ইউ সার।"

ছোট্ট করে ধমক দিয়ে ছেলেকে বলেন মনন, "বাবা বলো।"

অখিলেশ মুচকি-মুচকি হাসছে এখন। চেতন ছাড়া পেয়ে ঘর থেকে চলে গেছে। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে মনন বলেন, "বাবা আসবার আগে একটু ফুঁকে নিই। ধরাও।"

অখিলেশ লজ্জা পেয়ে বলে, "আপনার সামনে পারব না সার।"

"আরে সেসব অফিসে। এটা আমার বাড়ি। এখানে আমরা বন্ধু।"

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে মনন বলেন, "অখিলেশ।"

"ইয়েস সার।"

"একটা কাজ করো তো। কোনও একটা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউশনের অফিসে গিয়ে একটা ইংরেজি ছবির কোনও অভিনেতার একটা ছবি যোগাড় করো তো। খুব অপরিচিত অভিনেতা হতে হবে।"

"ইংরেজি ছবির অপরিচিত অভিনেতা ?"

"হ্যাঁ। হিন্দি ছবির কেউ নয়। বাংলারও নয়। ইন্দোনেশিয়ান বা চাইনিজ হলেও ক্ষতি নেই। মোট কথা, অ্যাকশন ছবির একটা একার ফোটোগ্রাফ, যেখানে বন্দুক টন্দুক বাগিয়ে কেউ কিছু একটা করছে।"

মননের প্ল্যানটা এখনও অখিলেশ যেন বুঝে উঠতে পারছে না। বিস্ময় এবং কৌতূহল মেশানো একটা হাসি ফুটেছে ওর মুখে। হাতের মাঝখানে

সিগারেটটাকে আড়াল করে একটা আড়ষ্ট টান মেরে বলে অখিলেশ, "সেটা জোগাড় হয়ে যাবে সার। তারপর ?"

"এবার সেটা নিয়ে তুমি চেতনের ওই ছ'জন বন্ধুকে দেখাবে। বলবে চেতনের ডায়েরির পাতার ভেতর থেকে এই ছবিটা পাওয়া গিয়েছে। এই লোকটিকেই কি সেদিন ওরা দেখেছিল ? ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই মিন ?"

সিগারেটের ধোঁয়াটা অখিলেশের গলায় প্রায় আটকে যাওয়ার উপক্রম হল। খুব হাসি পাচ্ছে অখিলেশের, কিন্তু পারছে না।

॥ ৬ ॥

এগারো দিন বন্ধ থাকার পর আজই স্কুল খুলল। তবে চেতনের মন খারাপ হওয়ার মতো তিন-তিনটে ঘটনা ঘটে গেছে।

চেতনের বাবার পরিকল্পনামতো একটা ইংরেজি ছবির এক অচেনা অভিনেতার ছবি দেখিয়ে চেতনের ছ'জন বন্ধুকে বলা হয়েছিল যে, চেতনের ডায়েরির ভেতর থেকেই এই ছবিটি পাওয়া গিয়েছে। দুঃখের বিষয় জানলার বাইরে সেই বন্দুকধারী আততায়ী হিসেবে চেতনের ছ'জন বন্ধুই অভিনেতার ছবিটিকেই চিহ্নিত করেছে আর এটাও জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে পুরো ঘটনাটাই ছিল একটা মস্ত বড় দুষ্টুমি। পুলিশ ওদের দিয়ে এ-কথাটাও স্বীকার করিয়ে নিয়েছে যে, শুরুতে ওরা মজা করবার জন্যই ক্লাসের বাইরে বন্দুক হাতে একটা লোকের মিথ্যে গল্প বানিয়েছিল, কিন্তু পরে ঘটনাটা এত বড় হয়ে ওঠায় এবং স্কুল থেকে শাস্তি পাওয়ার ভয়ে সত্যিটা বলতে ওরা ভয় পেয়েছে। মোট কথা বিনা কারণে স্কুলটা এতদিন বন্ধ থেকেছে।

স্কুলের ফাদাররা অবশ্য কোনও ছাত্রকেই এই ঘটনায় কোনও শাস্তি দেননি। নিছক ছেলেমানুষি হিসেবেই ঘটনাটা মেনে নিয়েছেন সবাই, এমনকী নির্দোষ ছাত্রের অভিভাবকরাও। কিন্তু শুভব্রতকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছেন ওর মা-বাবা। এটা চেতনের এক নম্বর মনখারাপের কারণ।

চেতনের দু'নম্বর মনখারাপের কারণ ওর তৈরি ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন গেম ক্লাব স্কুল থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। চেতনের ক্লাসরুমের জানলা আর দেওয়ালের মাঝখানে বারো ইঞ্চি চওড়া সরু পথটা ইটের গাঁথনি তুলে দু'দিক থেকেই আটকে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত আর কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চান না স্কুলের সুরক্ষাকর্মীরা। ওই সরু পথেই জানলার পেছনে উঁকি মেরেছিল যে মুখটা, চেতনকে ফোন করে সাহায্য চেয়েছে যে মুখটা, ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচতে মশারি টাঙিয়ে শুতে বলে যে মুখটা সেই রহস্যে ঘেরা মুখটাকে জানলার পেছনে আর কখনও দেখতে পাবে না চেতন। ওর মন খারাপ হওয়ার তিন নম্বর কারণ এটাই।

গরমের ছুটি পড়তে আর মাসখানেক বাকি। স্কুলটা এগারো দিন বন্ধ

থাকায় সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে চেতনেরই। সায়েন্স এগজিবিশন আর নাটকের দায়িত্বটা তারই কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছেন ফাদার। এগজিবিশনের ব্যবস্থাটা না হয় হয়ে যাবে কিন্তু এই এক মাস সময়ের মধ্যে নাটক বাছা, অভিনেতা নির্বাচন, রিহার্সালের দিন ঠিক করা সব মিলিয়ে পাহাড় প্রমাণ কাজ। মনে মনে ঠিক করে ফেলল চেতন আজ থেকেই শুরু করতে হবে।

চেতন লক্ষ করল ইংরেজি গদ্য-পদ্যের মাস্টারমশাই ইন্দ্রাশিস সার আজ ক্লাসের শুরু থেকেই বেশ খোশমেজাজে আছেন। এখন একটা বিশেষ অনুমতি চাইলে হয়তো উনি আপত্তি করবেন না। সুযোগ বুঝে বলেই ফেলল চেতন, "একটা অন্য কাজ করব সার ?"

"কী কাজ ?"

"স্কুলের এগজিবিশন আর ড্রামার ব্যাপারে একটা নোটিস লিখতে হবে। লিখে আপনাকে দিয়ে একবার চেক করিয়ে নেব।"

"লিখে ফ্যালো। নাটক কিছু ঠিক করেছ ?"

"পাগলা দাশুর কাণ্ডগুলো নিয়ে করলে কেমন হবে সার ?"

"খুব ভাল হবে। স্কুলের নাটক করা নিয়ে দাশুর কী যেন একটা ঘটনা আছে না ?"

ক্লাসসুদ্ধু ছেলেরা প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল, "দাশুর খ্যাপামি—দাশুর খ্যাপামি—"

"রাইট।" ওঁর ছাত্রদের সুকুমার রায় পড়া আছে জেনে মনে মনে খুব খুশিই হলেন ইন্দ্রাশিস সার। বললেন, "এই গল্পটাই শেষে রেখো। রীতিমত নাটক দিয়ে নাটক শেষ হলে জমবেও খুব।"

ইন্দ্রাশিস সারের পরামর্শে খুশি আর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল ছাত্রদের ভেতরে। কিন্তু একটা জিনিস চোখে পড়তেই চেতনের মন খুব খারাপ হয়ে গেল আবার। এত আনন্দের মধ্যেও ওর পাঁচ বন্ধু মনমরা হয়ে বসে আছে। আর শুভব্রত তো স্কুল ছেড়ে চলেই গিয়েছে।

ইন্দ্রাশিস সার ডাকতেই ভাবনাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল চেতন।

"বি সেকশনের সুকান্ত পোদ্দারকে দিয়ে ট্রাই করাতে পারো পাগলা দাশুর রোলটা। ভাল মানাবে ওকে। বেশ খ্যাপা-খ্যাপা দেখতেও ওটাকে ! হাড়গিলে চেহারাটাও আছে !"

সুকান্ত পোদ্দারকে যে মানাবে এ-বিষয়ে কারও কোনও অমত নেই। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে সুকান্তটা যে সত্যিই খ্যাপা ! এই তো ক্লাস থ্রি থেকে ফোরে ওঠার ফাইনাল পরীক্ষার শেষ দিনে যা কাণ্ডটা বাধিয়েছিল ও ! সেই নিয়ে তো এখনও সকলে হাসাহাসি করে। প্রথম হাফে ছিল ড্রয়িং পরীক্ষা, পরের হাফে ইতিহাস, পরীক্ষার আগের রাতে নাকি ওর শরীর খারাপ করেছিল তাই ড্রয়িং পরীক্ষা দিতে এল না। ইতিহাস পরীক্ষার সময়ে ক্লাসে এসে উপস্থিত। ওর বাবা এসে বললেন, সকালের দিকে শরীরটা বড়ই খারাপ লাগছিল তাই আসতে পারেনি, তা এখন তো শরীরটা ঠিকই লাগছে তাই ইতিহাস পরীক্ষাটা দিতে চায়। ফাদারের দিক থেকে কোনও আপত্তি না আসায় ও ইতিহাস পরীক্ষায় বসল। সবক'টা প্রশ্নের উত্তর বেশ ভালভাবেই দিল। শুধু শেষ পৃষ্ঠায় একটা পেঁপে এঁকে লিখে দিল, "শ্রীচরণেষু ইতিহাস সার, এই খাতা থেকে শুধু শেষ পৃষ্ঠাটা ছিঁড়ে শ্রীচরণেষু ড্রয়িং সারকে দিয়ে দেবেন। ইতিহাসটা আপনার, পেঁপেটা ওঁর।"

তাই সুকান্তকে নাটকে নেওয়ার মধ্যে ঝুঁকিটাই বেশি। শেষে কোনও গোল বাধলে চেতনের ওপরেই দোষটা চাপবে। সাতপাঁচ ভেবে চেতন বলল, "সার, সুকান্তটা যা খ্যাপা, অভিনয়ের দিন যদি সব কিছু পণ্ড করে দেয় ?"

ইন্দ্রাশিস সার কী একটা ভেবে নিয়ে বললেন, "তা অবশ্য পারে। ওর ওপর কোনও বিশ্বাস নেই।"

অভিনেতা নির্বাচন নিয়ে আবার নতুন ভাবনার শুরু হল। সবাই একই সঙ্গে মতামত দিতে থাকায় ক্লাসরুমটা একেবারে রথের মেলা হয়ে গেল। ইন্দ্রাশিস সার টেবিলে ডাস্টার ঠুকে বললেন, "সফট্‌লি সফট্‌লি।"

কিছু বলবে বলে সুদীপ উঠে দাঁড়িয়েছে। সুদীপের জ্যাঠামশাই চৌরঙ্গি পাড়া থেকে ভোটে দাঁড়িয়ে জিতেছেন। তাই সুদীপের মধ্যে সবসময় একটা মাতব্বর-মাতব্বর ভাব, ক্লাসের কেউই পছন্দ করে না ওকে। ও উঠে দাঁড়ানোয় সকলের মধ্যেই একটা বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। এমনকী ইন্দ্রাশিস সারও মুখ তেতো করে বললেন, "বলো কী বলবে ?"

সুদীপ যখন হাসে ওর দাঁতের লাল ছোপগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাড়িতে পান খাওয়ার অভ্যেস আছে ওর। আর হাসেও যখন ওর মুখটা কেমন বড়দের মতো হয়ে যায়। খুব কুচুটে দেখায়। ওর লালচে লালচে চুলগুলো হাতের আঙুল দিয়ে মাথার পেছনে টেনে বলে, "সার, আমাদের সেকশনে সব শাহরুখ আমির থাকতে অন্য সেকশন থেকে হিরো এনে কী হবে ?"

সুদীপ হিন্দি ছবির পোকা। ভাষাটাও রপ্ত করেছে ওই কায়দায়। বেশ বিরক্ত হয়েই ইন্দ্রাশিস সার বলেন, "মানে ?"

সারের কথায় কোনও জবাব না দিয়ে বেছে বেছে সেই পাঁচজনের দিকেই হাত নাড়তে নাড়তে বলল, "যা অ্যাকটিং দেখালে তোমরা এই অ্যাদ্দিন ধরে, সকলে গুরু মেনে নেবে !"

এর পর যা ঘটে গেল, একটা প্রলয় বললেও যেন ঠিক বলা হবে না। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সোহম ওর নিজের জায়গা থেকে। ঝড়ের বেগে ছুটে গিয়ে সুদীপেরই স্কুল ব্যাগটা তুলে নিয়ে একেবারে সপাটে ঠুকে দিল সুদীপের মুখের ওপরে। টাল সামলাতে না পেরে পেছনের দেওয়ালে ছিটকে পড়ল সুদীপ।

ততক্ষণে ইন্দ্রাশিস সার এসে সোহমকে পেছন থেকে জাপটে ধরেছেন। টানতে টানতে ওকে পেছনে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, "এই কী করছিস কী তুই সোহম ? বিহেভ ইয়োরসেল্‌ফ ?"

সোহমের গায়ে যেন এখন পশুর শক্তি ভর করেছে। ইন্দ্রাশিস সারেরও ওকে আটকে রাখতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। হঠাৎই চিৎকার করে কেঁদে ওঠে সোহম। ভেঙে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে গলাটা। দম ফেলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ওর। এলোমেলোভাবে বলে ওঠে, "আমরা প্রমিস করেছি আর কখনও মিথ্যে কথা বলব না। প্রিটেন্ড করব না। মিথ্যে বলেছি বলে আমার বাবা আর আমার সঙ্গে কথা বলেন না, মা ছোট বোনকে পাশে নিয়ে ঘুমোন, আমার একা ঘুমোতে ভয় করে..। তুই আমার সঙ্গে এইরকম করিস না সুদীপ...তা হলে স্কুলে আর কেউ আমার সঙ্গে কথা বলবে না, আমি এই স্কুলে পড়তে চাই...আমি তোদের ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না...প্লিজ ডোন্ট ডু ইট সুদীপ—" আর কোনও কথা বেরোয় না সোহমের মুখ দিয়ে। শুধু কয়েকটি অস্পষ্ট কষ্টের এলোমেলো দম ফেলে ঝরঝর করে কাঁদতে থাকে সোহম।

দেওয়ালের কোণে সুদীপ উঠে দাঁড়াল। ধীরে-ধীরে সোহমের দিকে এগিয়ে এল। সুদীপের চোখমুখ ওর আর পাঁচটা বন্ধুর মতো নয়, ও যে কী করতে পারে আর পারে না ওকে দেখে ঠাওর করা মুশকিল।

ইন্দ্রাশিস সার কিছু একটা আশঙ্কা করেই যেন বললেন, "নাউ নো মোর—নো মোর—"

হঠাৎ সুদীপ সোহমকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে দিল। তাতে সোহমের কান্না আরও বেড়ে গেল।

ক্লাসসুদ্ধু সবাই এখন কাঁদছে। ভেজা চোখে চেতন লক্ষ করল, ইন্দ্রাশিস সার জানলার ধারে এসে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে রুমাল বার

করে বাইরের দিকে তাকিয়ে চশমাটা পরিষ্কার করতে লাগলেন। সারের রুমালটা ওঁর চোখ ছুঁয়ে আবার নীচে নেমে এল।

॥ ৭ ॥

বড় বাড়ি ছোট বাড়ি মিলিয়ে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা এক হাজার দুশো বাষট্টি। স্কুলেরই ছোটখাটো অনুষ্ঠানের জন্য বড় স্কুলের দোতলার কোণে যে থিয়েটার হলটা আছে তাতে চারশোর বেশি লোক আঁটে না। তাই স্কুলের এই বার্ষিক অনুষ্ঠানটা প্রতি বছরই তিনদিন ধরে চলে এবং তিনদিনই একই নাটক অভিনীত হয়। নাটক অবশ্য দুটো হয়। একটা বড়দাদারা করে, আর একটা ছোটরা। প্রতিটি ছাত্রের মা-বাবা এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পান। তাই মা-বাবারা আসন ভরিয়ে ফেললে ছাত্ররা অনেক সময়েই মেঝেতে বসে পড়ে। এত ভাল হয় নাটকগুলো যে, হলে জায়গা পেতে আগেভাগেই দখলদারি শুরু হয়ে যায়।

অভিনেতা এবং কলাকুশলীদের জন্য প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করবার পেছনের পথটা খুলে দেওয়া হয়। পেছনের দরজা দিয়ে স্নানঘরে ঢোকার পথটা খুব মজার। একতলায় জমি থেকে লোহার বাঁকানো সিঁড়ি সোজা উঠে গিয়েছে দোতলার ছাদে। ছাদ পেরোলেই মেকআপ রুমের দরজা। সেখান থেকেই ছ'টা ধাপ উঠলেই মঞ্চ। স্কুলের কোনও অনুষ্ঠান ছাড়া বছরের বাকি সময়টা এই প্রবেশপথটা বন্ধই থাকে। এমনকী ঘোরানো সিঁড়িতে ওঠাও বারণ।

প্রথম দিনে কিছু ভুলচুক হলেও গতকাল খুবই ভাল হয়েছে নাটক। খুদে পরিচালক হিসেবে চেতন সকলের কাছ থেকেই খুব প্রশংসা পেয়েছে। অবশ্য ইন্দ্রাশিস সার পেছনে না থাকলে এতটা কখনওই হত না। আর অতিরিক্ত সিনেমা দেখার কারণেই হোক বা ওর বাড়তি স্মার্টনেসের জন্যেই— দাশুর ভূমিকায় সুদীপের নাম তো সবার মুখে মুখে। সবকিছু শেষ হয়ে যাবে বলে চেতনের মনটা মেকআপ রুমে এসে ঢোকার পর থেকেই খারাপ হয়ে রয়েছে। আজ রবিবার বলে বাবা আসবেন মাকে নিয়ে দেখতে। আর দাদু তো দু'দিন দেখেছেন,আজও তিনিই চেতনকে পৌঁছে দিয়ে এখন স্কুল গ্রাউন্ডে বসে কাগজ পড়ছেন।

যদিও কার্ডে লেখা আছে ছ'টা কিন্তু শুরু হতে হতে প্রতিদিনই সাড়ে ছ'টা বেজে যাচ্ছে। মে মাসের শেষাশেষি সূর্যটা ডুবতে একটু বেশি সময়ই নিচ্ছে, কাজেই হলঘরের বড় বড় ছিদ্রগুলো দিয়ে বাইরের খটখটে আলোটা ঢুকে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে বলে বাইরে অন্ধকার না হওয়া অবধি অপেক্ষা করতেই হচ্ছে।

ওই সেকেন্ড বেল হয়ে গেল। আর মিনিটদশেকের মধ্যেই অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাবে, প্রথমে ফাদার ন্যাফালের বক্তৃতা, তারপরই চেতনদের নাটক। সবটাই চেতনকে একা সামলাতে হয়েছে বলে ইচ্ছে করেই কোনও বড় পার্ট নেয়নি সে। 'দাশুর খ্যাপামি'তে হরি মাস্টারের ছোট্ট পার্টটায় অভিনয় করে চেতন। তবে পার্টটা ছোট হলে কী হয় মেকআপ করতে তার বেশ সময় লাগে। স্কুলের ক্র্যাফ্ট টিচার রবার্ট সারই সবাইকে মেকআপ করিয়ে দেন। চেতনকেও একটা টাক এবং ঝুপো গোঁফ এঁটে দেন তিনি। চেতন এতদিন জানত থিয়েটারের জন্য শুধু পরচুলোই ভাড়া পাওয়া যায় কিন্তু এমন চমৎকার কাপড়ের তৈরি টাকও পাওয়া যায় এটা চেতন কল্পনাই করতে পারেনি। চেতন টিচারকে বলল, "সার, আপনি অন্যদের তৈরি করুন, আমার তো একদম শেষে ঢোকা, আমি একবার স্টেজটা চেক করে আসছি।"

দাশুর ভূমিকায় সুদীপের ঠোঁটে রং ছোঁয়াতে-ছোঁয়াতে রবার্ট সার বলেন, "নিজেই চলে আসবি এখানে, একবার শুরু হয়ে গেলে কিন্তু অন্ধকারে আমি খুঁজে আনতে পারব না।"

চেতন মঞ্চে এসে দেখতে পেল লাইট, রিকিউজিশন, প্রপারটি মানে অভিনয়ের সময়ে প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়বস্তু সব একার হাতেই সামলে নিচ্ছেন ইন্দ্রাশিস সার। একটু বাদেই অভিনয় শুরু হবে তাই চেতন এগিয়ে গিয়ে ইন্দ্রাশিস সারের পা দুটো একটিবার ছুঁয়ে নিল। মাথায় হাত রেখে সার বললেন, "গুড লাক।"

মাঝখান থেকে লাল মখমলের পরদাটা একটু সরিয়ে নিয়ে চোখ রাখল চেতন। ওর মনে হল আজকের ভিড়টাই সবচেয়ে বেশি। হঠাৎ প্রথম সারিতে চোখ পড়ায় দেখতে পেল, বাবা ফাদার ন্যাফেলের সঙ্গে বসে গল্প জুড়েছেন, মা, দাদুকে থার্মোফ্লাস্ক থেকে বোধ হয় কালো চা ঢেলে দিচ্ছেন, ইচ্ছে করছিল একটিবার ওঁদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে আসতে কিন্তু এখন সে উপায় নেই।

ফাইনাল বেল পড়তে শুরু করেছে। এর আগের দু'দিনও চেতনের একই রকম একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। থার্ড-বেলটা পড়তে শুরু করলেই নাড়ির তলাটা কীরকম সুড়সুড় করে ওঠে, তারপর মেরুদণ্ড বেয়ে সেই চোরাস্রোতটা মাথার পেছন অবধি বেয়ে ওঠে। খুব উঁচু থেকে নাগরদোলাটা যখন মাটি ছোঁয়ার জন্য তরতর করে নেমে আসে, এই একই রকম গুলিয়ে ওঠাটা টের পায় চেতন।

এখন মঞ্চের ওপর আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। মখমলের পরদার ওপাশে প্রেক্ষাগৃহের আলোগুলো ধীরে ধীরে কমে আসছে। প্রথম দৃশ্যের অভিনেতারাও মঞ্চে প্রস্তুত। নাটকের শুরুর বাজনাটা বাজতে শুরু করেছে। অন্ধকারে বসেই জোর তালি দিচ্ছে ছাত্ররা। এমনটা আগের দু'দিন হয়েছে। পরদা ওঠার আগেই একদফা চিয়ার আপ করে দেয় ওরা। বাবা-মায়ের সঙ্গে ও একবার নাটক দেখতে গিয়েছিল রবীন্দ্র সদনে। বড়রা নাটক শুরুর আগে কিন্তু তালি বাজান না।

নাটকের প্রথম দৃশ্যটা খুব ভালই উতরেছে। দ্বিতীয় দৃশ্য শুরু হয়ে গেছে তবু প্রথম দৃশ্যের রেশই এখনও কাটছে না ছাত্রদের মধ্যে। উইং এর পাশে দাঁড়িয়ে চেতন ভাবল এইবার নিজের মেকআপটা সেরে ফেলা দরকার। মেক আপ রুমের দিকে পা বাড়ানোর পথেই বিপত্তিটা ঘটল। ঝুপ করে সব আলো নিভে গেল। আগের দু'দিন বেশ নির্বিঘ্নেই কেটেছে,শেষদিনেই কিনা লোডশেডিং! কখন আলো আসে কে জানে! স্কুলের হলটায় ছাই জেনারেটারও নেই। এখন একটা টর্চ বা কিছু না হলে তো এগনোও যাবে না এক পাও!

ওদিকে হলের ভেতরে তখন তুলকালাম কাণ্ড ঘটছে। চেতনের মনে হল অন্ধকার ঘরে একা থাকলে ঠিক যতটা ভয় করে, অনেকে একসঙ্গে থাকলে ঠিক ততটাই মজা লাগে বোধ হয়, ঘুটঘুটে অন্ধকারে কানফাটা চিৎকার তো করছেই তার ওপর শিস দেওয়ার পাল্লা চলছে। হঠাৎ চেতনের মনে হল রবার্ট সার ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, চেতন আন্দাজেই হাতটা বাড়িয়ে সারকে ছুঁয়ে বলল, "রবার্ট সার?"

চাপা গলায় উত্তর এল, "হুঁ।"

তারপরই যন্ত্রণার একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বেরিয়ে এল চেতনের গলা থেকে। চেতন বুঝতে পারল একটা সূচ গেঁথে গেল ওর হাতে। আর একটা শক্ত থাবা এসে চেপে ধরল ওর মুখটা। ওর মনে হল ওকে কেউ কোলে তুলে নিল।

ওর ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ও যেন পাতালে নেমে যাচ্ছে। একবার জোর করে চোখ মেলে দেখার চেষ্টা করল চেতন। আকাশে অসংখ্য তারা একসময়ে ঝাপসা হতে হতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

(এর পরে ৪৬ পাতায়)

অরণ্যদেব লি ফক

মাথা কামানো ! তোমার শয়তানির শেষ নেই মেডুসা ।
সাপ নেই... চুলও নেই... ভাঁওতাবাজি...
সাপের দেশের রানি মেডুসা, ন্যাড়া-মাথা
পরচুলা পরে শয়তানি করতে, আর বোকা বানাতে নিরীহ মানুষগুলোকে । তাই তো ?
তোমরা সবাই শুনে রাখো, তোমাদের রানি মেডুসা নয়, সে স্রেফ এক নিষ্ঠুর নারী ।
তোমাকে ঘৃণা করি, ঘৃণা করি, ঘৃণা...
যাদের ওপর এতদিন অত্যাচার করেছ তারাও ঘৃণা করে তোমাকে ।
এমন ভ্যাবলা হয়ে তাকিয়ে আছ কেন ? বুঝছ না, সবটাই ছিল ভাঁওতা !
3-31
আমরা রানির উপদেষ্টা । শুধু আমরাই যুগ-যুগ ধরে জানতাম এর গোপন রহস্য ।
যাতে রানি অবাধে রাজত্ব চালাতে পারে ?
না হলে জংলি লোকদের বশে রাখা যেত না ।

অরণ্যদেব লি ফক

এই খেলা কতদিন চালিয়েছ ?
উ উ (কান্না) বোলো না, দোহাই...
মেয়েদের বয়স বলা খুব মুশকিল । সর্পদেবী হলেও । হয়তো ৭০ ।
এ এল কোথা থেকে ?
কোথা থেকে আবার ? এখানকারই মেয়ে ও ।
আচ্ছা ! এখানকারই কাউকে মেডুসা তৈরি করো তোমরা ! তার মৃত্যুর পর কী করো ?
তখন আর একজনকে সাজাই...
উ উ (কান্না)
লোজ্জা, উড়ন্ত সাপ— এসব ভয়ানক সরীসৃপ তোমরা জোগাড় করো কোথা থেকে ?
ওরাও মেডুসার মতো আমাদেরই সৃষ্টি করা ।
জলাজঙ্গলে ভরা এ-দেশে এমনিতেই সাপের রাজত্ব...
কৃত্রিম উপায়ে বিজ্ঞানীরা নতুন কিছু...
"... তৈরি করেছে । যার দু-একটা দেখেছেনও আপনি ।
4-7
চেষ্টা হয়েছে আধা-মানুষ আধা-সাপের এক নতুন প্রজাতি সৃষ্টির । খুব সাঙ্ঘাতিক ।
উঃ । এ তো অসম্ভব !
ক্রমশ

(উপন্যাস : সাদা মিথ্যে ■ ৪৩ পাতার পর)

॥ ৮॥

চেতনের অন্তর্ধানের খবরটা শহরের সব কাগজেই আজ বেশ ফলাও করে ছেপেছে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে যে, স্কুলের অনুষ্ঠান চলার সময় ফিউজ উড়িয়ে দিয়ে ইচ্ছে করেই অন্ধকার নামানো হয়েছিল এবং আলো ফিরে আসার পর চেতনকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই সহজ অঙ্কের হিসেবমতো পুলিশ মহলও নিশ্চিত যে, চেতনকে অপহরণ করা হয়েছে। যদিও কারও দিকেই এখনও পর্যন্ত কোনও সন্দেহের তীর ছোড়া হয়নি, কিন্তু খবরের কাগজগুলো এরই মধ্যে 'সেনসেশনাল নিউজ' ছাপতে শুরু করে দিয়েছে।

ভেজানো দরজাটা খুব সাবধানে একটু খুলে উঁকি মেরে দেখে নিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন জেলাশাসক মানস চট্টোপাধ্যায়। সুমনা এখনও ঘুমোচ্ছেন, ইনজেকশনের ওষুধের মেয়াদ এখনও ফুরোয়নি। ডাক্তার ত্রিবেদীকে ডেকে ঠিক সময়ে ইনজেকশনটা পুশ না করালে এতক্ষণে বোধ হয় পাগলই হয়ে যেত বউমা। এখন যতক্ষণ ঘুমোয় ততক্ষণই মঙ্গল।

চেতনের ঘরের অ্যালার্ম-পিসটা হঠাৎ বেজে উঠল। সুমনার ঘুমজড়ানো গলায় অবচেতনের একটা সাড়া জাগতেই তাড়াতাড়ি চেতনের ঘরে এসে অ্যালার্মটা বন্ধ করে দিলেন তিনি। হঠাৎ করেই বৃদ্ধের চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল। ঘড়িতে এখন ছ'টা বাজতে পাঁচ। রোজ এই সময়ে ঘুম থেকে উঠেই একটা প্রার্থনা বলতে থাকেন দাদুভাই, "আওয়ার ফাদার, হু আর্ট ইন হেভেন, হ্যালোড বি দাই নেম..." হঠাৎ বৃদ্ধের মনে হল, হু ইজ দ্য ফাদার ? তিনি কি আদৌ হেভেনে আছেন ! ভগবানে বিশ্বাস তাঁর কোনওদিনই ছিল না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে জেলাশাসকের পোশাকটা পরতে গিয়ে উপনয়নের পৈতেটা বাহুল্য মনে হওয়ায় সেটাও ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন ! আজ নাতিকে হারিয়ে ভগবানে বিশ্বাসটা শেষবারের মতো চুকেবুকে গেল। নিজেরই হাতে নিজেরই এক ফোঁটা চোখের জল টপ করে ঝরে পড়ল। আর সঙ্গে-সঙ্গে সতর্ক হলেন জেলাশাসক। আবেগের স্রোতে এখন বুদ্ধিকে ভাসিয়ে দিলে চলবে না। পৃথিবী উলটে গেলেও চুনকে খুঁজে বার করতেই হবে। এখনও করছে কী তাঁর ছেলেটা লালবাজারে বসে ? সেই যে কাল সন্ধেবেলা গিয়েছে, রাত গড়িয়ে সকাল হল এখনও বাড়িতে একটা খবর দিল না পর্যন্ত ! একবারও ভাবছে না যে, বাড়িতে তিন-তিনটে আপনার লোক রয়েছে ! তাদেরও কিছু জানবার অধিকার আছে ! হঠাৎ মনে হল, ব্রিজভূষণকে শেষ রাতের পর আর ধারেকাছে দেখা যায়নি তো !

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ চিৎকারে বৃদ্ধের সমস্ত শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল। মনে হল শব্দটা যেন বসবার ঘর থেকেই এল !

কখন যে সুমনার ঘুম ভেঙেছে টেরও পাননি তিনি। ঘরে পা দিয়েই দেখলেন, ঘরের মেঝেতে আজকের দৈনিকগুলো এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে আর একটি খবরের কাগজে চোখ রেখে ভাষাহীন কোনও পশুর মতো ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠছে সুমনা। শক্ত হাতে সুমনার শরীরটাকে দু-চার বার ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন, "কী হয়েছে বউমা, অমন করছ কেন ?"

"এটা পড়ুন বাবা, এটা পড়ুন ! ওরা কী লিখেছে ? আমার চুনকে ওরা মেরে ফেলবে ?" কাঁদতে-কাঁদতে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন সুমনা।

ইংরেজি-বাংলা মিলিয়ে প্রায় সবক'টা কাগজই আসে বাড়িতে। তারই কোনও একটায় খবরটা বেরিয়েছে, "পুলিশেরই এক মহলের ধারণা মনন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোনও পুরনো শত্রুতার পরিণতিতেই মনন চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান চেতনকে কোনও মাফিয়া-চক্র অপহরণ করেছে। অপহরণকারীরা যেহেতু এখনও কোনওরকম মুক্তিপণ দাবি করেনি তাই পুলিশের একাংশ মনে করছেন, দুষ্কৃতীরা কোনও বিনিময়ে আগ্রহী নয়। শুধুমাত্র প্রতিশোধ-স্পৃহা থেকেই ওরা চেতনকে অপহরণ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মনন চট্টোপাধ্যায় পুনেতে চাকরিরত অবস্থায় দুবাইয়ে শিশু পাচারকারী মাফিয়া চক্রের নেতা এক চাঁই সহ তার আটজন শাগরেদকে নিজের জীবন বিপন্ন করে গ্রেফতার করেছিলেন। চাঁইয়ের সঙ্গীরা এই অপহরণের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে বলে পুলিশের অনুমান। ছোট্ট চেতনের জীবন বাঁচানোই এখন পুলিশের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে কাগজটা পাশে সরিয়ে রাখেন অবসরপ্রাপ্ত জেলাশাসক মানস চট্টোপাধ্যায়। কর্মসূত্রের অভিজ্ঞতায় এই সব সাংবাদিককে হাড়ে-হাড়ে চেনেন তিনি। বেশ বিরক্ত হয়েই বললেন, "শোনো বউমা, আমি তোমাকে বলছি এইসব খবরের কোনও ভিত্তি নেই। তদন্তের স্বার্থেই পুলিশ তাদের সন্দেহভাজনদের নাম কখনওই বাইরে বলবে না। এই একই কাজে আমিও অনেক বছর কাটিয়েছি বউমা। আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো।"

আশায় বুক বেঁধে নিজের ঘরে যেতে যেতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়েন সুমনা।

শ্বশুরমশাই বলেন, "কিছু বলবে বউমা ?"

"আপনার ছেলে তো এখনও ফিরল না !"

"আমিই তো রয়েছি। তোমার কোনও ভয় নেই মা। যাও, একটু ঘুমনোর চেষ্টা করো।"

সুমনা ঘর থেকে চলে গেছেন। মাটিতে পড়ে থাকা কাগজগুলোর দিকে তাকাতেই আবার একটা অস্থিরতা এসে ঘিরে ধরল তাঁকে। মনটাকে শান্ত করবার জন্যই মাটি থেকে কাগজগুলো তুলে একটি-একটি করে সযত্নে ভাঁজ করে ঘরের মাঝখানের টেবিলের ওপর রেখে দিলেন। একটু আগে কী একটা যেন ভাবছিলেন, কিন্তু এখন কিছুতেই মনে করতে পারছেন না। মনোবল, সাহস, রাত জাগার ক্ষমতা কোনওটাই তেমন হারায়নি, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছেন বার্ধক্য তাঁর যৌবনের স্মৃতিশক্তিটা কেড়ে নিচ্ছে একটু-একটু করে। না, এইবার মনে পড়েছে। এই ঘরে আসবার আগে তিনি ব্রিজভূষণের কথা ভাবছিলেন।

একটু চা খাওয়াও দরকার। একাত্তর বছর ধরে শরীরের ভেতরে পুষে রাখা যন্ত্রপাতিগুলো এখন সামান্য ধকলেই বিকল হয়ে পড়ে। নিজের শরীরটাকে একরকম টেনে নিয়েই ব্রিজভূষণের ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ান তিনি। ব্রিজভূষণের ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ কি না বোঝা যাচ্ছে না। চাপা স্বরে ডাকেন, "ব্রিজ, ব্রিজভূষণ !"

কোনও উত্তর আসে না। বাঁ হাতে দরজাটায় ঠেলা দিতেই একটা বিরক্তির আওয়াজ তুলে দরজাটা খুলে যায়। একটা মাদুর পাতা রয়েছে ঘরের মেঝেতে। আর ব্রিজভূষণ পরিষ্কার পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে মাদুরের ওপরেই ঘুমিয়ে আছে। এইসব মানুষের এই একটা মস্ত সুবিধে। বিপন্ন বোধ করলেই চোখ বুজে প্রার্থনা করতে-করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। অথবা ব্রিজভূষণই হয়তো তার তুলনায় বেশি বাস্তববাদী ! পুলিশ, মন্ত্রী, আমলার দোরে দোরে মাথা কোটার চাইতে হয়তো এই পথই সহজতর !

বসার ঘরে ফোন বাজছে। কোনও কারণেই সুমনাকে ফোনটা ধরতে দেওয়া ঠিক হবে না। প্রায় ছুটে এসেই ফোনটা তুলে নিয়ে বললেন, "হ্যালো ?"

"এটা কি চেতনের বাড়ি ?"

"হ্যাঁ, বলুন, আমি ওর দাদু বলছি।"

"আমি শুভর বাবা।"

"কোন শুভ ?"

"ওই যে শুভব্রত, মানে স্কুলের আনফরচুনেট ইনসিডেন্টটায় যাকে আমি ছাড়িয়ে নিতে বাধ্য হলাম।"

"ও হ্যাঁ, বলুন।"

"আজ সকালে চেতনের নিউজটা কাগজে পড়লাম। একেবারে তাজ্জব বনে গেছি। কোনও খবর পাওয়া গেছে ?"

"এখনও নয়।"

"ইস, পুলিশ যদি আর একটু কেয়ারফুল হত ! আমার ছেলের কথাগুলো তো ওরা বিশ্বাসই করল না !"

"আপনি কী মনে করছেন নিজের ছেলেকে কিডন্যাপ করাতেই চেতনের বাবা আপনার ছেলের কথা বিশ্বাস করেনি ?"

"না, তা নয়।"

"তবে ?"

"আসলে নিউজটা পড়বার পর থেকেই এত খারাপ লাগছে।"

"আপনার সমবেদনার জন্য অনেক ধন্যবাদ।"

প্রায় আছাড় মেরেই ফোনটা নামিয়ে রাখেন তিনি। পাউচ থেকে টোবাকো বার করে হাতে ফেলে ডান হাতের বুড়ো আঙুলে পিষতে-পিষতে আপন মনেই বলে ওঠেন, "মানুষ ! এদেরও মানুষ বলে !"

মননের ঘরের ডিরেক্ট নাম্বারটা টেলিফোনের ডায়েরি থেকে খুঁজে বার

(এর পরে ৫০ পাতায়)

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
আমার ওপরওলাদের নির্দেশ পালন করতেই এসেছি আমি...
হুকুমের চাকর । হ্যাঁ সেটাই শুধু পারো তুমি ।
কর্তৃপক্ষ আপনাদের কথা মানবেন না । কারণ গুয়াতেমালার লোকেরাই চান মেক্সিকোর মতো এখানেও অবিলম্বে চালু হোক জলবিদ্যুৎকেন্দ্র ।
জেদি মতলববাজ এঞ্জিনিয়ার ব্ল্যাঙ্কোস চায় কালই উসুমাসিন্টা নদীবাঁধের লক গেট খুলে দিতে । আর টারজান চায় আগে ছ'জনের হত্যারহস্যের সমাধান...
ফালতু কেন ঝামেলা পাকাচ্ছ টারজান । জায়গাটা ছেড়ে না গেলে কাল ডুবে মরবে তোমরা ।
আগে জানতে চাই কে মারল ছ'জনকে । দোষী হলে তুমিও রেহাই পাবে না ব্ল্যাঙ্কোস ।
আবার সতর্ক করে দিচ্ছি তোমাদের ।
ব্ল্যাঙ্কোস লোকটা সুবিধের নয় । তবে খুন ও করেছে বলে মনে হয় না ।
এরিক ও টারজান, আমার সঙ্গে এসো । একটা দারুণ জিনিস দেখাব ।
স্পেনীয়দের সঙ্গে মায়া-অধিবাসীদের সঙ্ঘর্ষের সময় এদের ধর্মীয় লোকাচারে বিরক্ত হয়ে স্পেনীয়রা সব ধ্বংস করে দিতে উঠেছিল...
লোকাচার বলতে নরবলি বোঝাচ্ছ ?
টারজান, একটু সময় দেবে ?
হ্যাঁ । যেভাবে এই ছ'জন মরেছে ।
আর উপায় নেই । বাঁধের জল ছেড়ে বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু করে দিলে আমরা সবাই ভেসে যাব ।
8/22
3236

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
এরিক ভন হারবেনকে প্রত্ন-সমীক্ষায় সময় দিতে টারজান মরিয়া হয়ে ছুটল বাঁধ প্রকল্পের উদ্বোধন রুখতে। রোখার একমাত্র উপায় নাশকতা। কিন্তু কে আর একজন সে কাজ করে রেখেছে...
ব্ল্যাঙ্কোস দ্যাখো! এ তো মিগুয়েল! ওকে মেরে ফেলে রেখেছে যাতে আমাদের চোখে পড়ে।
এ তো খুন। ভন হারবেনের শিবিরের কাছেও এভাবেই পড়েছিল আর একজন!
হয় ড্রাগ-স্মাগলার, নয় টারজান মেরেছে একে।
এভাবে মেরে ওদের লাভ কী?
মূল কম্পিউটারকে অকেজো করতে পাওয়ার জেনারেটরের তার কেটে দিচ্ছে টারজান...
অস্ত্র নাও। গোটা এলাকায় তল্লাশি চালাব।
3237
8-29
ব্ল্যাঙ্কোস, কেউ ঢুকেছে ভেতরে।

(উপন্যাস : সাদা মিথ্যে ■ ৪৭ পাতার পর)

করলেন। ডায়াল করতে গিয়ে আঙুলগুলো কাঁপছে।

বেশ কয়েকবার রিং হওয়ার পর ওপাশে কেউ ফোনটা তুলল।

"পুলিশ কন্ট্রোল.."

"আমি মননের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

"সম্ভব নয় এখন।"

ছোট্ট জবাব দিয়ে ফোনটা ছেড়ে দিলেন কোনও কর্তব্যরত অফিসার। মুহূর্তের মধ্যে যেন খুন চড়ে গেল অবসরপ্রাপ্ত জেলাশাসক মানস চট্টোপাধ্যায়ের মাথায়। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর এত রাগ এর আগে কখনও হয়নি। মনে মনে ভাবলেন, ওঁর অবাধ্য শিথিল স্নায়ুগুলোকে ওঁর ইচ্ছের চাবুক চালিয়ে যৌবনের কর্মদক্ষতায় ফেরাতে এখনকার এই রাগটার খুব প্রয়োজন ছিল। আবার ডায়াল করতে-করতে রিটায়ার্ড ডি এম স্পষ্ট অনুভব করলেন ওঁর আঙুলের মাথায় শক্তি বেড়েছে। মাত্র একবার বাজতেই ওপাশে ফোনটা তুললেন ওই একই অফিসার। ওঁকে কোনও কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই রীতিমত ধমকে উঠলেন একদা ডি. এম মানস চট্টোপাধ্যায়, "আপনার সাহস তো কম নয়! আমার সব কথাটা না শুনেই আপনি ফোনটা রেখে দিলেন? হু আর ইউ। কী নাম আপনার?"

বিপদ অনুমান করেই ওপাশের গলাটা মিহি হয়ে এল। শোনা গেল, "আপনি কে বলছেন সার?"

"মননকে দিন আপনি। বলুন আমি ওর বাবা কথা বলছি।"

উত্তেজনার মধ্যে খেয়ালই করেননি তিনি, মনন কখন তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বাবার উদ্দেশে বলেন, "ছেড়ে দাও ফোনটা।"

ছেলেকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ফোনটা নামিয়ে রাখেন মানস চট্টোপাধ্যায়। বলেন, "কী রে, খবর পেলি কিছু?"

বিষণ্ণ হয়ে মাথা নাড়তে-নাড়তে শরীর ছেড়ে দিয়ে সামনের সোফায় বসে পড়েন মানস।

আশঙ্কা, বিরক্তি আর হতাশা স্পষ্ট হয়ে উঠল বৃদ্ধের কণ্ঠে, "তোদের ডিপার্টমেন্টটা একেবারে অপদার্থ! বারোটা ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, এখনও একটা খবরও জোগাড় করতে পারল না!"

"চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখছে না কেউ। সব থানাকেই রেড অ্যালার্ট জানানো হয়েছে।"

"কলকাতাতেই যে রয়েছে কে বলবে? বারো ঘণ্টায় শহর পেরিয়ে চলে যাওয়া যায়।"

"রাস্তার চেকপোস্ট, রেলওয়েজ, এয়ারপোর্ট সব জায়গাতেই লোক রয়েছে। আমার ছেলেকে নিয়ে যাবে এমন ক্ষমতা কারও নেই।"

শেষ কথাগুলো বলার সময় বৃদ্ধ লক্ষ করলেন মনন যেন সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। একসময়ে প্রশাসনের কাজে নিযুক্ত একজন অবসরপ্রাপ্ত কেউকেটা স্পষ্ট দেখতে পেলেন এখনকার এক কেউকেটার আত্মবিশ্বাস অর্জনের করুণ প্রক্রিয়া!

সময় বদলেছে তবু মানুষ বদলায়নি। এখন আর পাথরে পাথরে ঠুকে কেউ আগুন জ্বালে না। আগুন জ্বালাবার কত আধুনিক প্রক্রিয়া এসে গেছে বাজারে! শুধু তফাতটা এই যে, এখনও মানুষ মানুষকে আগুনেই পুড়িয়ে মারে। দিনদিন মানুষের বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, পশুবৃত্তি আরও বাড়ছে। আর এই কথাটা মনে হতেই চুনের জন্য একটা অজানা আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল দাদুর। কে ফিরিয়ে এনে দেবে তাঁর নাতিকে? যদি ঈশ্বর পারেন তবে তিনিই প্রণম্য!

সুমনাকে চুনের ঘরে খুঁজে পেলেন মনন। চেতনের ডায়েরিটা সুমনার বুকের ওপরে। সুমনা চোখ বুজে আছেন।

বাথরুমে এসে শাওয়ারের নীচে দাঁড়ান মনন। ঠাণ্ডা জলের ধারায় চুল ভিজিয়ে মুখ বেয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। তারই ভেতরে উষ্ণ অশ্রুর প্রত্যক্ষ ধারা তিনি স্পষ্ট অনুভব করছেন তাঁর চোখের কোলে।

॥ ৯ ॥

যেটুকু ওষুধ চেতনের ওপরে প্রয়োগ করা হয়েছে, হিসেবমতো ঘণ্টা পাঁচেকের মধ্যেই ওর ঘুমের ঘোর কেটে যাওয়া উচিত ছিল। বারো ঘণ্টা পেরোতে চলল, এখনও চেতনের জ্ঞান ফেরেনি। নেহাত বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন ছাড়া চেতনকে একা রেখে একটিবারের জন্যও ওর বিছানার পাশ থেকে সরেননি ডাক্তার বিবেক বন্দ্যোপাধ্যায়। স্টেথো কানে গুঁজে ঘন ঘন চেতনের হার্ট-বিট পরীক্ষা করেছেন, মশারি সরিয়ে ওর পাল্‌স মেপেছেন বারবার এবং ওর শরীরের তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নিয়েছেন একবার। চেতনের হার্ট, পাল্‌স, টেম্পারেচার সবই স্বাভাবিক এখন। যে-কোনও মুহূর্তেই হয়তো ওর ঘুম ভাঙবে, তবু যতক্ষণ না জাগছে, ডাক্তারের উদ্বেগটা কিছুতেই কমছে না।

সিগারেটটা ধরাতে গিয়েও ধরালেন না বিবেক। বন্ধ ঘরে ধোঁয়াটা ক্ষতি করবে ছেলেটার। শোয়ার ঘর থেকে বসার ঘরে উঠে এলেন ডাক্তার। পাশের ঘরে চেতনের ওপরে নজর রেখে বসার ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালেন। লক্ষ করলেন ধোঁয়াটা বেরোবার কোনও পথই নেই। অন্তত একটা জানলা খুলতেই হবে। কিন্তু জানলাটা খুলতে গিয়ে যদি কোনও প্রতিবেশীর নজরে পড়ে যান? গত রাতে তিনি বাড়িতে ফিরেছেন, সে-কথা জানান দিয়েই বা লাভ কী? হঠাৎ করে কোনও মরণাপন্ন রুগিকে নিয়ে এসে কেউ উৎপাত করতে পারে! যদিও এই চার মাসে তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতির ফর্দটা প্রতিবেশীদের অজানা নয় এবং সেবার ধর্মে তিনি যে সব আগ্রহই খুইয়ে বসেছেন, সেই খবরটাও এঁরা বিলক্ষণ জানেন, তবু হাজার হলেও ডাক্তার বলে কথা! মানুষের প্রয়োজনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মানুষ! সাত-পাঁচ ভেবে সিগারেটটা না ধরানোই শ্রেয় মনে হল।

শহরতলিতে এ. কে. রোডের ওপরে ডাক্তারের এই বাড়িটা এই চার মাসেই যমপুরীর চেহারা নিয়েছে। মেঝের দিকে তাকিয়ে এই কথাটাই মনে হল বিবেকের। জমাট বাঁধা ধুলোর ওপরে ওঁর নিজের জুতোর ছাপগুলোই স্পষ্ট হয়ে ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। লক্ষ করলেন ওঁর হাওয়াই চপ্পলের দাগগুলো শোয়ার ঘর থেকে বাথরুমের পথে যাতায়াতের চিহ্ন এঁকে রেখেছে। মনে পড়ে গেল ওঁর ম্যালেরিয়া হওয়ার পর বাধ্য হয়েই এই বাড়িটাতে দিনদশেক রাত্রিবাস করতে হয়েছিল। এই বিশাল বাড়িটাতে তাঁর একার অস্তিত্ব ছাড়া আর কোথাও প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই?

"রবার্ট সার, রবার্ট সার", স্বপ্নের মধ্যে কাউকে ডাকলে যেমনটা শোনায় চেতনের ডাকটাও এই মুহূর্তে ঠিক তেমনটি শোনাল। প্রায় ছুটে গিয়ে চেতনের খাটের মশারিটা খুলে দিলেন বিবেক। চেতনের চোখ এখনও বন্ধই আছে কিন্তু হলুদচাঁপার পাপড়ির মতো ওর চোখের নরম আস্তরণের নীচে চোখের গুলি দুটো এপাশ-ওপাশ নড়ছে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল বিবেকের বুক থেকে।

গতকাল রাত থেকেই এই ঘরটা সেবা স্বাচ্ছন্দ্যের যাবতীয় প্রয়োজনীয়তায় ভরে উঠেছে। সাদা পাত্রে রাখা টলমলে ঠাণ্ডা জলে, নরম-নরম তোয়ালেটা ভিজিয়ে নিয়ে বারকয়েক চেতনের মুখটায় বুলিয়ে দিতেই সে ধীরে-ধীরে চোখ মেলে তাকাল।

চেতনের মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়ে খুব স্নেহভরে প্রশ্ন করলেন বিবেক, "আর ইউ অলরাইট?"

ঘরের সবক'টা জানলাই বন্ধ। পেলমেটে ঝোলানো ভারী পরদাগুলো দিনের আলোর প্রবেশপথ আড়াল করে রেখেছে। রাতভর জ্বলে থাকা বেডলাইটের হলদে মায়াবী আলোয় বিবেকের ঝুঁকে পড়া মুখটা চোখে

পড়তেই ভয়ে শিউরে উঠল চেতন। দু' হাত দিয়ে নিজের মুখ আড়াল করে নিল। আলতো ছোঁয়ায় চেতনের হাত সরিয়ে ওর মুখের আড়ালটা সরাবার চেষ্টা করল বিবেক। চেতন ওর বাঁ হাতটা দিয়ে কোনওরকমে ওর গায়ের চাদরটা টেনে নিয়ে নিজের ছোট্ট শরীরটাকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলল। চাদরের ভেতরেই কাঁপতে-কাঁপতে বলে উঠল, "আমি মায়ের কাছে যাব।" বিবেক লক্ষ করলেন চাদরের আড়ালে চেতনের ছোট্ট শরীরটা ফাঁদে পড়া পাখির মতো অশান্ত ঝটপটানিতে আকাশের পথ খুঁজছে!

ঘরের বাতিটা জ্বেলে দিলেন বিবেক। চাদরের আড়ালেই অনুভব করল চেতন, ঘরের আলো বেড়েছে। মুখের ঢাকাটা ধীরে ধীরে চোখের তলায় নামিয়ে আনল চেতন। এবার স্পষ্ট আলোয় ভিতু ভিতু চোখে বিবেককে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল। বিবেকও চেতনের বিছানা থেকে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়েই চেতনের দিকে তাকিয়ে রইলেন শান্ত চোখে।

গল্প-উপন্যাসে এইরকম অ্যাডভেঞ্চারের কথা অনেক পড়েছে সে। যারা কিডন্যাপ করে এবং যেখানে লুকিয়ে রাখে, বিবেক এবং এই ঘরটাকে দেখে গল্পের সঙ্গে এই দুয়েরই কোনও মিলই খুঁজে পাচ্ছে না চেতন! কিন্তু কী একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় চেতন আবার ভয় পেল। বাবা বলেছিলেন, সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে গেলে ক্রিমিনালদের আর আলাদা করে চেনা যায় না। কিছু একটা বলবার চেষ্টায় চেতনের ঠোঁট দুটি একবার নড়ে উঠল। লক্ষ করল, লোকটা ধীরে-ধীরে ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। বিছানার পাশেই একটা গোল টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। স্টেথো, একটা সরু টর্চ, দুটো ওষুধের শিশি, তবলার হাতুড়ির চেয়েও ছোট একটা হাতুড়ি, কাচের গেলাসে জলে ডোবানো একটা থার্মোমিটার, এক নজরেই টেবিলের ওপরে চোখ বুলিয়ে নিল চেতন। না, ভয় পাওয়ার মতো কোনও কিছুই চোখে পড়ল না ওর। টেবিল থেকে একটা মিনারেল ওয়াটারের বোতল তুলে ওর দিকে এগিয়ে লোকটা বলল, "নাও। গলাটা একটু ভিজিয়ে নাও।"

"না। তুমি ওতে ওষুধ মিশিয়ে রেখেছ।"

বোতল থেকে বেশ খানিকটা নিজের গলায় ঢেলে তারপর আবার বোতলটা ওর দিকে এগিয়ে দিল লোকটা।

এক চুমুকে সবটুকু জল নিঃশেষ করে চেতন বলল, "তুমি কে?"

"ডাক্তারকাকু।"

"ডাক্তার কি ক্রিমিনাল হয়?"

প্রশ্নটা শুনেই প্রথমে চমকে তাকালেন বিবেক। ছোট্ট ছেলেটার এই সঙ্গত প্রশ্নের কী জবাব হতে পারে, ভেবে পেলেন না। খুব কম সময়ের মধ্যেই ডাক্তারিতে পসার জমিয়েছিলেন বিবেক। কিন্তু টাকা বানাবার জন্য কোনওদিন কোনও ভুল পথ বেছে নেননি। শহরতলিতে একটা ছোট্ট চেম্বার খুলে বসেছিলেন মাত্র আট বছর আগে। দরিদ্র আর দুষ্কৃতীতে ভরা গোটা অঞ্চলটাই। চিকিৎসায় ফল পেয়ে ওই অঞ্চলের মানুষজনই ওঁর পসার বাড়িয়েছে। খ্যাতি অর্জন করে ওঁর দক্ষিণাও কখনওই বাড়াননি। রুগির সংখ্যাই বেড়েছে অঙ্কের সব নিয়মকে হার মানিয়ে। আর সেই থেকেই রেমাউন্ট রোডের ওপরে এই বাড়ি, গাড়ি, সমৃদ্ধি। কিন্তু বিবেক কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবেননি মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে ওঁর জীবনটা এমন অর্থহীন হয়ে উঠবে। এমনকী, একটা ছোট্ট শিশুর কাছে ওঁর পরিচয়টা হয়ে উঠেছে শুধুই একটা ক্রিমিনাল!

চেতন লক্ষ করল লোকটা ওর নিজের বাঁ হাতের আঙুলগুলো চোখের ওপরে চেপে ধরে মাথা নিচু করে বসে আছে। এবার প্রায় ধমকে উঠল চেতন।

"কী হল? আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না যে!"

"তুমি যদি চাও আমি এক্ষুনি তোমাকে তোমার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব।"

লোকটির উত্তরে ভারী অবাক হল চেতন। বিছানা থেকে নেমে এবার লোকটির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে বলল, "মিছে কথা।"

"মিথ্যে বলি না আমি। আমি জানি তোমার মায়ের জন্য মন কেমন করছে। পাশের ঘরে ফোন আছে। ইচ্ছে করলে কথা বলতে পারো।"

চেতনের মনে পড়ছে ও পি সি সরকারের ম্যাজিক দেখে একবার এমনটাই অবাক হয়েছিল ঠিক এখন যেমনটি হচ্ছে।

বিবেক দেখলেন, চেতন অবাক বিস্ময়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে আছে। নিজেই উঠে পড়ে চেতনকে বললেন, "এসো, আমার সঙ্গে।"

বসবার ঘরে ফোন। ডায়াল করতে করতেই চেতন বলল, "যদি বলে কোথা থেকে ফোন করছিস? ওরা তো আমাকে এসে নিয়ে যেতে চাইবে।"

"এইট বাই ওয়ান এ কে রোড। বলবে ডাঃ বিবেক ব্যানার্জির বাড়ি।"

"বাবা এসে তোমাকে কিন্তু ধরে নিয়ে যাবে!"

"যাক না। আমি তো একটা ক্রিমিনাল।"

ডায়াল করতে করতে থমকে যায় চেতন। ওর মনে হল লোকটার গলা কাঁপছে। চোখের কোণে জল। হাতে রিসিভারটা ধরে চুপ করে তাকিয়ে আছে লোকটির দিকে।

বিবেক বলেন, "চেতন, তোমার থেকে একটা সাহায্য চাইব বলেই তোমাকে নিয়ে এসেছি।"

এবার ছোট্ট চেতনের কপালে বড়দের মতো ভাঁজ পড়ল। বলল, "তুমি সেই লোক যে একদিন রাতে আমাকে ফোন করেছিলে? তোমারই ম্যালেরিয়া হয়েছিল?"

"হ্যাঁ।"

"আমার কাছ থেকে কী সাহায্য চাও তুমি?"

"তার আগে বলি তোমার যদি মনখারাপ হয় আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে পৌঁছে দেব। ছেলেকে না পেলে একটা মা মরেও যেতে পারেন। আমি জানি।"

"না, আমার মা কক্ষনো মরবে না।"

"তোমার মা মরবেন না কিন্তু রাহুলের মা মরে গিয়েছিলেন।"

"রাহুল কে?"

"আমার ছেলে। ঠিক তোমার মতো। চার মাস আগে কয়েকটা গুণ্ডা ওকে কিডন্যাপ করে নিয়ে চলে গেল। আমার কাছে দু' লাখ টাকা ডিমান্ড করেছিল। আমি দিতে রাজি ছিলাম। কিন্তু ওরা টাকা নিতেও এল না আমার ছেলেটাকেও ফেরত দিল না।"

"আমার বাবাকে জানিয়েছিলে?"

"কারও পায়েই মাথা কুটতে বাকি রাখিনি। কিন্তু আমি জানি আমার ছেলেটাকে খুঁজে বার করতে ওরা ভাল করে চেষ্টাও করেনি কখনও।"

চেতন লক্ষ করে ডাক্তারকাকু নিজের বুকে হাত বুলোতে বুলোতে ঘরময় পায়চারি করছেন। ঘরের বাঁ দিকের কোণে টেলিভিশন সেটের ওপরে রাখা একটা ফ্রেমে-বাঁধানো ছবি তুলে ধরলেন বুকে। তারপর ছবির ধুলোটা নিজের বুকে ঘষতে-ঘষতে চেতনের সামনে এগিয়ে এসে বললেন, "এই দ্যাখো এটা রাহুল, এই ওর মা। ছবিটা 'লে'-তে গিয়ে তুলেছিলাম গত বছর। লে'তে গিয়েছ কখনও বেড়াতে? আমি তোমাকে নিয়ে যাব। খুব সুন্দর জায়গা।" কথাগুলো কোনওমতে শেষ করে ছবিটা বুকে চেপে শূন্যে তাকিয়ে থাকেন।

চেতন ওর বয়েসী আর পাঁচটা ছেলের মতো খুব সহজে কাঁদে না। কিন্তু ওর বন্ধু সোহম যেদিন সুদীপকে ব্যাগ ছুড়ে মেরেছিল আর চিৎকার

(এর পরে ৫৪ পাতায়)

টিনটিনের অমর স্রষ্টা হার্জের ম্যানিটোবা জাহাজের রহস্য

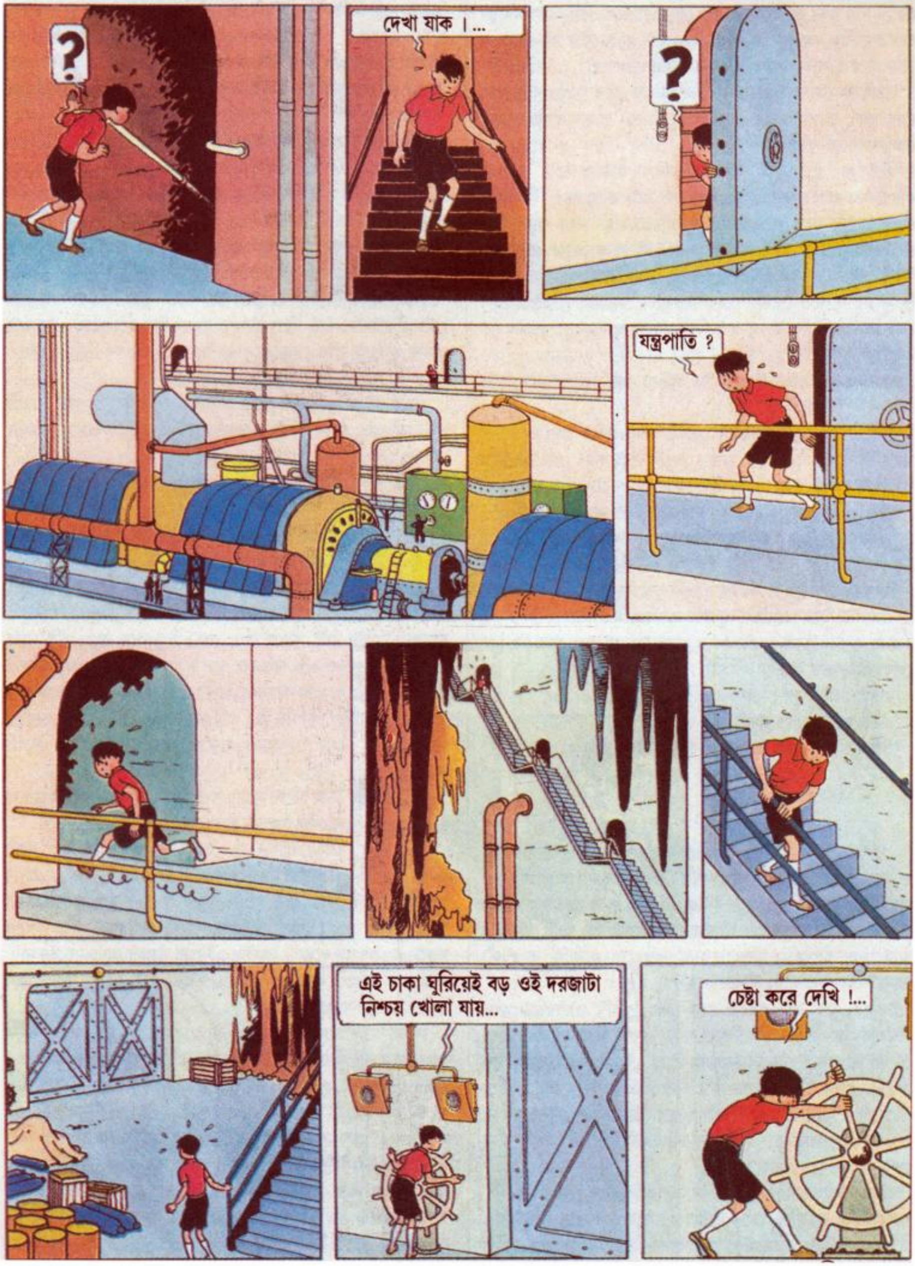
?
দেখা যাক ।...
?
যন্ত্রপাতি ?
এই চাকা ঘুরিয়েই বড় ওই দরজাটা
নিশ্চয় খোলা যায়...
চেষ্টা করে দেখি !...

(উপন্যাস : সাদা মিথ্যে ■ ৫১ পাতার পর)

করে কেঁদে-কেঁদে বলেছিল, আমি তোদের ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না, আর সুদীপও যখন ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠেছিল সেদিন চেতনের খুব কান্না পেয়েছিল, আর এখন পাচ্ছে। কান্নাটা বুকে বেঁধে বলল চেতন, "কিন্তু আঙ্কেল, আমি আপনাকে কীভাবে হেল্প করব ?"

"তোমাকে ফেরত পাওয়ার জন্য ওরা আমার ছেলেকে খুঁজবে। আমি ওদের বলব, আগে আমার ছেলেকে খুঁজে এনে দাও তারপর তোমার ছেলেকে ফেরত পাবে।"

"আর না হলে তুমি আমাকে এখানে আটকে রেখে দেবে ? কোনওদিনও আমার মায়ের কাছে আমাকে যেতে দেবে না ?" কথাগুলো গুছিয়ে শেষ করতেও পারে না চেতন, রিসিভারে মুখ গুঁজে কান্না বাঁধার চেষ্টা করতে থাকে। হঠাৎ চেতন লক্ষ করে বিবেক আঙ্কেলের চোখ দুটো খটখটে শুকনো। এমনকী চোখ দুটোতে কোনও প্রাণের চিহ্নও নেই। ওর নিজের বাড়িতে শোয়ার ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো মুখোশের চোখ দুটোর মতো ! বিবেক এখন তারই দিকে এগিয়ে আসছেন। চেতনের বুক দ্রুত ওঠানামা করে।

প্রথম তিনটে সংখ্যা নিজে হাতে ঘুরিয়ে দেওয়ার পর প্রশ্ন করেন, "সেভেন জিরো ডাবল এইট তো ?"

নিজের বাড়ির নাম্বারটা কানে যেতেই হঠাৎ চেতন যেন হুঁশ ফিরে পায়। রিসিভারটা কানে তুলে নেয়। একটু পরেই হঠাৎ ফোনটি নামিয়ে রেখেই কেঁদে উঠে বলে, "মা ধরেছিল।"

এবার বিবেকের অবাক হওয়ার পালা। বলেন, "কেটে দিলে কেন ?"

"আমাদের ফোনের লাইন ট্যাপ করা আছে। আমি শিওর। তুমি ধরা পড়ে যেতে।"

শক্ত করে চেতনকে নিজের বুকে চেপে ধরে বিবেক। মনে হয় কতদিন পরে রাহুলটা ফিরে এসেছে। দু'জনে একসঙ্গে অনেকটা কেঁদে নেয়। চেতনের কপালে চুমো খেতে খেতে বলেন,"মায়ের সঙ্গে কথা না বলে থাকবি কেমন করে বাবা ?"

"রাস্তার কোনও বুথ থেকে কথা বলব রাতে।"

"এতটা সময় থাকতে পারবি ?"

"তুমিও তো রাহুলকে ছেড়ে আছ কতদিন !"

॥১০॥

পুলিশের ইন্টেলিজেন্স শাখার প্রধান মনন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র চেতন চট্টোপাধ্যায়ের এখনও পর্যন্ত কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, চেতন গতকাল সন্ধের পরই তার স্কুল থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। পুলিশের অনুমান, তাকে কেউ বা কোনও সম্মিলিত চক্র অপহরণ করেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী চেতনের অপহরণের দায়িত্ব স্বীকার করেনি।

চেতনকে খুঁজে বার করবার জন্য জোর পুলিশি তৎপরতায় আজ পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে শিশু পাচারকারীর একটি বিরাট চক্র পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। আজ বিধানসভায় বিরোধী পক্ষের এক নেতা পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরও পুলিশেরই বিশিষ্ট কর্মীর পুত্রের সন্ধান পুলিশ এখনও পায়নি, দেশের সাধারণ মানুষের সুরক্ষার শোচনীয় পরিস্থিতি এই একটি ঘটনা থেকেই অনুমান করে নেওয়া যায়।"

"আজ কলকাতার সিনিয়ার ডিভিশন ফুটবল লিগে..."

প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোর খাটিয়ে রিমোটে চাপ দিয়ে টিভিটা বন্ধ করে দিলেন অসহায় অবসরপ্রাপ্ত জেলাশাসক। তাঁর ছেলে তো তবু যা হোক নিজের ছেলের জন্য হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ঠাকুরদা হিসেবে তাঁর নাতির জন্য তিনি কীই-বা করতে পারছেন ? এই চব্বিশ ঘণ্টায় বারকয়েক তাঁর খিদেও পেয়েছে। খেয়েওছেন, চায়ে চিনি কম হওয়ায় বাড়তি এক চামচ চিনিও মিশিয়ে নিয়েছেন, এবং নাতির কথা ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়েও পড়েছেন। বউমাকে তো ওষুধ দিয়েও ঘুম পাড়ানো যাচ্ছে না !

লোকে বলে ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত থাকলে অবসর জীবন যাপনের মতো সুখ নাকি স্বর্গেও নেই। গতকাল সন্ধে অবধি এই শুনতে-ভাল কথাগুলোর সঙ্গে তিনিও একমত ছিলেন। কিন্তু নাতিটা হারিয়ে যাওয়ার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই অবসর যাপনের অর্থটা বদলে হয়ে গিয়েছে নিষ্ক্রিয়তা। তিনি ভাল করেই জানেন এখন তাঁর অঙ্গুলিহেলনে প্রশাসনের একটি চাকাও ঘুরবে না। এখন খাবারে বসা মাছিটা পর্যন্ত উড়িয়ে দিলেও ওড়ে না !

নিজের হাতে তৈরি সিগারেটটায় টান দিতে গিয়ে দেখলেন ওটা নিভে গেছে। ছাইদানে গুঁজে দিয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। জানলাটা সামান্য খুলতেই বৃষ্টির তোড় এসে ওঁর রুপোলি চুলগুলো ভিজিয়ে দিল। বাইরে রীতিমত দুর্যোগ চলছে এখন।

শ্বশুরমশাইকে রেনকোট গায়ে চাপাতে দেখে ওঁর মৌনতা ভাঙতে একরকম বাধ্য হলেন সুমনা। বললেন, "এই বৃষ্টিতে আবার কোথায় চললেন ?"

"ঘরে বসে থেকে কোনও লাভ আছে ? কিছু একটা তো করতে হবে।"

"যা কিছু করবার ওরা তো করছে। এই দুর্যোগে বেরিয়ে কিছু বাধিয়ে বসলে শেষে আবার আর এক কাণ্ড হবে।"

কাছাকাছিই কোথাও একটা বাজ পড়ল খুব শব্দ করে। আর সেই শব্দটাই জেলাশাসকের উত্তেজনাটাকে আরও উস্কে দিল বোধ হয়। বললেন, "কেউ কিচ্ছু করছে না। কেউ কিছু করে না। তুমি ভাবছ তোমার স্বামী পুলিশের ওপরওয়ালা বলে সকলে ওর হুকুম তামিল করতে লেগে পড়েছে ? কাজ না-করনেওয়ালাদের হাতে একটা মোক্ষম অস্ত্র আছে 'ইউনিয়ন' ! দায়িত্বপালন নয়, শুধু দাবি আদায় করবার সহজপাঠ শেখানো হয় সেখানে। এখন যে-কোনও মানুষের লড়াই তাকে একাই লড়তে হবে।"

পাঁচ ব্যাটারির টর্চটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে আর একটি কথাও না বাড়িয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েন সুমনার শ্বশুরমশাই।

সদর দরজা বরাবর ল্যান্ডিং-এর দেওয়ালের জানলার অনেক কাচই ভেঙে গিয়েছে। জানলাটা বন্ধ থাকলেও ভাঙা কাচের ফাঁকে অবাধ প্রবেশের সুযোগ পেয়ে হু হু বাতাস ঢুকে আছড়ে পড়ছে সদরের ভারী পাল্লা দুটোর ওপর। বাতাসের খেয়ালেই দরজার পাল্লা দুটো কখনও খুলছে, কখনও বন্ধ হচ্ছে। সুমনা তবু নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ছেন না। তাঁর মনের ভেতরে যে তুফান চলছে, তুলনায় এই বাইরের ঝড়টা যেন বড়ই শান্ত বলে মনে হল তাঁর।

সিঁড়ির আলোগুলো জ্বলছে না। বিদ্যুৎ চমকে উঠে মাঝে মাঝে সিঁড়ির অস্তিত্বটা জানান দিয়ে দিচ্ছে। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শুনে সুমনা সতর্ক হলেন। এক নয়, একাধিক শব্দ। এই বাড়িটার সবচেয়ে উঁচুতে তাঁরা থাকেন। তারপরেই ছাদ। সুতরাং আগন্তুক যেই হোক, তাঁদের বাড়িতেই আসছে। উটকো লোকের পক্ষে এই বাড়িতে উঠে আসা সম্ভব নয় এটা সুমনা জানেন। বাড়ির বাইরে পুলিশের লোক প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই পাহারায় থাকে। তবু বিপদ গোড়ালির ছিদ্রপথেই ঢোকে, শনির মতো। সতর্ক হলেও দরজাটা বন্ধ করতেও ইচ্ছে করল না সুমনার। গতরাত থেকে যতবারই সিঁড়িতে তিনি কোনও জুতোর শব্দ শুনেছেন ততবারই ছুটে এসেছেন

একটাই আশায়— কিন্তু চুন ফেরেনি।

বিদ্যুৎটা আরও একবার চমকে উঠতেই সুমনা স্পষ্ট দেখতে পেলেন। দুটো ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে ওঁদের দরজার দিকে। দরজার পাল্লা দুটো সম্পূর্ণ বন্ধ না করে ফাঁকের মাঝে চোখ রেখে দাঁড়ালেন সুমনা এবং মুহূর্তকাল পরেই দরজা খুলে দিয়ে পিছিয়ে এসে বললেন, "আপনারা ? আসুন, ভেতরে আসুন।"

চেতনের স্কুলের প্রধান ফাদার ন্যাফেল এবং ক্রাফ্ট টিচার রবার্ট সদর দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

অজানা আশঙ্কায় সুমনা দুলে উঠলেন। বললেন, "কী হয়েছে ফাদার ?"

খাঁটি বেলজিয়ান হলেও মানুষটা এখন পুরোদস্তুর বাঙালি হয়ে গেছেন। মিশনের হয়ে কলকাতায় পড়াতে এসেছিলেন তেইশ বছর আগে। তারপর গোটা পশ্চিমবঙ্গটা চষে বেড়িয়েছেন মিশনেরই কাজে। বাঙালির পালা-পার্বণ, শিল্প-সাহিত্য, আচার-কাসুন্দি, প্রবাদ-প্রবচন কিছুই আর অজানা নয় এই মানুষটির কাছে। একটা দেশের মানুষকে ভাল না বাসলে সেই দেশের সংস্কৃতির এমন মর্মে প্রবেশ করা যায় না এবং ছাত্রকে পুত্রজ্ঞানে প্রত্যক্ষ না করলে এই দুর্যোগ উপেক্ষা করে হাজির হওয়া যায় না। চুল পেকে গড়িয়ে আসা জল চোখের ওপর থেকে সরাতে সরাতে ফাদার বললেন, "প্রায় এক ঘন্টা আগে স্কুলে পুলিশ এসেছিল। ওঁরা জানতে চাইছিলেন চেতন নিখোঁজ হওয়ার সময় ড্রামার কস্টিউম পরে ছিল না এমনই পোশাক ?"

"কেন ফাদার ? সেটা জানতে চাইছিল কেন ?"

"জানি না আমি। সেটা জানতেই আমি রবার্টের বাড়ি গিয়েছিলাম। আমার মনে হল রবার্টই যখন সবাইকে মেকআপ করিয়েছে, ওই সবার চেয়ে ভাল জানবে। রবার্ট বলেছে চেতন যখন নিখোঁজ হল তখনও ও কস্টিউম পরেনি। মেক আপও করেনি।"

সুমনার চোখের তারা দুটো মুহূর্তের মধ্যে ভীষণ অস্থির হয়ে উঠল। উদ্বেগ আর আশঙ্কা একই সঙ্গে দানা বাঁধল সুমনার কণ্ঠে, "ওরা চুনের পোশাক নিয়ে জানতে চাইছে কেন ? তবে কি ওরা কোনও পোশাক-টোশাক খুঁজে পেয়েছে ? কোনও—"

শেষ কথাটা সুমনার দু'হাতের আড়ালে হারিয়ে যায়। মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকেন সুমনা।

বাইরের ঝড়বৃষ্টির দাপটটা আরও বেড়েছে। সুমনার অস্থিরতা একটু কমে এল।

ফাদার সুমনার উদ্দেশে বললেন, "চেতনের কিছু হবে না। আমরা সবসময় প্রভুর কাছে ওর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করছি। ও এতই পবিত্র যে, কোনও পাপী ওকে ছুঁতেই ভয় পাবে।"

ফাদারের কথায় সুমনা কী খুঁজে পেলেন ? সত্য, প্রত্যয় না সমবেদনা ? যাই পান সব মিলিয়ে যেন একটা আশ্রয় খুঁজে পেলেন বিদেশি এই সন্ন্যাসীর সামান্য কয়েকটা শব্দের ভেতরে। বললেন, "আপনারা ভেতরে এসে বসুন না, একেবারে ভিজে গিয়েছেন যে....."

"না, বসব না। আপনি বরং রবার্টের ইনফরমেশনটা আপনার স্বামীর কাছে পৌঁছে দিন। আসলে ওঁরা কোন থানা থেকে লোক পাঠিয়েছিলেন স্কুলে আমি ঠিক জানি না।"

কথার মাঝখানে কখন যে ব্রিজভূষণ এসে ঘরে ঢুকেছে, কেউ লক্ষ করেননি। ব্রিজভূষণের কাঁধে একটা শুকনো তোয়ালে আর ট্রের ওপরে দু' কাপ চা। ফাদারের কাছে এসে কাঁধটা ঝুঁকিয়ে বলল, "আপনারা শির পোছে লিন ফাদার। চায় পিকে যাইয়ে।" নীরবে ওর কর্তব্য সেরে ঘরের ভেতরে চলে গেল ব্রিজভূষণচাচা।

এমন বিপদের মুখেও যে মানুষ অতিথির সম্পর্কে এতটাই সচেতন তাঁর আতিথেয়তাকে সম্মান করতেই হয়।

বৃষ্টি বুঝি আর থামবে না। চা-পর্ব শেষ হয়ে এল। দুটো ছাতা হাতে ব্রিজভূষণচাচা ফের ঘরে ঢুকে এল। বলল, "এই দুটো লিয়ে যান ফাদার। আগলা হপ্তা যব চুনদাদাকো ইস্কুলমে ছাড়তে যাব আমি আপনার থেকে মেঙ্গে লেব।"

কথাগুলো বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল ব্রিজভূষণ। তারপর প্রার্থনার ভঙ্গিতে নিজের হাত দুটো এক করে হঠাৎই বলল, "আপনি সাধুসন্ত আদমি ফাদার, আমার চুনদাদাকে ওয়াপাস লিয়ে আসুন।" একটা শিশুর মতো কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল ব্রিজভূষণ।

রবার্ট অনেক আগে উঠেই দরজার বাইরে অপেক্ষা করছে। ফাদার ধীরে-ধীরে দরজার মুখে এসে দাঁড়ালেন। যাওয়ার মুহূর্তে খুব শান্ত ভাবে সুমনার উদ্দেশে বললেন, "গড ব্লেস ইয়োর হোম।"

ফাদারের শেষ কথাগুলোতেই এতক্ষণ ডুব দিয়ে বসে ছিলেন সুমনা। ঘরের ফোনটা বেজে উঠতেই চমকে উঠলেন। ফোনটা তুলতে ভীষণ ভয় হল ওঁর। পুলিশ কেন জানতে চাইছে চেতন কেমন পোশাক পরেছিল কাল ?

অমঙ্গলের ধ্বনিটাকে রুখতেই যেন ফোনটাকে তুলে নিলেন সুমনা, "হ্যালো ?"

"ফোনটা তুলছিল না কেন কেউ ?" ওপাশ থেকে ব্যস্ততার সঙ্গে বিরক্তি মিশিয়ে কথাগুলো বললেন মনন।

সুমনা কথা না বাড়িয়ে ওঁর আশঙ্কার কথাটা বলে ফেললেন কাঁদতে কাঁদতে, "চুনের স্কুলের ফাদার এসেছিলেন। চেতন কাল কেমন পোশাক পরেছিল সেটা জানতে,নাকি পুলিশ গিয়েছিল ওঁর স্কুলে ।"

"হ্যাঁ। ওঁরা কিছু বলেছেন ? চেতন কি কাল ওর ড্রামার কস্টিউম পরেছিল ?"

"না। বাড়ি থেকে যেটা পরে গিয়েছিল শেষ অবধি সেটাই ওর গায়ে ছিল।"

"ও মাই গড !"

বজ্রাহতের মতো শোনাল মননের কথাটা। ভীষণ ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন সুমনা, "কেন কী হয়েছে বলো না আমাকে ?"

ওপাশে মননের গলাটা শুনে মনে হল কেউ যেন দশ আঙুলে ওঁর কণ্ঠনালিটা চেপে ধরেছে।

"ও কী রঙের জামা পরে স্কুলের ফাংশনে গিয়েছিল ?"

"আঃ, আগে আমার কথাটার উত্তর দাও।"

ওঁর নিজের মায়ের মৃত্যু ছাড়া ওকে আর কখনও কাঁদতে দেখেননি সুমনা। চরমতম আঘাত না পেলেও ওঁর স্বামীর গলায় কোনও পরিবর্তন ঘটে না। টেলিফোনে মননের এই মুহূর্তের আওয়াজটা দিশেহারা করে দিল সুমনাকে। সুমনা অনুভব করলেন ওঁর নিজেরও কথা বলার শক্তি হারিয়ে যাচ্ছে।

সুমনার মুহূর্তের নীরবতা ওপাশে মননকে সদ্য ফাঁদে পড়া বাঘের মতো খেপিয়ে তুলল। ফোনের মধ্যেই গর্জে উঠলেন, "হোয়াট দ্য হেল ? আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন ?"

"ওর ইয়েলো কর্ড-এর প্যান্টটা পরে ছিল—"

"শার্টের রং জানতে চাইছি ! কাল ও কী রঙের শার্ট পরেছিল তোমার মনে নেই ?"

উত্তর দিতে পারলেন না সুমনা। এই মুহূর্তে ওঁর কিছু মনে পড়ছে না। আবার একটু সময় নিলেন মনে করবার। তারপর ডুকরে কেঁদে উঠলেন। হঠাৎ লক্ষ করলেন চাচা ওঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।উনি চাচাকেই জিজ্ঞেস

(এর পরে ৫৮ পাতায়)

ডাঃ রেক্স মর্গান
পাউলা, আজ সকালে লেনাকে দেখেছ ?
ও আজ আসবে না জুন।
ওর বদলে আজ রুগি দেখবে সারা কার্টার।
লেনার আজ কী হল বলো তো ? এখানে এল না কেন ?
জানি না জুন। আমিও সে-কথাই ভাবছি।
মাফ করবেন... আপনিই জুন গেল ?
হ্যাঁ।
ক্লিনিক
আমি টম ওয়ার্নার। লেনার স্বামী। একটু কথা আছে আপনার, ইয়ে, তোমার সঙ্গে।
ইতিমধ্যে
ঠিক আছে ডাঃ মর্গান।
ধন্যবাদ। কাল সকালে আমি দেখা করব।
আমি ওকে দেখতে চাই, তা বলেছ ?
হ্যাঁ মিঃ কেনেডি। বলেছি আমি।
2·16

ডাঃ রেক্স মর্গান
জুন যে... লেনাকে দেখতে এসেছ ?
হ্যাঁ। ও কেমন আছে লোরি ?
দিব্যি আছে। যাও তুমি। তোমাকে দেখলে নিশ্চয়ই খুশি হবে।
লেনা, চলেই এলাম। কেমন লাগছে এখন ?
বুদ্ধুর মতো। রুগি হয়ে থাকা অসহ্য আমার পক্ষে।
তুমিই ঠিক বলেছিলে। করোনারি আর্টারিতে গোলমাল ধরা পড়েছে।
ডাক্তার কী বলছে ?
এখনই অস্ত্রোপচার নয়। খুব সময়ে ধরা পড়েছে। ধন্যবাদ প্রাপ্য তোমার।
ইতিমধ্যে
তা আমার সঙ্গে কী দরকার মিঃ কেনেডি ?
বলছি। তার আগে বলো তো ওয়েল্‌স, তোমার বাড়ির খবর কেমন ?
আমার বাড়ির সঙ্গে এখানকার কাজের কী সম্পর্ক ?
আছে নিশ্চয়ই। কারণ এখানকার কাজে তোমার আসা-যাওয়ার সময় ইদানীং ঠিক থাকছে না।
2-23

(উপন্যাস : সাদা মিথ্যে ■ ৫৫ পাতার পর)

করলেন, "ব্রিজভূষণচাচা,কাল চেতন কী রঙের শার্ট পরেছিল ?"

ব্রিজভূষণ বিন্দুমাত্র সময় না নিয়ে সঠিকটাই বলল, "সফেদ আউর নীলা-চেক।

সুমনা ফোনে জানালেন, "ব্রিজভূষণচাচা বলছে সাদা আর নীল চেক। এ.সি. মার্কেট থেকে তুমি যেটা এনে দিয়েছিলে—" কথাগুলো একদমে বলে দুঃসংবাদটার জন্য অপেক্ষা করে রইলেন সুমনা। কয়েকটা নীরব মুহূর্ত কেটে গেল, কোনও উত্তর এল না। সুমনা ভয় পেলেন,ওঁর স্বামী বোধ হয় রূঢ় বাস্তবকে আড়াল করতেই ফোন থেকে সরে গিয়েছেন। এই মুহূর্তে মননকে হাতের কাছে পেলে হয়তো ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন করতে পারতেন কী এমন অঘটন ঘটেছে যেটা সুমনাকে বলা যাচ্ছে না ? আতঙ্ক আর উত্তেজনায় ঘর কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠলেন ফোনে, "হ্যালো...।"

রিসিভারটা আরও শক্ত হাতে কানে ঠেসে ধরলেন সুমনা। বুকফাটা কান্না জোর করে বুকে চেপে রাখলে বুকের ভেতরে যে আগ্নেয়গিরির শব্দ ওঠে ঠিক সেইরকম একটা শব্দ বেরোচ্ছে মননের গলা থেকে। কোনওরকমে শরীরে টাল সামলে বলে উঠলেন, "শুনছ ? কিছু বলছ না কেন ? কী হয়েছে চুনের ?"

"হয়েছে মানে—"ওপাশে আবার চুপ করে গেলেন মনন।

বিদ্যুতের আলোটা ঘরে ঢুকে পড়ে আরও ধাঁধিয়ে দিল সুমনাকে।

এক্ষুনি বাজ পড়বে। অন্য কানে আঙুল চেপে ভয়ঙ্কর কিছু শোনার অপেক্ষায় বুক বেঁধে তৈরি করে নিলেন নিজেকে।

মায়ের মন বুঝেই সত্যিটাকে আশঙ্কা বলেই চালানোর চেষ্টা করলেন মনন।

"ঘন্টাদেড়েক আগে খবর এসেছে, নিউ ব্রিজের ওপরে একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের তাড়া খেয়ে একটা প্রাইভেট গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মেরেছে ব্রিজের ওপর একটা লোহার পিলারে। চালকটি সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। গাড়িতে একটা বছরদশেকের ছেলেও ছিল। গাড়ি থেকে ছিটকে ব্রিজের রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে ছেলেটি জলে ডুবে গিয়েছে। কোনও কারণে ছেলেটির শার্টের একচিলতে কাপড় ছিঁড়ে গেঁথে আছে ব্রিজের রেলিঙের ধারালো ফলায়। কাপড়ের টুকরোটাও নীল সাদা চেক।"

সুমনা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গিয়েছেন, রিসিভারটাও কান থেকে বেশ দূরে সরে এসেছে। ওপাশে মননের শেষ নির্দেশটা কোনওক্রমে শুনতে পেলেন সুমনা, "আমি ওখানে যাচ্ছি। বাবাকেও পাঠিয়ে দাও এক্ষুনি। কোনও খবর না দেওয়া অবধি তুমি বাড়ি থেকে বেরোবে না...."

ব্রিজভূষণ দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ করল, রিসিভারটা সুমনার হাত থেকে খসে পড়ল।

॥ ১১ ॥

বৃষ্টিতে আটকা পড়ে সন্ধের পর থেকেই ছটফট করছে চেতন। বিবেক বেশ বুঝতে পারছেন এইবার ওর মায়ের জন্য মন কাঁদছে। পুলিশের হাতে ধরা পড়বার সবরকম ঝুঁকি স্বীকার করেও এরই মধ্যে বারপাঁচেক ওকে ওর বাড়ির মুখে পৌঁছে দিয়ে আসবার প্রস্তাবও দিয়েছেন বিবেক। কিন্তু একবারের জন্যও রাজি হয়নি ছেলেটা। এমনকী হাতের কাছে ফোন থাকতেও পুলিশের নজরে পড়বার সম্ভাবনা থেকে বিবেককে বাঁচাতে লোকাল বুথ থেকেই ফোন করবার জেদ ধরে বসে আছে ! কিন্তু মুশকিল হল বৃষ্টিটা যে কিছুতেই থামছে না !

বসবার ঘরে একটিমাত্র আলো জ্বেলে বসে আছে দু'জন। বন্ধ জানলার ভারী পরদাগুলো টেনে দেওয়া হয়েছে। এয়ার কন্ডিশনারটা গতকাল রাত থেকেই একনাগাড়ে চলছে। মনে হয় প্রতিবেশীরা কেউ কিছু টের পায়নি। সকলের চোখ এড়াতেই গতকাল বেশ রাতের দিকেই চেতনকে এই বাড়িতে এনে তুলেছিলেন বিবেক। চেতনকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে তুলে আনার পর গাড়ির পেছনের সিটে শুইয়ে দিয়েছিলেন চাদর ঢাকা দিয়ে। তারপর গ্লোব সিনেমার উলটোদিকে ব্যস্ত পার্কিং স্পটে গাড়ির কাচ তুলে দিয়ে প্রচুর খাবারদাবার কিনেছেন। আরও খানিটা সময় কাটাতে দ্বিতীয় হুগলি সেতু পেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন হাওড়ায়। এ. কে রোডের বাড়িতে যখন এসে পৌঁছেছেন, তখন এ-তল্লাটের বাড়ি ঘরদোরের প্রায় সব আলোই নিভে গিয়েছিল। গ্যারাজ খুলে গাড়ি ঢুকিয়ে গ্যারাজের ভেতরের দরজা দিয়েই সোজা উঠে এসেছিলেন ওপরে চেতনকে কোলে নিয়ে। এই এত ঘন্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরও যখন কেউ বিরক্ত করেনি, তখন ধরে নেওয়া যায় কেউ খেয়ালই করেনি ঘটনাটা।

কিন্তু এই মুহূর্তে বিবেকের মনে হল এতটা সাবধানতা অবলম্বনের কোনও প্রয়োজনই ছিল না। যাকে তিনি অপহরণ করে এনেছেন সেই কিনা অপহরণকারীর লড়াইয়ে শামিল হয়ে বসে আছে। নিজের মা-বাবাকে ছেড়ে এইটুকু একটা ছেলে নিজের ইচ্ছেয় বন্দিদশা মেনে নিয়েছে ! কেন ? না, তারই মতো একটা ছোট্ট ছেলেকে তার বাবার বুকে ফিরিয়ে দিতে ! অথচ চেতনকে এভাবে আটকে রেখে বিবেক যে রাহুলকে ফিরে পাবেই এমন নিশ্চয়তা তো নেই ! যদিও বিবেক বিশ্বাস করেন যে, রাহুলকে দুর্বৃত্তরা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। ওঁর এই বিশ্বাসের যথেষ্ট যুক্তিও আছে। কেননা দুষ্কৃতীদের দাবিমতো যেদিন যেখানে টাকা নিয়ে ওঁকে যেতে বলা হয়েছিল, পুলিশকে কোনওরকম খবর না দিয়েই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। শহরতলির কাটা পুকুরের নির্দিষ্ট স্থানে ছেলের বদলে এক টুকরো কাগজ মিলেছিল শুধু। অসংখ্য ভুলে ভরা যে চিঠিটা তিনি পেয়েছিলেন, তাতেই তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, এই অঞ্চলেই দুষ্কৃতীরা একজন পুলিশ কর্মীকে খুন করায় এখন জোর ধরপাকড় চলছে। তাই রাহুল ওদের কাছে সুরক্ষিত থাকবে। ঝামেলা চুকলে লেনদেন হবে। ঝামেলা এখনও মেটেনি তাই রাহুলকেও ফিরে পাননি বিবেক। দুষ্কৃতীরা এখনও গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। বিবেক এটা জানেন যে, অপহরণকারীরা এই অঞ্চলেই দুষ্কৃতী। বিবেকের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করবার জন্যই ওরা রাহুলকে অপহরণ করেছে।

রাহুলের মায়েরই আকুলতায় শেষপর্যন্ত ছেলের অপহরণের খবরটা পুলিশকে জানিয়েছিলেন বিবেক। কিন্তু প্রতিদিন পুলিশের দুয়ারে দুয়ারে সকাল, সন্ধে, দুপুর, রাত্রি সময়-অসময়ে হাজিরা দিয়েও 'নো ট্রেস' শব্দ দুটো ছাড়া বিবেক আর কিছুই পাননি। শেষের দিকে ওরা বিরক্ত হত। বিবেক বুঝে গিয়েছিলেন যে, রাহুলকে খুঁজে বার করবার ব্যাপারে পুলিশের কোনও আগ্রহই নেই।

নিজে ডাক্তার হওয়ার সুবাদে হাজাররকম রোগব্যাধির চিকিৎসা করেছেন বিবেক। কিন্তু শোক-তাপ নিবারণের কোনও চিকিৎসাবিদ্যা তাঁর জানা ছিল না। ছেলের দুঃখে একটু-একটু করে মরে যেতে দেখলেন নিজের স্ত্রীকে, চোখের সামনে !

বঞ্চনা থেকেও মানুষের মনে অপরাধপ্রবণতার শেকড় গজায়। প্রতিশোধের স্পৃহাও জাগে। তখন নিজেরটুকু বুঝে নেওয়ার জন্য অমানবিক হতেও মানুষের বাধে না। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধের তাড়না থেকেই এতদিন ধরে যে ছক কষেছেন তিনি মনে-মনে, একটি শিশুর অপহরণের বিনিময়ে যে নিজের শিশুর উদ্ধারের উপায় অন্বেষণ করেছেন, গতকাল সন্ধে অবধি, এই সব কিছুরই একটিমাত্র ব্যাখ্যা ছিল তাঁর কাছে—বঞ্চিত মানুষের উচিত কর্তব্য ! কিন্তু আজ এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, ছোট্ট ছেলেটার হৃদয়ের বিশালতার মধ্যে পৃথিবীর হাজারও বঞ্চনার ঠাঁই হয়ে যাবে !

এই মুহূর্তে বিবেকের মনে হল চেতন যেন মানুষকে ক্ষমা করবার দরবার জানাতে এসেছে তাঁর বুকে আর অন্যদিকে রাহুল যেন তাঁর বুকের শান্তি, যার অন্বেষণে সমস্ত জীবনটা তিনি কাটিয়ে দিতে পারেন ! ঠিক করলেন, ক্ষমা বুকে নিয়েই শান্তি খুঁজে বেড়াবেন। রাহুলকে ফিরে পেতে হলে চেতনকে সঙ্গে চাই-ই।

নিজের ভাবনার মধ্যেই এতক্ষণ ডুব দিয়ে বসে ছিলেন বিবেক, হঠাৎ চেতনের দিকে চোখ পড়তেই লক্ষ করলেন সোফার ওপরে পা তুলে দু' হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে আছে ছেলেটা। দিঘির জল যেমন দমকা হাওয়ার অপেক্ষায় থাকে, তেমনই বিবেকের হাতের ছোঁয়া লাগতেই চেতনের পিঠটা বারকয়েক কেঁপে উঠল। বিবেকও ততটাই অস্থির হয়ে বললেন, "চলো, আমি তোমাকে তোমার বাড়ির সামনে ছেড়ে দিয়ে আসি। এই বৃষ্টিতে কেউ লক্ষ করবে না। তোমার ভয় নেই, আমি ধরা পড়ব না।"

"রাহুলকে কিন্তু তুমি তা হলে আর খুঁজে পাবে না। এখন আমার যেমন কান্না পাচ্ছে, রাহুলেরও পাচ্ছে।"

"তুমিও তো রাহুলেরই মতো। তুমি এত কষ্ট পাচ্ছ, আমারও তো কান্না পাচ্ছে !"

"তুমি শুধু একবার আমাকে মায়ের সঙ্গে কথা বলিয়ে দাও। মা যদি জানতে পারে আমি ভাল আছি তা হলে মা আর কাঁদবে না।"

"কিন্তু তোমার মা তো বলবেন এক্ষুনি দিয়ে যেতে। তখন ?"

"আমি প্রমিস করছি যাব না। যতদিন তুমি আমাকে আটকে রাখতে চাও রাখো। আমি বাবাকে বলব রাহুলকে খুঁজে বার করে দিলে তবেই আমি ছাড়া পাব।"

"রাহুলকে খুঁজে পেতে যদি অনেক দেরি হয়, ততদিন তুমি পারবে আমার কাছে থাকতে ? তোমার মা বাবা দাদুকে ছেড়ে ?"

"কেন পারব না ? তুমি তো আর মারবে না আমাকে ?"

চেতনের নিষ্পাপ মুখটা নিজের বুকে টেনে নিলেন বিবেক। লক্ষ করলেন চেতনের একমাথা নরম ঘন কালো চুল। ওর চুলগুলোতে মাথা গুঁজে নিজের চোখের জলটা মুছে নিয়ে খুব আরাম পেলেন বিবেক।

সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে বিবেক বললেন, "চলো, তোমাকে তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিই।"

"কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যে যাবে কেমন করে ?"

"এর পর গ্যারাজে জল ঢুকে পড়লে গাড়িটাই আর বার করতে পারব না। তা ছাড়া এই বৃষ্টিতে এখন আমাদের কেউ লক্ষও করবে না।"

রাস্তায় বেরিয়ে বৃষ্টির তোড়টা আরও বেশি করে বোঝা যাচ্ছে। গাড়ির ওয়াইপারটাও ঠিক কাজ করছে না। এই অবস্থায় হঠাৎ করে গাড়ির মুখে কিছু এসে পড়লে বাঁচানোও মুশকিল হবে। তাই খুব সাবধানে ড্রাইভ করছেন বিবেক।

বেরোবার আগে চটপট কয়েকটি জরুরি কাজ সেরে নিয়েছেন বিবেক। একটা ছোট সুটকেস ভর্তি করে কয়েকদিন চালাবার মতো কিছু জামাকাপড় বোঝাই করে নিয়েছেন। হাতের কাছে যত টাকা পেয়েছেন সব তুলে নিয়েছেন। আর চেক বই তো নিয়েইছেন। বন্ধ খামে একটা চিঠি লিখে দোতলার সদর দরজার ওপরে এঁটে রেখে এসেছেন।

গাড়ি চালাতে-চালাতে বিবেক লক্ষ করলেন, রাহুলের রেনকোটটায় চেতনকে বেশ মানিয়েছে। মুখের প্রায় সম্পূর্ণটাই টুপির ভেতর ঢাকা থাকলেও চেতনের চোখ দুটোতে একটা খুশির ঝিলিক দেখতে পেলেন বিবেক। একটা ছোট্ট ছেলেকে অপহরণ করবার অপরাধ বোধটাও খানিকটা হালকা হয়ে এল।

চেতন হঠাৎ প্রশ্ন করল, "আচ্ছা আঙ্কেল, রাহুলকে ওরা কিডন্যাপ করেছিল কবে ?"

"জানুয়ারি মাসের সাত তারিখে। ক্রিসমাসের ছুটির পর সেই দিনই প্রথম স্কুলে গিয়েছিল।"

"তুমি পুলিশকে জানিয়েছিলে কবে ?"

"ঠিক কোনদিন সেটা তো মনে পড়ছে না। তবে জানুয়ারি মাসের শেষাশেষি হবে।"

"এই তো মুশকিল করলে, কোথায় জানিয়েছিলে ?"

"মানে ?"

"মানে মিসিং স্কোয়াডে, না ইন্টেলিজেন্সে ?"

"প্রথমে লোকাল থানায়। সেখান থেকে ওরাই পাঠিয়েছিল হেড কোয়ার্টারে।"

"ভালই হল। ওটা বাবার অফিস। তোমার পুরো নামটা কী ?"

"বিবেক বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"বন্দ্যোপাধ্যায় লেখো না ব্যানার্জি ?"

"বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন ?"

"এখন বাড়িতে ফোন করে তো সব জানাতে হবে। না হলে বাবার ডিপার্টমেন্ট ট্রেস করবে কীভাবে ?"

চেতনের প্রশ্ন করবার ধরনের মধ্যে বিবেক আগামী দিনের এক জন দক্ষ প্রশাসককে আবিষ্কার করলেন। আরও একবার মুগ্ধ হলেন বিবেক। মনে হল এই ছোট্ট শিশুটাই একদিন তাঁর রাহুলকে ফিরিয়ে দিতে পারবে।

নিউ ব্রিজের মুখে বাঁক নিয়েই গাড়িটা মাঝপথেই দাঁড় করালেন বিবেক। দূর থেকেই ওঁরা লক্ষ করলেন, ব্রিজের ওপর বহু মানুষের জটলা। বৃষ্টি এসে বারবার ওদের দৃষ্টি ঝাপসা করে দিচ্ছে। ড্যাশ-বোর্ডে রাখা কাপড়ের টুকরো দিয়ে ভেতরের কাচ মুছে নিয়ে স্পষ্ট করে দেখার চেষ্টা করলেন দু'জনেই। কোনও কারণে ব্রিজের ওপরে বিশেষ আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় দিনের আলোর মতোই ঝলমল করছে অঞ্চলটা। ছোট-বড় বেশ কয়েকটি গাড়ি হেডলাইট জ্বেলে দাঁড়িয়ে আছে। দমকলের গাড়ি থেকে-থেকে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। কয়েকটা গাড়ির মাথায় নীল আলো দেখেই বুঝে নেওয়া যাচ্ছে ওগুলো অ্যাম্বুলেন্স। এই সব গাড়ির জটলার ভেতরে সাদা রেনকোট মাথায় হেলমেট পরে পুলিশের লোকজন ছোটাছুটি করছে।

চেতনই প্রথম মুখ খুলল, "আঙ্কেল, এখানে অনেক পুলিশ। কিছু একটা হয়েছে বোধ হয়, অন্যদিক দিয়ে চলো।"

সত্যি বলতে কী, পুলিশের কথাটা চেতনই ওঁর মাথায় ঢুকিয়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে গাড়িটা ঘুরিয়ে অন্য পথ ধরলেন ওঁরা।

একটা অন্ধকার জায়গায় গাড়িটা থামালেন বিবেক। গাড়িতে বসেই চেতন বলল, "এখানে বুথ কোথায় ?"

"আছে। এসো।"

কোনও অনুষ্ঠান দেখতে এসে বিপাকে পড়েছে লোকগুলো। বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় সদনের বারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে এখনও। তবে এদিকটা নির্জন।

কাচের ঘরে ঢুকে টেলিফোনের রিসিভারটা কানে দিয়েই বললেন বিবেক, "গুড। ইট্স ওয়ার্কিং।"

কয়েকটা কয়েন হাতের মুঠোয় রেখে চেতনকে বললেন, "ডায়াল করো।"

॥ ১২ ॥

লেখালিখি যা করবার সব লোকাল থানার এস. আই. অখিলেশ মিত্রই করছেন। শুধু প্রশ্ন করছেন একজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দা।

"ম্যাডাম, চেতনের ফোনটা ঠিক কখন এসেছিল আপনার মনে আছে ?"

একটু ভেবে নিয়ে বললেন সুমনা, "এই ন'টা কুড়ি-পঁচিশ নাগাদ হবে।"

"আপনার ছেলে ঠিক কী কী বলেছে যদি একটু মনে করে বলতে পারেন।"

চেতনের ফোনটা আসবার পরপরই নিজেই হেডকোয়ার্টারে ডায়াল করে সবকিছু জানিয়েছিলেন সুমনা। কিন্তু প্রয়োজনে আরও একবার বলতে হল।

সুমনার বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট হল যে, অপহরণকারীর নাম ডাঃ বিবেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ছেলে রাহুলকে যদি পুলিশ খুঁজে বার করে দিতে পারে তবেই সে চেতনকে ফিরিয়ে দেবে।

চেতনের বিনিময়-শর্ত শুনে অভিজ্ঞ গোয়েন্দাদের কপালের ভাঁজ স্পষ্ট হয়ে উঠল। নিজের ছেলের খোঁজ না পেয়ে লোকটা যে মরিয়া হয়েই এই পথ বেছে নিয়েছে এতে কোনও সন্দেহই নেই। বিশিষ্ট পুলিশকর্মীর ছেলেকে অপহরণ করবার সাহস যার আছে প্রয়োজনে সে আরও ভয়ঙ্কর কিছু ঘটিয়ে দিতে পারে। গোয়েন্দাদের দৃষ্টিকোণে আশঙ্কাটা অমূলক নয়।

প্রশ্নকর্তা গোয়েন্দা অখিলেশ এবং আরও একজন এস. আই-এর উদ্দেশে বললেন,"শুনুন, আপনারা দু'জন এখনই হেড কোয়ার্টারে চলে যান। জানুয়ারি মাসের রেকর্ডগুলো চেক করে দেখুন যে রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে কোনও ছেলের কিডন্যাপের কোনও ডায়েরি রিপোর্ট রয়েছে কি না। যদি থাকে তবে অভিযোগকারীর ঠিকানাটা নোট করবেন। উই মাস্ট ফাইন্ড আউট হিজ অ্যাড্রেস। গো।"

দু'জন অফিসার চলে যেতেই প্রশ্নকর্তা গোয়েন্দা এবার সুমনাকে জিজ্ঞেস করলেন, "চেতন যখন ফোন করছিল তখন চারপাশের কোনওরকম শব্দ শোনা যাচ্ছিল কি ? যেমন ধরুন, কারখানার কোনওরকম সাইরেন, বা মন্দিরের ঘণ্টা, চার্চের বেল কিংবা ট্রেনের আওয়াজ— এইরকম কোনও শব্দ ?"

"কিচ্ছু না। এমনকী বৃষ্টির শব্দও নয়। কিন্তু কোন নাম্বার থেকে ডায়াল করা হয়েছে সেটা তো রেকর্ড হওয়ার কথা। তাই না ?"

"আপনার ওখানে আসার আগেই এক্সচেঞ্জ-এ গিয়েছিলাম। ওরা বলছে কোনও পাবলিক বুথ থেকে কল করা হয়েছে। তাতে এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে ডাক্তারবাবুটি অত্যন্ত চালাক আর বুকের পাটাও আছে। চেতনকে সঙ্গে নিয়ে ডেরা থেকে বাইরেও বেরিয়েছিল নিশ্চয়ই !"

ছেলের সঙ্গে কথা বলে এখন অনেকটাই শান্ত দেখাচ্ছে সুমনাকে তবু আশঙ্কা উদ্বেগটা রয়েই গেছে। কাঁপা গলায় বলে উঠলেন, "কী হবে ?"

খানিকটা অনিশ্চিতভাবেই যেন গোয়েন্দা অফিসার বললেন, "এই শহরেই রয়েছে যখন তখন ধরা কি আর পড়বে না ? আপনি একটু সময় দিন আমাদের।"

"চুনের বাবা কোথায় আছে জানেন ?"

"আপনার ফোনটা পাওয়ার পরেই আমরা সবকিছু জানিয়েছি সারকে। উনিই আমাদের এদিকটা সামলে নিতে বললেন। খিদিরপুর ডকের ব্রিজ থেকে যে ছেলেটা পড়ে গিয়েছিল জলে, ওর বডিটা এখনও পাওয়া যায়নি। সার ওখানেই আছেন।"

পুলিশের গোয়েন্দারা চলে যাওয়ার পর শুধু একটি কথাই মনে হল সুমনার, বড় দুর্ভাগার চাকরি করেন মনন ! মানুষ শুধু ওঁদের নিষ্ক্রিয়তাটাই দেখে ? মহত্ত্বটা কারও চোখে পড়ে না !

॥ ১৩ ॥

চেতন বাড়িতে ফোন করবার পরই বিবেকের মনে হয়েছিল, পুলিশের তৎপরতা বাড়বে। তাঁর পুরনো অভিযোগের ভিত্তিতেই ডায়েরি ঘেঁটে পুলিশ একবার এ. কে রোডের বাড়িতে নিশ্চয়ই হানা দেবে। তাই গা-ঢাকা দেওয়ার জন্যই এমন একটা আস্তানার প্রয়োজন ছিল, যেখানে খবরের কাগজ বা দূরদর্শন সমাচার নিয়ে কেউ বড় একটা মাথা ঘামায় না। আর তক্ষুনি তাঁর পুরনো রোগী লি সাহেবের কথা মনে পড়েছিল বিবেকের।

ট্যাংরার চিনেপাড়াটা কলকাতা শহরের মধ্যে হলেও সেটাকে একটা বিচ্ছিন্ন নগরী বললেও বাড়াবাড়ি হবে না। শহরের মানুষের নিত্য প্রয়োজনের মধ্যে এই অঞ্চলটা পড়ে না। এখানকার বাসিন্দারা সকলেই চিনে। বেশির ভাগই কাঁচা চামড়ার কারবারি। কিছু মিস্ত্রি আর জনাবিশেক ঠেলাওয়ালা ছাড়া চিনে পাড়ার এই কারখানাগুলোতে আর কারও বিশেষ আনাগোনা নেই। কয়েকটা চিনে রেস্তরাঁ আছে বটে, নামীদামি গাড়ি চড়ে ভোজনরসিকরা আসেন, কিন্তু এই খাবারের দোকানগুলো ওদের আস্তানার বাইরে।

একজন চিনে ভদ্রলোকের বাড়িতে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতাও চেতনের এই প্রথম। লি সাহেবের কাছে চেতনকে নিজের ভাইপো বলে পরিচয় দিয়েছেন বিবেক। এবং চমৎকার গল্প ফেঁদে আজ রাতটার মতো আশ্রয়ও নিয়েছেন। একেই দুর্যোগ, তায় গাড়িটাও ট্রাব্‌ল দিচ্ছে,তাই এয়ারপোর্ট থেকে ভাইপোকে রিসিভ করে ফেরবার পথে লি সাহেবের আশ্রয়টার কথাই নাকি প্রথম মনে হয়েছে বিবেক আঙ্কেলের ! সরল সিধে লি সাহেব শুধু গল্পটা বিশ্বাসই করেননি ওরা আসাতে যে অসম্ভব খুশিও হয়েছেন, সেটা ওঁর ছোট-ছোট চোখের ঝিলিকে আর বড়-বড় মুরগি রাঁধার বহর দেখেই টের পাওয়া যাচ্ছে।

লি সাহেবের স্ত্রী-সন্তানেরা সব দেশেই থাকেন। দুটো পয়সা রোজগারের ধান্দায় এই দেশে পড়ে আছেন। একা থাকেন বলেই আশ্রয় মেলাটা এত সহজ হল। কিন্তু কাল কোথায় যাবেন ওঁরা ?

॥ ১৪ ॥

ডাঃ বিবেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তল্লাশি করতে গিয়ে ওঁর এইট বাই ওয়ান এ. কে. রোডের বাড়িতে একটা বন্ধ খাম ছাড়া আর কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। খামের ভেতরের চিঠিটা কলকাতার পুলিশ মহলের উত্তেজনার আঁচটাকে আরও উস্‌কে দিয়েছে।

"প্রয়োজনে কলকাতা পুলিশ যে খুবই তৎপর হয়ে উঠতে পারে এই সত্যটা আমাদের মতন হাঁদা 'ছিটিজেন'রা বিলক্ষণ বুঝি ! দুঃখ এটাই যে, আপনাদের রেদো ঘষা মগজ দিয়ে আপনারা ভাবতেও পারেননি যে, আমি চেতনকে নিয়ে কেটে পড়ব।

"আমার একমাত্র ছেলের খোঁজ নিতে গিয়ে আমি যেমন প্রতিটি দিন নিরাশ হয়ে ফিরেছি, তেমনই আমার খোঁজ করতে এলে প্রতিটি দিন আপনাদের নিরাশ হয়েই ফিরতে হবে। রাহুলকে ফিরিয়ে দিলেই চেতনকে ফিরিয়ে দেব।"

বিবেকের সই করা চিঠিটা এখন লালবাজারের বিচক্ষণ গোয়েন্দাদের হাতবদল হয়ে টেবিলে-টেবিলে ঘুরছে। প্রশাসনকে খুঁচিয়ে দেওয়া এইরকম একটা ধৃষ্টতা ওপরওয়ালাদের চোয়াল শক্ত করে তুলেছে।

নিজের ছেলের শরীরে কাটাছেঁড়ার দরকার হলে একনম্বর সার্জেনও অন্য কোনও ডাক্তারের ছুরিকাঁচির ওপরেই বেশি ভরসা করেন। চেতনের উদ্ধারের ব্যাপারেও ওঁর বিভাগীয় গোয়েন্দাদের ওপরেই ভরসা করে বসে আছেন মনন। বিভাগীয় প্রধান হয়েও তাই একটি কথাও বলছেন না তিনি। ঘরের দরজা বন্ধ করে অপরাধীকে ধরবার ছক কষা চলছে এখন।

দরজার বাইরে কেউ টোকা মারল। মননের নির্দেশে অখিলেশ দরজাটা

খুলে দিতেই এক পাহারাদার ঢুকে এল ভেতরে। বলল, "সাব, আপসে কোই মিলনে আঁয়ে হ্যাঁয়।"

"আভি নেহি।" ছোট্ট করে জবাব দিলেন মনন।

পাহারাদার দরজাটা টেনে দিয়ে বাইরে যেতেই আবার দরজাটা খুলে গেল। পাল্লার ফাঁক দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত জেলাশাসক মানস চট্টোপাধ্যায় মুখ বাড়িয়ে বললেন, "আসতে পারি ?"

ঘরসুদ্ধু সকলেই চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। একেই অবসরপ্রাপ্ত জেলাশাসক, তায় তাঁদের বিভাগীয় প্রধানের পিতাঠাকুর। ওঁকে একটা আসনের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য রীতিমত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন অনেকেই। বাবা যে এইভাবে অফিসেই চলে আসবেন ভাবতেও পারেননি মনন। বললেন, "তুমি ?"

অখিলেশের চেয়ারটা দখল করে নিয়ে জেলাশাসক জবাব দিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসিনি।"

মননের সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখুন, বাড়িতে বসে আমি তো কোনও খবরই পাচ্ছি না। আমার নাতির ব্যাপারে আপনারা কতদূর এগোলেন বলুন তো ?"

মনন ভাল করেই জানেন, বাবার জেরার মুখে পড়লে বিপদের আশঙ্কাই বেশি, একটি কথাও না বাড়িয়ে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন মনন।

ছেলের এড়িয়ে যাওয়াটা খুব বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ করলেন তিনি। কিছুটা অসম্মানিতও বোধ করলেন। বললেন, "দেখুন আপনারা ভুল করেও ভাববেন না আমি আপনাদের কাজে কোনওরকম নাক গলাতে এসেছি। আমিও একসময় এইরকমই একটা সামান্য চাকরি করতাম সুতরাং ওই গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারস্যাপারগুলো আমিও একটু-আধটু জানি।"

অবসরপ্রাপ্ত জেলাশাসকের অভিমান স্পষ্ট হয়ে উঠল।

অখিলেশ লক্ষ করল, ভদ্রলোক গরমে ঘেমে-নেয়ে উঠেছেন। অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করল অখিলেশ, "সার, একটু জল খাবেন ?"

"না। ছেলেছোকরাদের মতো একটু তেষ্টাতেই বুক ফাটে না আমার।"

বয়সের উত্তেজনাটাকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিল সবাই। একজন গোয়েন্দা অফিসার খুব শান্তভাবেই বললেন, "আপনার নাতির ব্যাপারে আপনার চিন্তা তো হবেই। তবে আমরাও চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখছি না।"

"কীভাবে এগোচ্ছেন আপনারা ? মানে কিচ্ছু মনে করবেন না। আই মাইট হেল্প ইউ উইথ মাই লিট্‌ল নলেজ।"

"নিশ্চয়ই। বলুন না।"

"আপনারা আগে বলুন কীভাবে প্রসিড করছেন আপনারা ?"

"আমরা কোর্ট-অর্ডার আপিল করেছি। ওঁর এ. কে. রোডের বাড়িটা সার্চ করবার জন্য।"

"তাতে বিশেষ কী লাভ হবে বলে মনে করছেন ?"

"ওঁর অন্য কোথাও কোনও বাড়ি, কি আত্মীয়স্বজন, কি চেনা জানা বন্ধুবান্ধবের হদিস মিলতে পারে। মানে চেতনকে লুকিয়ে রাখবার কয়েকটা সম্ভাব্য স্থান—। কোন ব্যাঙ্কে টাকা রাখেন সেটা জানলেও অনেক সুবিধে। টাকার প্রয়োজনে ডেরা ছেড়ে বেরোতে তো হবেই, বিশেষত এই শহরেই যখন রয়েছেন—।"

"আমার মনে হয় চেতনকে ফিরে পেতে হলে সবচেয়ে আগে লোকটার ছেলেকে খুঁজে বার করবার কাজটা শুরু করা দরকার..."

"কিন্তু সেটা তো একটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার !"

"লোকটা যেখানেই থাকুক, ও ঠিকই খবর নিচ্ছে যে, আপনারা ওর ছেলের ব্যাপারে কতটা এগোচ্ছেন।"

"কিন্তু আসল কাজটা ফেলে রেখে আমরা তো একটা পুরনো ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করতে পারব না এক্ষুনি। ওঁর ছেলের কিডন্যাপের ঘটনাটা তো অনেক আগের ব্যাপার !"

"কিন্তু যার কাছ থেকে আমরা চেতনকে ফিরে পাব তার তো ওই একটাই চাহিদা। তাই না ?"

"কিন্তু এতে তো একটা অপরাধীর চাপের কাছে আমরা আরও দুর্বল হয়ে পড়ব। এক অর্থে এটা পুলিশের হারও বটে !"

"আমি তো পুলিশকে জেতাবার জন্যই কথাগুলো বলছি। একটু ধৈর্য ধরে শুনুনই না আমার কথাগুলো !"

গোয়েন্দারা বাধ্য হয়েই নীরব হয়ে যান। অবসরপ্রাপ্ত জেলাশাসক বলতে শুরু করেন।

॥ ১৫ ॥

কাকভোরে উঠেই বিবেক আঙ্কেল লি সাহেবকে বুঝিয়েছেন যে, ওঁর গাড়িটা ব্রেক ধরছে না বলে বাধ্য হয়েই ওটা লি সাহেবের গ্যারাজে রেখে যাচ্ছেন। একটা বিশেষ কাজে দিনপাঁচেকের জন্য কলকাতার বাইরে যেতে হচ্ছে, পরে সুবিধেমতো সময়ে এসে গাড়িটা নিয়ে যাবেন।

নিজের গাড়ি থেকে সুটকেসটা বার করে নিয়ে, লি সাহেবকে বিদায় জানিয়ে একটু অন্ধকার থাকতে থাকতেই ওঁরা পথে বেরিয়ে এলেন।

ট্যাক্সিতে উঠে চেতন জিজ্ঞেস করল, "আমরা এখন কোথায় যাব ?"

সিগারেটের ধোঁয়াটা জানলার বাইরে চালান করে দিয়ে বিবেক বললেন, "কালীঘাটে।"

"পুজো দেবে ?"

"না।"

চুপ করে গেল চেতন। ট্যাক্সিটা কিছুদূর এগোবার পর বিবেক বললেন, "একটা জিনিস করতে পারলে দু-চারদিনের জন্য একটা দারুণ জায়গায় ঘুরে আসা যাবে।"

"কোথায় ?"

"মায়াপুর, নবদ্বীপে।"

"তুমি এতটা পথ যাবে ? পুলিশ যদি আমাদের চিনে ফেলে ?"

"সেই জিনিসটা করতে পারলে আমাদের ধরা অত সহজ হবে না।"

"কী জিনিস ?"

"আমাদের ন্যাড়া হতে হবে।"

এবার চেতন একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বিবেক সেটা লক্ষ করে বললেন, "তবে থাক। তুমি যদি না চাও তো দরকার নেই।"

"মা-বাবা বেঁচে থাকলে নাকি পুরো ন্যাড়া হতে নেই ?"

"পুরো ন্যাড়া তো আমরাও হতে পারব না। আমাদের দু'জনকেই টিকি রাখতে হবে।"

এবার ফিক করে হেসে ফেলল চেতন। বিবেক বুঝলেন ওর আর আপত্তি নেই।

পরিচিত এক পান্ডার দোকানে সুটকেসটা রেখে চেতনকে সোজা নিয়ে গেল গঙ্গার ঘাটে। একটা সুন্দর টিকি বাঁচিয়ে পরামানিক ভাল করে চেতনের সব চুল চেঁছে দিল। আয়নায় নিজের মুখটা দেখে নিজেকেই চিনতে পারল না চেতন।

কালীঘাটেরই একটা কাপড়ের দোকান থেকে ছোট-বড় মিলিয়ে চারটে ধুতি আর দুটো নামাবলী কিনলেন বিবেক আঙ্কেল। গলির মুখের দোকানগুলোও এই ভোরবেলাই খুলে গিয়েছে। সেইরকমই একটা দোকান থেকে দুটো জপমালা আর তিলক কাটবার খড়িও কেনা হল।

বিবেক আঙ্কেলের মতলবটা এখনও বুঝে উঠতে পারল না চেতন। শুধু দেখল, আঙ্কেল কিন্তু ন্যাড়া হলেন না।

ট্যাক্সিতে বসে চেতন বলল, "ইস, সারা গায়ে কুটকুট করছে।"

"বেরনোর আগে স্নান তো করতেই হবে। চলো না খুব ভাল বাথরুম আছে।"

"আঙ্কেল, তুমি ন্যাড়া হলে না ?"

"ছেলের পৈতেতে বাবা ন্যাড়া হলে চলে ? ওদের সন্দেহ হত না। আমি করে নেব কোনও সেলুনে বসে।"

ধুতি, নামাবলী, কণ্ঠহার, তিলক-ফোঁটায় পুরোদস্তুর ভক্তের সাজে, ওঁরা রওনা হলেন মায়াপুরের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু হাইওয়েতে এসেই বিপদটা হল। বাসের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেতন দেখতে পেল, ছোট-বড় নানারকমের গাড়ি, বাস ট্রাক, একে অন্যের পেছন ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বাসে বসে জানবার উপায়ও নেই সামনে কী ঘটেছে।

উলটো দিক থেকে হেঁটে আসা কয়েকজন স্থানীয় মানুষের টুকরো কিছু কথা কানে এল চেতনের আর সঙ্গে-সঙ্গে শিরদাঁড়া টানটান হয়ে উঠল দু'জনেরই।

পুলিশের ছেলের খোঁজে রাস্তার গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চলছে। নামাবলীটা দিয়ে বিবেক আঙ্কেল ওঁর কপালের ঘামটা মুছে নিলেন একবার। তারপর গলা নামিয়ে চেতনকে জিজ্ঞেস করলেন, "হিন্দি বলতে পারো ?"

"পারি। খুব ভাল।"

"ওদের সামনে হিন্দিতেই কথা বলবে। তুমি রাহুল শ্রীবাস্তব। আমি রোহন শ্রীবাস্তব। আমরা পিতা-পুত্র।"

"কিন্তু ওদের কাছে যদি আমার ছবি থাকে !"

"তা হলে তুমি বাড়ি ফিরে যাবে, আমার যা হয় হবে।"

আঙ্কেলের উত্তর শুনে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল চেতনের। ঠিক তক্ষুনি ওদের বাসটাও কেঁচোর মতো বুকে ভর করে এগিয়ে চলল নুনের দিকে।

এত সহজে যে পার পাওয়া যাবে, দু'জনের একজনও তা ভাবেনি। পুলিশের জটলার মুখে বাসটা এসে দাঁড়াতেই ওরা ড্রাইভারকে হাতের ইশারায় চলে যেতে বলল। পার হতে হতে লক্ষ করল চেতন, লাঠি হাতে পুলিশগুলো অবাক চোখে তিলক-কাটা সাহেবগুলোর দিকেই তাকিয়ে আছে।

নামকীর্তন শুনে আর প্রসাদ পেয়েই দুটো দিন দিব্যি কেটে গেল। কিন্তু আগামীকাল মায়াপুরের আশ্রমের ঘরটা ছাড়তে হবে। প্রভুর দর্শন করতে আসা ভক্তদের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। তাই সকল তীর্থযাত্রীকেই সেবার সুযোগ দিতে আশ্রমের ঘর ব্যবহারের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

আজ বাদে কাল পূর্ণিমা। মন্দিরের সিঁড়িতে বসে-বসেই বিবেক ভাবছিলেন কালই চাঁদটা পুরো হয়ে যাবে। কিন্তু ওঁর এই অভিযানের শেষ কোথায় ? হঠাৎ চেতনের দিকে দৃষ্টি যেতেই মনে হল ছেলেটার নিশ্চয়ই মন কেমন করছে। বিবেকের ভেতরে একটা বাবার মন আছে, তাই বিবেক বুঝতে পারেন সহজেই। বললেন, "মায়ের সঙ্গে কথা বলবে ?"

"কোথা থেকে ?"

"বাইরে অনেক পি. সি. ও. বুথ আছে। যাবে ?"

"চলো।"

এখন রাত যদিও খুব বেশি নয় কিন্তু এরই মধ্যে রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। ওদের পক্ষে ভালই হয়েছে।

কিন্তু বুথের দরজার মুখে এসেই চমকে গেলেন বিবেকেরা। কাচের ঘরটার ভেতরে ঠাসা ভিড়। ফোন করছে না কেউই। রঙিন টিভি-তে ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপের খেলা দেখছে সবাই। এই ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়াটা ঠিক হবে না ভেবে ফিরে যাওয়ার জন্য দু'জনেই পা বাড়ালেন আর তক্ষুনি খবরের বাজনাটা বেজে উঠল।

কাচের দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়েই এপাশে-ওপাশে তাকিয়ে অন্য কোনও ফোনের জায়গার খোঁজ করছিলেন বিবেক, এমন সময় বিশেষ বিশেষ খবরের টুকরো কথাগুলো ভেসে এসে টিভি-র পরদার দিকে ফিরিয়ে নিল দু'জনকেই। "আজ কলকাতা বিমানবন্দরে সৌদি আরব থেকে ফিরে আসা দশজন কিশোর কিশোরীর মধ্যে একটি দশ বছরের বালককে রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায় বলে কলকাতা পুলিশ চিহ্নিত করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই রাহুলকে খুঁজে বার করবার দাবিতেই রাহুলের পিতা ডাঃ বিবেক বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসার মনন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র চেতনকে গত রবিবার স্কুলের অনুষ্ঠান চলার সময় অপহরণ করেছেন।"

চেতন কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিবেক ওকে বুকে তুলে নিয়ে ছুটতে শুরু করলেন। বিবেকের দৃষ্টি যতবারই ঝাপসা হয়ে আসছে চেতনের বুকে নিজের চোখ দুটোকে ততবারই মুছে নিচ্ছেন। চেতনকে বুকে করেই ক্রমশ লোকালয়ের দিকে ছুটে চললেন বিবেক।

চেতনও ঝরঝর করে কাঁদছে এখন। তবে সেটা খুশিতে। বলল, "আমাকে নামিয়ে দাও আঙ্কেল, তোমার কষ্ট হচ্ছে।"

ছুটতে-ছুটতেই বললেন বিবেক, "বুকের রত্ন মাটিতে ফেলতে নেই।"

"তুমি ছুটেই কলকাতা যাবে নাকি ?"

"একটা প্রাইভেট কার নিতে হবে। যত টাকা লাগুক, আগে তোকে তোর মায়ের বুকে ফিরিয়ে দেব। তারপর রাহুলকে বাড়ি নিয়ে যাব। ওঃ কতদিন দেখিনি ছেলেটাকে !"

॥ ১৬ ॥

বিচারের ঘরে তিলধারণেরও জায়গা নেই। কোর্টের বাইরেও প্রচুর লোক এসে ভিড় জমিয়েছে। সবক'টি দৈনিকেরই প্রথম পাতাতেই খবরটা বেরিয়েছে। আজ চেতনের অপহরণকারীর বিচার হবে।

যদিও আইনের চোখে উদ্দেশ্যের তেমন দাম নেই, অপরাধী অপরাধীই। কী উদ্দেশ্যে অপরাধ ঘটেছে সেটাও বিচার্য নয়, তবু যে কৌশল প্রয়োগ করে অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, সেটা অনেকেরই অমানবিক বলে মনে হয়েছে। পুলিশের কৌশলকে কটাক্ষ করে কাগজেও লেখালিখি হয়েছে অনেক।

সৌদি আরব থেকে ফিরে আসা দশজনের মধ্যে একটি ছেলেও রাহুল ছিল না। রাহুলকে পুলিশ আদপেই খুঁজে পায়নি। পুলিশ একটি সুপরিকল্পিত ফাঁদ পেতেছিল শুধু। আর অপরাধীও সেই ফাঁদেই পা দিয়েছেন।

অপরাধ দমনে কোনও কৌশলই হয়তো অমানবিক বলে চিহ্নিত হবে না, কিন্তু অপরাধের পেছনে মানবিক কারণ আছে বলেই বিবেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচার শুনতে এত মানুষের ভিড় জমেছে।

বিচারের শুরুতে বিবেক শুধু কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করেছেন, "মাই লর্ড, আপনাকে অসম্মান করবার কোনও ইচ্ছেই নেই আমার। আসলে পা দুটোতে আর জোর পাচ্ছি না, আমি কাঠগড়ায় একটু বসবার অনুমতি ভিক্ষে করছি।"

এক মুহূর্তও না ভেবে অনুমতি দিয়েছিলেন বিচারক। তারপর থেকে

তাঁর সম্পর্কে কী অভিযোগ আনা হয়েছে, কতটা সওয়াল জবাব হয়েছে এসব কিচ্ছুই জানেন না বিবেক।

বিচারকের ডাকটা কানে যেতেই কাঠগড়ায় এমনভাবে উঠে দাঁড়ালেন বিবেক, যেন একটা দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন। উদ্‌ভ্রান্তের মতো বললেন, "কোথায়, কোথায়, আমার রাহুল কোথায়?"

ঘরভর্তি সকলের গভীর থেকেই একটা বাতাস বেরিয়ে ঘরটাকে তপ্ত করে দিল। বিচারক তাঁর বিষণ্ণতা গোপন করতেই বোধ হয় মাথা নামিয়ে নিলেন।

স্বল্পকাল পরেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে বিবেক বলে উঠলেন, "ইয়েস মাই লর্ড, কিছু বলছিলেন আমাকে?"

প্রশ্নটা করবার সময়ে বিবেকের প্রতি তাঁর সহানুভূতিটা আড়াল করতে পারলেন না। বললেন, "আত্মপক্ষ সমর্থনে আপনি ইচ্ছে হলে আদালতকে কিছু বলতে পারেন।"

"না, না, আমার কিচ্ছু বলার নেই। যা শাস্তি দেওয়ার আমাকে দিয়ে জেলে পাঠিয়ে দিন। রাহুলের মাও দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে, রাহুলটাও নেই। নিজের ঘরটাও এখন আমার কাছে জেলখানার মতোই।" এলোমেলো ভাবে কথাগুলো উচ্চারণ করে শূন্যে দৃষ্টি মেলে আপনমনেই হাসতে থাকেন বিবেক, আবার হঠাৎই থেমে যান।

এই মামলায় তদন্তকারী গোয়েন্দা অফিসার, পুলিশকর্মী ছাড়াও অভিযোগকারীর পক্ষে চুনের দাদু এবং বাবাও উপস্থিত আছেন। আদালতের কর্মীরা তো আছেনই, আছেন উকিল, পেশকার, মহামান্য বিচারক আর আছেন সাধারণ মানুষ। সকলেই মনে-মনে ভাবছেন এমন ঘটনা না ঘটলেই যেন ভাল হত।

এই মুহূর্তে আদালত কক্ষে যে নীরবতাটা বিরাজ করছে তাকে ব্যাখ্যা করা মুশকিল। যে মানুষটা কানে শুনতে পায় না তার কাছে নীরবতার যে অর্থ হতে পারে, এও প্রায় তাই।

বিচারক তাঁর রায় লিখতে শুরু করেছেন। লিখতে-লিখতে মুখ তুলে বলেন, "ভারতীয় দণ্ডবিধিতে, অপহরণ যদিও একটা কঠিন-শাস্তিযোগ্য অপরাধ—"

বিচারকের রায়কে মাঝপথে থমকে দিয়ে আদালত কক্ষের শেষ প্রান্ত থেকে একটা নরম গলা ভেসে আসে, "আঙ্কেল কিচ্ছু করেনি।"

সকলের মুখগুলো একসঙ্গে ঘুরে গেল বিচারঘরে ঢোকার মূল ফটকের দিকে। সেখানে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও নিজের ছেলেকে আগলে রাখতে পারছেন না সুমনা। মায়ের হাত ছাড়িয়ে একছুটে বিচারকের সামনে এসে ডান হাতের আঙুল তুলে দাঁড়িয়ে পড়ে।

বিচারক বুঝতে পারেন, ছেলেটি কিছু বলতে চাইছে, তাই ছাত্রের মতো হাত উঠিয়ে অনুমতির অপেক্ষায় আছে। লেখা বন্ধ করে কলমটা পাশের দোয়াতে রেখে দিয়ে বললেন, "তোমার যা বলবার ওই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলো।" বিবেকের বিপরীত প্রান্তে রাখা উইটনেস বক্সটা হাতের ইশারায় চেতনকে দেখিয়ে দিলেন বিচারক।

চেতন বিন্দুমাত্র সময় না নিয়ে উত্তর দিল, "এটাতে তো পুলিশ দাঁড়াবে, আমি তো আঙ্কেলের হয়ে কথা বলব।"

বিচারকের অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই চেতন এক ছুটে বিবেকের কাঠগড়ায় ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কয়েক মুহূর্ত আগেও যে বিবেককে সঞ্জীবতাহীন এক প্রাণের উচ্ছিষ্ট বলে বোধ হচ্ছিল, চেতনের ছোঁয়া যেন সেই বিবেকের মধ্যেই জীবন সুধা ঢেলে দিল! বিচার ভুলে, দণ্ড ভুলে, হাজারও মানুষের অস্তিত্ব ভুলে বিবেক শুধু আকুল হয়ে আদর করতে লাগলেন চেতনকে!

বিচার দেখতে আসা মানুষের প্রতিক্রিয়াকে হাতুড়ি ঠুকে থামিয়ে দিয়ে বিচারক বললেন, "চেতন, পুলিশের কথা আমরা শুনেছি, এবার তোমার যা বলবার আছে বলো।"

"কিন্তু মি লর্ড পুলিশ যা বলেছে আমি তো শুনিনি!"

"তোমার কী ধারণা পুলিশের কথায় ভুল থাকতে পারে?"

"পুলিশ তো ভুল বলে।"

চঞ্চল হয়ে নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান মনন কিন্তু সুমনা তাঁকে জোর করেই থামিয়ে দিলেন।

বিচারক বললেন, "কী ভুল বলেছে পুলিশ?"

"রাহুলকে ওঁরা তো খুঁজে পাননি, ভুল বলে আঙ্কেলকে দুঃখ দিলেন কেন?"

নীতির প্রশ্নের কাছে কৌশলকে থমকে দাঁড়াতেই হয়। আদালতের এই সাময়িক নীরবতা সেই সত্যটাকেই আবার প্রমাণ করে দিল।

পুলিশের যা যুক্তি হতে পারে, বিচারকই সেটা অনুমান করে বললেন, "ওঁরা তো বলবেন অপরাধীকে ধরবার জন্যই এটা ওঁদের করতে হয়েছে।"

"আঙ্কেল কোনও অপরাধ করেনি।"

"উনি তোমাকে অপহরণ করেননি?"

"না।"

'সাদা-মিথ্যে' শব্দ দুটো আবার ঝট করে মনে পড়ে গেল চেতনের। মনে পড়ে গেল ফাদার ইউজেনিওর কথা। যে মিথ্যে মানুষের মঙ্গল করে সে মিথ্যেতে কোনও পাপ নেই। মনে-মনে ঠিক করে নিল চেতন, আঙ্কেলকে বাঁচাতে এই শব্দ দুটো থেকে সে নড়বে না।

আদালত-কক্ষে এরই মধ্যে সকলে গুনগুন করতে শুরু করে দিয়েছে। গোয়েন্দারাও বিভ্রান্ত। আর চেতনের মা, বাবা, দাদুর তো কথাই নেই।

বিচারকই অবস্থা আয়ত্তে আনলেন। পুলিশকে লেখা বিবেকের চিঠিটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে বললেন, "কিন্তু চেতন, পুলিশকে লেখা একটা চিঠি আমার কাছে আছে। চিঠিটায় অপরাধী ডাঃ বিবেক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "আমার একমাত্র ছেলের খোঁজ নিতে গিয়ে আমি যেমন প্রতিটি দিন নিরাশ হয়ে ফিরেছি, তেমনই আমার খোঁজ করতে এলে প্রতিটি দিন আপনাদেরও নিরাশ হয়েই ফিরতে হবে। রাহুলকে ফিরিয়ে দিলেই চেতনকে ফিরিয়ে দেব।" চিঠি পড়া শেষ করে বিচারক বললেন, "কাউকে আটকে রেখে, যদি কেউ ফিরিয়ে দেওয়ার শর্ত প্রয়োগ করে তবে কিন্তু সেটাকে অপহরণই বলা হবে।"

বিচারক চিঠি পড়াকালীনই চেতন ঠিক করে নিয়েছে কী বলবে। জবাবটা তাই মুখের ডগায় তৈরিই ছিল। বলল, "ওই চিঠিটা আমিই লিখতে বলেছিলাম আঙ্কেলকে।"

অন্য সকলের মতোই বিচারকও খুব অবাক হয়ে বললেন, "তুমি!"

"ইয়েস মি লর্ড। যেমন মাকেও আমি ফোন করে বলেছিলাম যে রাহুলকে খুঁজে না দিলে আমিও ছাড়া পাব না।"

একটা অবিশ্বাসের ছোট্ট হাসি মুখে এনে বিচারক বললেন, "তার মানে তুমি বলতে চাও তোমরা দু'জনে মিলে যুক্তি করে স্কুলের বাতি নিভিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে?"

"না। আঙ্কেলকে আমি কোনওদিনই চিনতাম না। স্কুলের জানলার বাইরে একদিন শুধু উঁকি মারতে দেখেছিলাম।"

"কিন্তু তুমি তো বলেছিলে যে, তোমার ডায়েরিতে লেখা সব কথাই মিথ্যে!"

"হ্যাঁ, বাড়িতে আমি সেরকমই বলেছিলাম। আঙ্কেল একদিন আমাকে বাড়িতে ফোন করে আমার সাহায্য চেয়েছিলেন। সেটাও আমি বাড়িতে বলিনি। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করত লোকটা আমার কাছে কী চায়?

স্কুলেই বা লুকিয়ে-লুকিয়ে আমাকে দ্যাখে কেন !"

এত মিথ্যে বলতে এবার সত্যিই কষ্ট হচ্ছে চেতনের। ভেবে গুছিয়ে বলতে একটু সময়ও লাগছে। চেতনকে চুপ করে থাকতে দেখে বিচারক বললেন, "তারপর ? বলো।"

"স্কুলের থিয়েটারের দিন আঙ্কেল স্টেজের ওপরে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। বলল, নাটক দেখার সুযোগ নিয়ে ভেতরে ঢুকেছে অনেক কষ্ট করে। কাঁদতে-কাঁদতে বলল, ওর ছেলেকে কয়েকটা বদমাশ কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে। আমার বাবাকে বলেও নাকি কোনও ফল পায়নি। বেশি দেরি হয়ে গেলে বদমাশগুলো ওর ছেলেকে মেরে ফেলবে। তখন আমিই আঙ্কেলকে বললাম—"

চেতনের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বিচারক বললেন, "তোমাকে কিডন্যাপ করতে ?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি মিথ্যে বলছ, এই লোকটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছ।"

সাদা মিথ্যের শক্তিতে আর কুলোল না। কেঁদে ফেলল চেতন। এরপর যেটা বলল সবটাই সাদা সত্যি।

হঠাৎ কাঠগড়া থেকে নেমে সোজা ছুটে গেল বিচারকের পাশে। সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে বিচারকের হাতটাকে নিজের ছোট্ট দুটো হাতের ভেতর ওর একমাত্র ভরসার মতো আঁকড়ে ধরে বলল, "আমি তোমার গা ছুঁয়ে বলছি দাদু—"

আদালত অবমাননার দায় থেকে চেতনকে বাঁচাতেই পেশকার ছুটে এসে বললেন, "এই, এই, কী করছ তুমি ? বিচারককে ছুঁতে নেই।"

তাতে আরও জোরে কেঁদে উঠে আরও শক্ত করে বিচারকের হাত টেনে নিয়ে বলল, "না, না..."

কাঁদতে-কাঁদতে মাথা নেড়েই চলল চেতন, বুঝিয়ে দিল এই ভরসাটা ও কিছুতেই ছাড়বে না।

চেতন একটু শান্ত হয়ে এলে বিচারক বললেন, "তুমি কী বলবে বলো।"

একটু জোরে শ্বাস টেনে চেতন বলল, "আমাকে আঙ্কেল অনেকবার বলেছিল বাড়ি ফিরে যেতে। আমিই ফিরিনি। আঙ্কেল কখনওই আমাকে জোর করে আটকে রাখেনি। জোর করলে আমাকে কালীঘাটে নিয়ে সবার সামনে ন্যাড়া করাতে পারত বলো ? মায়াপুর বেড়াতে যাওয়ার সময় তা হলে আমিই তো পুলিশকে বলে দিতে পারতাম। যদি লি সাহেবের বাড়ি গিয়ে কান্নাকাটি করতাম তা হলে লি সাহেব কি টের পেত না ?"

বিচারকের মুখে একটা পরিবর্তন ঘটে যায়। বলেন, "যে বাবা-মা তোমাকে এত ভালবাসেন তাঁদের এইরকম মিথ্যে বলতে তোমার খারাপ লাগল না ?"

সাদা সত্যির জোরে এবার গলাটাই বদলে গেল চেতনের। খুব শান্ত গলায় বলল, "আমার বাবাকে কেউ ফাঁকিবাজ ভাবলে আমার খুব রাগ হয়। সবাই জানে লাইফ রিস্ক করে পুনেতে কিছু শিশুকে বাবা খারাপ লোকের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। বাঁ কাঁধের গুলি লাগার জায়গাটায় এখনও ব্যথা করে বাবার। বাবা কখনও মিথ্যে বলে না। নিউ ইয়ারের সময়ে কেউ গিফ্‌ট পাঠালে নিজের হাতে আবার ফেরত দিয়ে আসে। মা গতবারে পুজোর সময় একটা শাড়ি কিনতে চেয়েছিল। বাবা মাকে বলেছিল, যে, কত টাকা মাইনে পাই যে আট হাজার টাকা দিয়ে শাড়ি কিনে দেব ? আঙ্কেল ভেবেছিল বাবা বোধ হয় ইচ্ছে করেই রাহুলকে খুঁজে দিচ্ছে না। তাই আমার খুব রাগ হয়েছিল। তাই আমি চেয়েছিলাম বাবা যেন খুব তাড়াতাড়ি রাহুলকে খুঁজে দেয়।"

কথাগুলো বলতে-বলতে হাঁফিয়ে উঠল চেতন। তারপর হাত দিয়ে বিচারকের পা দুটো ছোঁয়ার চেষ্টা করতে-করতে বলল, "বিশ্বাস করো দাদু, আঙ্কেল আমাকে কখনওই জোর করে আটকে রাখেনি। তুমি আঙ্কেলকে শাস্তি দিয়ো না !"

এর পর বেকসুর খালাস হতে খুব বেশি সময় লাগেনি বিবেকের।

কোর্ট-চত্বর এখন ফাঁকা হয়ে এসেছে। সেই যে ছেলেকে বুকে তুলে নিয়েছেন মনন, এখনও নামাননি। প্রাণভরে জল খেয়ে সুমনার হাতে কুলারের পাত্রটা তুলে দিয়ে বললেন বিবেক, "এবার আমি যাব।"

চেতনের দাদু পায়ে-পায়ে এগিয়ে এসে বিবেকের সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, "প্রশাসনের কাজে যখন ছিলাম, ভুল করলেও ক্ষমা চাইবার কোনও সময় পেতাম না। বুঝলে ডাক্তার, আসলে তোমাকে ফাঁদে ফেলবার বুদ্ধিটা আমার এই বুড়ো মগজ থেকেই বেরিয়েছিল। পারলে ক্ষমা করে দিয়ো ভায়া।"

কথাটা বলেই পা বাড়ালেন। সুমনা বললেন, "এই রোদের মধ্যে কোথায় চললেন আবার ?"

"ভাবছি মিসিং স্কোয়াডে একবার ঘুরে আসি—" বলেই হনহন করে হাঁটতে লাগলেন।

সুমনা বিবেককে বললেন, "শুনুন, এই দুপুরে কোথায় যাবেন ? চলুন না আমাদের বাড়িতেই একটু ডালভাত খেয়ে নেবেন।"

বিবেকের পথ আটকে দাঁড়াল চেতন। বিবেকের আপত্তির কোনও সুযোগই রইল না।

মা, বাবা জিপের সামনেই বসেছেন। আঙ্কেলের সঙ্গে পেছনে বসেছে চেতন। একটা স্পিড ব্রেকারে জিপটা লাফিয়ে উঠতেই হুডের রডটায় চেতনের মাথাটা ঠুকে গেল।

"একটু দেখে চালান না—" পুলিশের ড্রাইভারকে বেশ কঠোরভাবেই কথাটা বলে ফেলেই সঙ্কোচে চুপ করে গেলেন বিবেক।

সুমনা এবং মনন লক্ষ করলেন চেতনের আঘাত পাওয়া জায়গাটাকে খুব যত্ন করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন বিবেক।

কাঠফাটা রোদে শহরের পথচারীরা কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। রেস কোর্সের পাশ দিয়ে জিপটা চলছে। শহরের এই প্রান্তটা তিলোত্তমা হলেও কেমন যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে তাকে।

নীরবতা ভেঙে মননই বললেন, "রাহুলের খুঁটিনাটি সবকিছু জানাবেন আমাকে, যেখানেই থাক খুঁজে বার করবই।"

সরোদের গাঢ়তম পরদাটায় কেউ যেন ঘা দিল। ধীরে-ধীরে কথাগুলো টেনে টেনে বিবেক বললেন, "এত বড় একটা দেশ। আবার দেশের পরেও দেশ আছে। কোথাও-না-কোথাও আছে নিশ্চয়ই আমার ছেলেটা—"

এর পর চেতনকে বুকে টেনে নিয়ে অনিশ্চিত দৃষ্টিতে কঠিন আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন বিবেক।

কতক্ষণ আকাশ হাতড়ে মরেছেন নিজেও জানেন না বিবেক। হঠাৎ খেয়াল হল ওর বুকের মাঝখানটা ভিজে গেছে। গভীর স্নেহে চেতনের নিজের মুখের দিকে টেনে তুলতেই চেতন ওর জলভরা চোখ দুটো বিবেকের কানের পাশে লুকিয়ে ফেলল। তারপর ফিসফিস করে বলে উঠল, "একদিন আমিও তো বাবার মতো পুলিশ হব, আমি তোমাকে প্রমিস করছি আঙ্কেল, রাহুলকে আমি ঠিক খুঁজে এনে দেব। তুমি দেখো।"

এবারে দু'জনের চোখেই জল। ঝাপসা চোখে এখন অনেক অনেক মানুষের ভিড় ঠেলে ওঁরা এগিয়ে চলেছেন। সবাইকেই একরকম দেখাচ্ছে।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী (সমাপ্ত)

সম্পূর্ণ গোয়েন্দা উপন্যাস

পাণ্ডব গোয়েন্দা

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

অবশেষে সর্বসম্মতভাবে ঠিক হল, পঞ্চুর জন্মদিন না হবেই। সেবার হতে গিয়েও যা হতে পারল না, এবার তা না করলেই নয়। তবে কিনা দিনক্ষণ দেখেটেখে নয়, যে-কোনও একটা মনোমতো দিন নিজেরাই নির্বাচন করে বেশ ঘটা করেই হবে পঞ্চুর জন্মদিন।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মাথায় একবার কোনও একটা হুজুগ চেপে বসলে আর তাকে নামায় কে? বিশেষ করে ভোম্বলের জেদ সাঙ্ঘাতিক। সেবারেও এই প্রস্তাবটা ভোম্বলই রেখেছিল। এমনভাবে ঘটনার গতি সেবার মোড় নিল যে, ঘটনাপ্রবাহে ওরা একেবারে পৌঁছে গেল মুম্বইয়ের আরব সমুদ্রের উপকূলে। তারপর থেকে ওই চিন্তাভাবনা মাথা থেকে সরেই গিয়েছিল প্রায়। বসন্তের এই মেঘমুক্ত দুপুরে ভোম্বলের হঠাৎই মনে হল কথাটা। আর যেই না মনে হওয়া অমনই সঙ্গে-সঙ্গে বাচ্চু, বিচ্চু আর বিলুকে নিয়ে আচমকা বাবলুদের বাড়ি।

পঞ্চুর জন্মদিন। এতে তো না করবার কিছু নেই। বাবলুও তাই এক কথায় রাজি হয়ে গেল। সে এক দারুণ হইহুল্লোড়ের ব্যাপার হল। কবে হবে, কখন হবে, কীভাবে হবে এইসবের পরিকল্পনাতেই মেতে উঠল সবাই।

বাবলুর মা ঘুমোচ্ছিলেন, শয্যা ত্যাগ করে উঠে এসে বললেন, "কী ব্যাপার রে তোদের ? হঠাৎ এমন দুপুরে মাতুনি শুরু করে দিলি কেন ?"

বাবলু বলল, "পঞ্চুর জন্মদিন।"

মা সবিস্ময়ে বললেন, "আবার !"

"আবার কী গো ! সেবারে তো হতে-হতেও হল না। তারপরে অনেক অভিযান করে ফেললাম আমরা। ওর ওই জন্মদিনের ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলাম।"

বিলু বলল, "আসলে ব্যাপার কী জানেন ? একটা কিছু আর না করলেই নয়। বাবলুর জন্মদিন, আমাদের জন্মদিন, এসব তো ছোটখাটো আয়োজনের মধ্য দিয়েই হয়। কিন্তু বেশ বড় ধরনের একটা কিছু করবার ইচ্ছে আমাদের অনেকদিনের। আমরা কত লোকের বিয়েবাড়ি ইত্যাদিতে নেমন্তন্ন খেতে যাই অথচ আমাদের কোনও দিদিটিদি নেই বলে কোনও বিয়েথা ইত্যাদির ব্যাপারস্যাপারগুলো আমাদের এখানে হয়ই না। আমাদেরও তো সাধ জাগে, এই বাড়ির সামনেই প্যান্ডেল বাঁধা হোক, লোকজন খাক।"

মা বললেন, "অতি উত্তম প্রস্তাব। দিনক্ষণ কিছু ঠিক করেছিস ?"

"না।"

"তা হলে এক কাজ কর। সামনের মাঘী পূর্ণিমাতেই পঞ্চুর জন্মদিনের আয়োজনটা কর।"

ভোম্বল বলল, "মাঘী পূর্ণিমায় কী করে হবে ? এখনই তো ফাল্গুন মাস।"

মা হেসে বললেন, "তাতে কী ? তিথির হেরফেরে এইরকমই হয়। বুদ্ধ পূর্ণিমা হয়ে যায় জ্যৈষ্ঠ মাসে, মাঘী পূর্ণিমা ফাল্গুনে। এ-বছর ফাল্গুনেই মাঘী পূর্ণিমা। বাবলুর জন্মদিনও এই ফাল্গুনেই শুক্লা একাদশীতে।"

বাচ্চু, বিচ্চু দু'জনেই উৎসাহে লাফিয়ে উঠল। বিচ্চু বলল, "তা হলে ওইদিনই পঞ্চুর ব্যাপারটা হয়ে যাক না কেন ?"

ভোম্বল বলল, "তা কী করে হয় ? বাবলুর জন্মদিন তো তিথি ধরে হয় না, ২৫ ফাল্গুনই ওর ধরাবাঁধা দিন। অতএব ওইদিনের কোনও হেরফের নেই।"

বিলু বলল, "তা হলে ২৫ ফাল্গুনই হোক। ওই একই দিনে দু'জনের জন্মদিনটা হয়ে যাক তা হলে ?"

ভোম্বল বলল, "ওইসবের মধ্যে আমি নেই। ২৫ ফাল্গুন পঞ্চুর জন্মদিন পালন করা হলে ওকে কোনওমতেই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে পারব না আমরা। কারণ, আদতে সেটা বাবলুর জন্মদিনই হয়ে যাবে। পঞ্চুরটা হবে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে এবং অন্যরকম। সেখানে লোকজনও যেমন খাবে তেমনই পঞ্চুর স্বজাতিরাও খাবে পাতা পেড়ে।"

মা বললেন, "হ্যাঁ, পঞ্চুর জন্মদিন ওইরকমভাবেই পালন করা উচিত। দিনটা তা হলে কবে ঠিক হল ?"

ভোম্বল বলল, "আপনি যে দিনের কথা বললেন। অর্থাৎ মাঘী পূর্ণিমার দিন।"

মা বললেন, "খুব ভাল হয় তা হলে। ওইদিন মধুপুরের গুরুদরবার থেকে আমার গুরুদেবেরও আসবার কথা। তাঁকে দিয়ে পঞ্চুর নামে সঙ্কল্প করিয়ে একটু পুজোও করিয়ে নিতে পারব।"

বিলু বলল, "সেই ভাল।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে এই কথাই রইল। তা বাবলু, তুই এমন চুপচাপ গুম হয়ে বসে আছিস কেন ? একটু কিছু বল ?"

বাবলু বলল, "আগে তোদেরটা শেষ হোক। শেষপর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছস সেটা শুনি ? তবে তো আমার মতামত জানাব।"

"দিন তো ঠিক হয়েই গেল। মাঘী পূর্ণিমার দিনই হবে।"

বাবলু মৃদু হেসে বলল, "দিন হিসেবে অতি উত্তম, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মস্ত ঘটা করে পঞ্চুর জন্মদিন পালিত হোক এও আমি চাই। তবে কিনা লোকজনকে নেমন্তন্ন করে ওইদিন যদি সত্যনারায়ণের শিরনি খাইয়ে বিদায় দিতে চাস তা হলে ঠিক আছে। কিন্তু মাছ-মাংসের ব্যাপার হলে অনেকেই ওইদিন খাবে না।"

সবাই আঁতকে উঠল এবার।

বাচ্চু বলল, "ঠিকই তো !"

ভোম্বল বলল, "তাই তো রে ! ওই কথাটা একবারও ভেবে দেখিনি কেউ। আমার মা তো কিছুই খান না ওইদিন।"

বাচ্চু বলল, "আমাদের মা উপোস না করলেও নিরামিষ ছাড়া খান না।"

বাবলুর মা বললেন, "ওমা, ওইদিন তো আমারও ওই একই অবস্থা। তার ওপর গুরুদেব যদি পায়ের ধুলো দেন তো...। না বাবা, তোরা শুক্লা একাদশীতেই দিনস্থির কর।"

বিচ্চু বলল, "সেই ভাল।"

সঙ্গে-সঙ্গে পাঁজি দেখে দিন ঠিক হল, ২২ ফাল্গুন শুক্লা একাদশীতেই হবে পঞ্চুকে ঘিরে পঞ্চু উৎসব।

কিন্তু কী আশ্চর্য ! যাকে ঘিরে এত কাণ্ড সেই পঞ্চু কই ? তার দেখা নেই কেন ? গেল কোথায় সে ?

বাবলু অনেক হাঁকডাক করল। ছাদে গেল। কিন্তু পঞ্চু সত্যিই বেপাত্তা।

বিলু বলল, "কোথায় গেল বল তো ?"

মা বললেন, "খোঁজ, খোঁজ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তখন দল বেঁধে সবাই চলল মিত্তিরদের বাগানের দিকে। ওই একটিমাত্র জায়গা ছাড়া পঞ্চু আর কোথাও যায় না। যাবেও না। কিন্তু এই অসময়ে ও ওখানে কী করতে গেল ? পাণ্ডব গোয়েন্দারা কিছুতেই ভেবে পেল না, পঞ্চুর এই অন্তর্ধানের কারণটা কী ?

মিত্তিরদের বাগান তোলপাড় করেও পঞ্চুর পাত্তা পেল না পাণ্ডব গোয়েন্দারা। সারাটা বিকেল গেল, সন্ধে হল, তখনও দেখা নেই পঞ্চুর। অবশেষে রাত্রি হল।

বাবলুর মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। মা'র চোখে জল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু সবাই অপেক্ষা করে-করে যে যার বাড়ি চলে গেল। ঠিক হল রাত দশটার মধ্যে পঞ্চু ফিরে না এলে ওরা রাত থেকেই তদন্তের কাজ শুরু করবে।

মা বললেন, "কেন যে ঠাকুর পদে-পদে এত বাধা দেন তা কে জানে ? তোরা ভাল কিছু করবি মনে করলেই একটা-না-একটা বাধা এসে উপস্থিত হয়।"

বাবলু বলল, "তা হয়, তবে সেই বাধার প্রাচীর আমরা পারও তো হই। যিনি আমাদের বাধা দেন তিনিই আমাদের পার করিয়ে দেন।"

"ঠাকুর তোদের সহায় আছেন। তবে একটা কথা, তোরা বাপু আর যাই করিস, পঞ্চুর জন্মদিনের নাম করিস না। সেবারও ওই জন্মদিন নিয়ে এক কেলেঙ্কারি। এবারও প্রায় তাই। কত লোকের যে চোখটাটানি এই পঞ্চুকে ঘিরে। কাগজে নাম ছাপা হচ্ছে, জয়জয়কার হচ্ছে আর মরছে সব জ্বলেপুড়ে। আমার তো এক-এক সময় ভয় হয়, কেউ কিছু খাইয়ে মেরে না দেয় ওকে।"

বাবলু বলল, "অসম্ভব কিছু নয়, যত দিন যাচ্ছে, মানুষের যা স্বরূপ দেখছি—।"

এমন সময় বাবা হঠাৎ এস. টি. ডি করলেন দুর্গাপুর থেকে।

বাবলু রিসিভার উঠিয়েই সর্বাগ্রে দুঃসংবাদটা বাবাকে দিল।

বাবা বললেন, "সে কী! পঞ্চু নেই? এ কেমন কথা? কতক্ষণ নেই?"

"দুপুর থেকেই। ভাত-ডাল খেয়ে সেই যে উধাও...।"

"ওর কোনও খোঁজ রাখিসনি তোরা?"

"ও তো থেকে-থেকে উধাও হয়ে যায়। তাই অতটা মনোযোগ দিইনি। কিন্তু এখনও ফেরেনি যখন, তখন নিশ্চয়ই কোনও বিপদ হয়েছে। তুমি কালই একবার পারো তো চলে এসো।" বলে ফোন নামিয়ে হতাশভাবে সোফায় এলিয়ে দিল দেহটা।

মা বললেন, "মনখারাপ করে কী আর করবি বাবা? যা হোক দুটো খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।"

বাবলু বলল, "আজ আর আমার কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না মা। তুমি বরং খেয়ে শুয়ে পড়ো।"

"দ্যাখো কাণ্ড, তুই খাবি না আর আমি খেয়ে শুয়ে পড়ব? তাই কখনও হয়?"

এমন সময় বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আবার এল।

বিলু বলল, "পঞ্চু ফেরেনি?"

"না।"

বিচ্ছু বলল, "তা হলে আর ঘরে বসে না থেকে চলো সবাই পঞ্চুর খোঁজে যাই।"

বাবলু সঙ্গে-সঙ্গে পিস্তলটা যথাস্থানে রেখে টর্চ নিয়ে রওনা হওয়ার জন্য তৈরি হওয়ার সময়ই টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল।

বাবলু 'হ্যালো' করতেই ওদিক থেকে শোনা গেল, "ভৌ—ভৌ-ভৌ।"

চমকে উঠল বাবলু, "হ্যালো, কে বলছেন?"

"ভৌ-ভৌ, ভৌ-ভৌ।"

বিলু বলল, "কার ফোন রে?"

নির্বিকারভাবে বাবলু বলল, "পঞ্চুর।"

"পঞ্চুর! কী যা-তা বকছিস?"

"বিশ্বাস হচ্ছে না?"

"পঞ্চু কখনও ফোন করতে পারে? ওর কথা চিন্তা করতে-করতে তোর মাথাটাই দেখছি খারাপ হয়ে গেছে।"

"না রে! সত্যি-সত্যিই পঞ্চুর ফোন। বিশ্বাস না হয় শোন।"

বিলু এসে হ্যালো করতেই ওই শব্দ ভেসে এল।

বিলু বলল, "নিশ্চয়ই পঞ্চুর কোনও বড় বিপদ। কেউ ওকে কিডন্যাপ করে কোথাও নিয়ে গেছে আর ওর গলার নকল করে ভেংচি কাটছে কেউ।"

বাবলু বলল, "না। এটা পঞ্চুরই গলা।"

বিলুর হাত থেকে রিসিভার নিয়ে বাবলু আবার বলল, "কে রে পঞ্চু! আমি বাবলু বলছি।"

এবার পঞ্চুর গলা দূর থেকে শোনা গেলেও খিকখিক করে একটা হাসির শব্দ শুনতে পেল ওরা।

বাবলু বলল, "কে আপনি?"

"আমি মনাদা বলছি রে হতভাগা। গলা শুনে বুঝতে পারছিস না?"

বাবলুকে কেউ হতভাগা বললে ও ভীষণ রেগে যায়। কিন্তু মনাদার কথায় রাগ হয় না। তার কারণ, মনাদার প্রতিটি কথার মাত্রাতেই একটা করে হতভাগা থাকে। বাবলু উৎসাহিত হয়ে বলল, "এবার বুঝতে পেরেছি। তা কী ব্যাপার মনাদা? পঞ্চুর গলা শুনতে পাচ্ছি যে! ব্যাপারটা কী?"

"ব্যাপার গুরুচরণ। তোর পঞ্চু যা করেছে তাতে কাল ওর কাগজে ছবি বেরিয়ে যাবে। কাল যে-কোনও কাগজ খুললেই দেখবি পঞ্চুর ছবি।"

"তুমি কোথা থেকে ফোন করছ? আমার ফোন নম্বর পেলে কার কাছ থেকে?"

"আমি ভবানীপুর থেকে ফোন করছি। পঞ্চু আজ এখানে থাকবে। কাল সকালেই...।"

যাঃ! লাইনটা কেটে গেল। বাবলু অনেকবার "হ্যালো হ্যালো" করেও সাড়া না পেয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল। এখন আর সকালের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

বিলুরা যে যার মতো চলে গেলে বাবলুও খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল।

॥ ২ ॥

পরদিন সকালেই দেখা গেল পঞ্চু ভৌ-ভৌ ডাক ছেড়ে তীরবেগে ছুটে এসে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। কপালে অ্যাত্ত বড় একটা লাল সিঁদুরের লম্বা দাগ নিয়ে একেবারে রান্নাঘরে মায়ের কাছে। ব্যাপারটা কী?

একটু পরেই মনাদাও এসে হাজির।

মনাদা বলল, "কোথায় গেল রে হতভাগাটা? ওঃ! গাড়ি থেকে নামতে-না-নামতেই একেবারে চোখের পলকে ধাঁ!"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই ছিল।

বাবলু বলল, "এসো, এসো, ভেতরে এসো। কী ব্যাপার বলো তো মনাদা?"

মনাদা বলল, "আরে ভাই, হয়েছে কী, কাল দুপুরে আমি গিয়েছিলাম তোদের ওই বাগানে ভ্যারেন্ডার আঠা আনতে। সামনের দাঁত দুটো নড়ছে, তাই একটু আঠা লাগাব বলেই গিয়েছিলাম। তা এমন সময় কোথা থেকে যেন এসে হাজির হল এই বীরপুঙ্গব। আমি যেখানে যাই, ও-ও সেখানে যায়। কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ে না। এই করতে-করতে একেবারে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত এল।

"এমন সময় হল কী, তোরা তো জানিস আমি ভগবান চাটুজ্যের গাড়ি চালাই। বাবুর একমাত্র মেয়ে খুকুদির হঠাৎ বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। তা বাবু বললেন, 'খুকু ওর কয়েকজন বান্ধবীকে নেমন্তন্ন করতে কলকাতায় যাবে, তুই একবার গাড়িটা বের করে ওকে ঘুরিয়ে আন। আসবার সময় হাজরার মোড়ে গয়নার দোকান থেকে ওর জন্য অর্ডারি গয়নাগুলোও নিয়ে আসবি।'

"তা মনিবের আদেশ। পালন তো করতেই হবে। এদিকে হয়েছে কী, আমি বাবুর বাড়িতে গেছি পঞ্চুও গেছে আমার সঙ্গে। খুকুদি তো পঞ্চুকে দেখে বেজায় খুশি। বললেন, 'এ কী! এ পাণ্ডবদের পঞ্চু না? এখানে কী করে এল?'

"আমি বললাম, 'আর বলো কেন দিদিভাই। কী যে হয়েছে ওর কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়ছে না।'

"খুকুদি বললেন, 'ভালই হয়েছে। দু-তিন ঘণ্টার ব্যাপার তো, কিছু সোনার জিনিসও ঘরে আনব। ওকেও বরং নিয়ে চলো। ও সঙ্গে থাকলে বুকে বল পাব আমি। তা ছাড়া পাণ্ডব গোয়েন্দাদের পঞ্চু সঙ্গে থাকলে বন্ধুদের কাছেও দাম বেড়ে যাবে আমার।'

"আমি বললাম, 'কিন্তু পঞ্চু কি যাবে?'

"'না যাওয়ার কী আছে? গাড়িতে করে যাবে আসবে।'

"তা পঞ্চুরও বোধ হয় খুব গাড়ি চাপতে শখ হচ্ছিল। তাই নববধূর মতো লাজুক-লাজুক মুখে তাকিয়ে রইল। এইবারে খুকুদি এসে ওর মুখে একটা রাজভোগ গুঁজে দিতেই ও এক লাফে গাড়িতে উঠে খুকুদির

পাশে।

"প্রথমেই আমরা নেমন্তন্নর পর্বটা সেরে নিলাম। তারপর খুকুদি বললেন, 'অনেকদিন কালীঘাটে যাইনি। চলো মনাদা, মায়ের মন্দিরে একটু পুজো দিয়ে গয়নাগুলো নিয়ে বাড়ি যাই।'

"আমি সেইমতো গাড়ি নিয়ে কালীঘাটে এলাম। কাল ছিল শনিবার। তাই মায়ের মন্দিরে ভিড় একটু বেশিই ছিল। খুকুদি ওদের পরিচিত একজন পাণ্ডার সাহায্য নিয়ে মন্দিরে গেলেন পুজো দিতে। সর্বঘটের কাঁঠালিটাও সঙ্গে গেল। অনেক চেষ্টা করেও ধরে রাখতে পারলাম না ওকে।"

বাচ্চু, বিচ্ছু দু'জনেই হেসে উঠল।

মা পাশের ঘরে ছিলেন। ওদের কথাবার্তা শুনেই এ-ঘরে এসে বললেন, "কী বললে ? আমার পঞ্চু কালীদর্শন করে এল ?"

"হ্যাঁ, মা। শুধু দর্শন নয়, একেবারে সকলের গা ঘেঁষে ভেতরে ঢুকে গড়াগড়িও দিয়ে এল। পাণ্ডারা প্রথমে একবার দূর-দূর করলেও পাছে কামড়ে দেয় এই ভয়ে কেউ ওকে ঘাঁটাল না। এমনকী রাস্তার কুকুর মনে করে খুকুদিকেও কিছু বলল না কেউ। একজন পূজারি আদর করে ওর কপালে সিঁদুরের একটা টিপ্পা পরিয়ে দিল। তারপরে পঞ্চুচন্দ্র যা করল সে এক কেলেঙ্কারির কাণ্ড। মায়ের মন্দিরে কারও বোধ হয় পাঁঠাবলির মানত ছিল। ঘাতক বলি দেওয়ার জন্য যেই না কাতান উঁচিয়েছে, ও অমনই বিকট একটা ডাক ছেড়ে লাফিয়ে পড়ল তার পিঠের ওপর। ঘাতক তো খাঁড়াসমেত ছিটকে পড়ল কয়েক হাত দূরে। বলি বন্ধ হল। পুরুত ঠাকুর রেগেমেগে একটা লাঠি নিয়ে যেই না পঞ্চুকে এক ঘা দিতে যাবেন, পঞ্চু তখন এমন সটকান দিল যে, সেই লাঠির ঘা পড়ল আর একজনের ওপর। তারপর সে কী কাণ্ড ! ভূতে-বানরে লড়াই লেগে গেল যেন। এই সময় কত যে ছবি উঠল পঞ্চুর তার ঠিক নেই। আমরা তো পালিয়ে বাঁচলাম।

"এর পরে আমরা এলাম হাজরার মোড়ে এক গয়নার দোকানে। প্রায় লাখ টাকার ওপর গয়নার অর্ডার দেওয়া ছিল। সেই গয়না নিয়ে গাড়িতে উঠতে যাব কি হঠাৎ একটি বোমা এসে পড়ল গাড়ির ওপর। গাড়ির কাচ ভেঙে একাকার। চারদিকে ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমি একটা দোকানে দাঁড়িয়ে তখন চা খাচ্ছিলাম বলে বেঁচে গেছি। চাকার আড়ালে থাকায় বেঁচে গেছে পঞ্চুও। দু-একজন পথচারী অল্পবিস্তর আহত হয়েছে। ভাগ্যজোরে বেঁচে গেছে খুকুদি। তবে ওর ডান পায়ে এমন চোট লেগেছে যে, যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল বেচারি। আর পঞ্চু ? সেই গয়নাভর্তি অ্যাটাচিটা নিয়ে যেভাবে ধোঁয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে দোকানে ঢুকে পড়ল সে তা বলবার নয়।"

ভোম্বল বলল, "এই প্রথম একটি কাঁচা কাজ করল পঞ্চু।"

বিলু বলল, "কেন ?"

"ওর উচিত ছিল ওই দুষ্কৃতীদের পেছনে ধাওয়া করা।"

মনাদা বলল, "সম্ভব ছিল না রে ভাই ! সন্ধের পরে হাজরার মোড়ে গেছিস কখনও ? ওই ব্যস্ত জনবহুল জায়গায় কিছুই করা সম্ভব হত না। মাঝখান থেকে গয়নাগুলো চোট হয়ে যেত। তবে বাবলু একটা কথা, ওই দুষ্কৃতীদের একজনকে কিন্তু আমি চিনেছি। লোকটাকে কখনও জগাছা মনসাতলায়, কখনও সুবোধ কুণ্ডুর কারখানার আশপাশে, কখনও-বা সার কারখানার দিকে আমি ঘোরাফেরা করতে দেখেছি। ব্যাটা সন্ধান-চোর। তাই ভয় হয়, পঞ্চুর ওপর রাগ করে কোনও সময় এসে তোদের ওপর হামলা না করে !"

বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "লোকটাকে একবার দেখিয়ে দিতে পারো মনাদা ?"

"অসম্ভব ! কখন কোথায় পাব তাকে, তা কে জানে ?"

"যাক, তারপরে কী হল বলো ?"

"গাড়ি তো গেল বিগড়ে। অত টাকার গয়না নিয়ে ট্যাক্সিতে এতদূর আসতে আর সাহস হল না আমাদের। তার ওপরে খুকুদির ওই অবস্থা। ভবানীপুরে ওঁর মাসির বাড়ি। আমরা ওখানেই গিয়ে উঠলাম। ওঁরাই বড় ডাক্তার ডেকে দিদিমণির পায়ের ব্যবস্থা করালেন। ওই অবস্থায় কিছুতেই ওঁরা আসতে দিলেন না আমাদের। খুকুদি একটু সুস্থ হলে ওঁর কাছ থেকে তোদের ফোন নম্বর জেনে তোকে ফোন করলাম।"

"আমাদের ফোন নম্বর খুকুদি জানলেন কী করে ?"

"বলতে পারব না। তবে মনে হয় কোনও একটা পত্রিকায় তোদের ফোন নম্বরটা নাকি কিছুদিন আগে ছাপা হয়েছিল। খুকুদির মনে ছিল সেটা।"

মা ততক্ষণে ডিশ-ভর্তি জলখাবার, চা ইত্যাদি নিয়ে এসে সকলকে দিলেন।

একটু পরেই বাবাও এসে পড়লেন দুর্গাপুর থেকে। পঞ্চুকে পাওয়া গেছে শুনে তাঁর আর আনন্দের অবধি রইল না।

একটু বেলায় পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই এসে হাজির হল মিত্তিরদের বাগানে। পঞ্চুও সঙ্গে এল।

কোনও শুভ কাজের আগে দেবীদর্শন নিঃসন্দেহে একটি শুভ লক্ষণ। পঞ্চু যে কাল কালীঘাটে গিয়ে মা-কালীকে দর্শন করে এসেছে এতেই ওরা আনন্দিত সকলে।

ভোম্বল বলল, "পঞ্চু আমাদের দীর্ঘজীবী হোক।"

বিলু বলল, "তা হোক। কিন্তু ২২ ফাল্গুন তো এসে গেল। এইবার তোড়জোড় শুরু করা যাক।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। যা করবার এখনই করতে হবে।"

"তোর বাবাও তো ঠিক সময়ই এসে গেছেন। ওঁকেও আর দুর্গাপুরে যেতে দিস না।"

"না, বাবা এখন যাবেন না। কিন্তু পঞ্চুর জন্মদিনে অতিথি আপ্যায়নের কী মেনু হবে কিছু ঠিক করেছিস কী?"

ভোম্বল বলল, "আমি করেছি। শুনে যা তোরা। পঞ্চুর জন্মদিন পালন করা হবে তোদের বাড়ির সামনের মাঠটায়।"

"ওইটুকু জায়গায় হবে ?"

"রাস্তাটাও কিছু সময়ের জন্য নেওয়া হবে। তবে সবসময় তো রাস্তাটা ব্লক করে রাখলে চলবে না। যাই হোক, মণ্ডপ হবে একপাশে। ফুল দিয়ে সাজানো হবে চারদিক। একটা মঞ্চ হবে। সেখানে ভাড়া করা বরের সিংহাসনে ভেলভেটের গদিতে বসে থাকবে পঞ্চু। মাঝে-মাঝে ওকে কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে দেওয়া হবে। প্রথমে ওর স্বজাতিদের খাইয়ে দেওয়া হবে দিনের বেলায়। তারপর রাত্রে হবে আমাদের পালা। পাড়ার সবাই যেমন আসবে, তেমনই থানার ওসি থেকে একজন সাধারণ কনেস্টবলও বাদ যাবে না।"

বিলু বলল, "ওসব কথা রাখ। খাওয়ার মেনুটা কী করেছিস শুনি ?"

"সকালে ভাত, বেগুনি আর পঞ্চুর বন্ধুদের জন্য মুড়িঘন্টর ব্যবস্থা হবে। শেষ পাতে পায়েস। আর রাতের অতিথিদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার মেনুটা হবে অন্যরকম। রাধাবল্লভি, পটলভাজা—।"

বিচ্ছু বলল, "সেরেছে ! ফাল্গুন মাসে পটল তুমি কোথায় পাবে ?"

ভোম্বল জিভ কেটে বলল, "তাই তো রে ! এটা তো খেয়াল করিনি। ঠিক আছে, পটলভাজা না হয় বেগুনভাজা হবে। কাশ্মিরি আলুর দম হবে। তা ছাড়া চিকেন বিরিয়ানি, মাটন চাপ, চাটনি, পাঁপড়ভাজা আর হরেকরকমের মিষ্টি।"

"মিষ্টি কীরকম হবে তবু শুনি ?"

"বর্ধমান থেকে আসবে সীতাভোগ আর সন্দেশ। শক্তিগড় থেকে ল্যাংচা। বাগনানের রাজভোগ আর আমাদের পাড়ার দোকানের রসমালাই।"

বাচ্চু বলল, "আইসক্রিম হবে না ?"

"হতে পারে।"

বিচ্ছু বলল, "কিন্তু এত জায়গা থেকে সব আনবে কে ?"

"ওসবের ব্যবস্থা আমি করব। লোক আছে আমার হাতে। এখন পঞ্চুর ছবি দিয়ে কিছু কার্ড ছাপিয়ে ফেললেই হয় !"

বাবলু এইসব কথাবার্তার ফাঁকেই মাঝেমধ্যে গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল বলে বিচ্ছু বলল, "তুমি কি কোনও কিছু চিন্তা করছ বাবলুদা ? কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছ।"

"হ্যাঁ। আমি ভাবছি অন্য কথা। মনাদা আমাদের বিপদের আশঙ্কা করলেও আমার তো মনে হচ্ছে মনাদার জীবনই না বিপন্ন হয়ে পড়ে !"

ভোম্বল বলল, "কেন ? কেন ? মনাদার জীবন বিপন্ন হবে কেন ? হলে পঞ্চুর হবে। আমাদের হবে।"

বাবলু হেসে বলল, "আমাদের বিপদ তো যে-কোনও সময়ই হতে পারে। কিন্তু মনাদার ব্যাপারেই যে বেশি ভয়। কেননা ওই দুষ্কৃতীকে চিনে ফেলার উনিই একমাত্র সাক্ষী কিনা !"

বিলু বলল, "তুই ঠিক বলেছিস বাবলু। এই ব্যাপারে মনাদাকেও একটু সাবধান করে দেওয়া ভাল।"

পঞ্চুর জন্মদিন ঘিরে যে দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল ওদের মনে, এই আকস্মিক ঘটনায় তারই দুশ্চিন্তার একটা কালো মেঘ কীভাবে যেন ঢুকে পড়ল সবকিছুকে ম্লান করে দিতে।

॥ ৩ ॥

বাবলুর আশঙ্কাই শেষপর্যন্ত বাস্তবে পরিণত হল। এই ঘটনার দিন-দুই পরে একদিন সন্ধেবেলা ভয়ার্ত মনাদা হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির।

বাবলুর ঘরে পঞ্চুকে নিয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের তখন জোর আলোচনা চলছিল। এমন সময় মনাদা এসে বলল, "উঃ, অল্পের জন্য বেঁচে গেলাম রে ভাই !"

বাবলু বলল, "কেন, কী হল ?"

"আর বলিস না, এই একটু আগে আমার বাবুর বাড়িতে কী ভয়ানক ডাকাতিটাই না হয়ে গেল !"

শুনে শিউরে উঠল সবাই, "সে কী !"

"হ্যাঁ। ওদের সঙ্গে সেই লোকও এসেছিল। বাবুকে খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে পিটিয়েছে ওরা। খুকুদি আর মা পাশের বাড়িতে গিয়েছিলেন বলে বেঁচে গেছেন। আমিও ছাদে ছিলাম বলে রক্ষা পেয়ে গেছি। ছাদ থেকে আমি চেঁচামেচি করতেই পাড়ার লোকজন হইহই করে বেরিয়ে পড়ল। ততক্ষণে নগদে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা আর সমস্ত গয়নাগাটি নিয়ে ওরা হাওয়া।"

বিচ্ছু বলল, "সে কী ! বিয়ের জন্য তৈরি করানো সেই গয়নাগুলো ?"

"হ্যাঁ। ওগুলো ভবানীপুরে মাসির বাড়িতেই রেখে এলে হত ! বাড়ি নিয়ে এসেই কাল হল। ওইগুলোর লোভেই তো এসেছিল ওরা।"

বাবলু বলল, "থানা-পুলিশ হয়েছে ?"

"হ্যাঁ। এতক্ষণে নিশ্চয়ই পুলিশও এসে গেছে বাড়িতে। তোমরা কি যাবে ?"

"অবশ্যই।"

বাবলুরা আর একটুও বিলম্ব না করে মনাদার সঙ্গে ভগবানবাবুর বাড়িতে এল। বাবলুদের বাড়ি থেকে বেশ কয়েকটা বাড়ির পরে ওঁদের বাড়ি। একই পাড়ায় বলা যায়। ওরা গিয়ে দেখল পুলিশ তখনও আসেনি। তবে পাড়ার ডাক্তারবাবু এসে বাড়ির মালিককে দেখছেন, ক্ষতস্থান স্টিচ করে মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধছেন।

খুকুদি করুণ মুখে বললেন, "তোমরা এসেছ ভাই ? দ্যাখো না কী কাণ্ডটাই না হয়ে গেল ! মনাদা ছাদের ওপর থেকে চেঁচামেচি না করলে মেরেই ফেলত বাবাকে। সেদিনও তোমাদের পঞ্চু না থাকলে কী হত কে জানে ?"

বাবলু বলল, "মনে হচ্ছে রীতিমত সন্ধান-চোরের কাজ এটা। বাইরের লোক কে বা কারা আসা-যাওয়া করে বলুন তো এখানে ?"

"অনেকেই তো আসা-যাওয়া করে। কাকে সন্দেহ করব ? বাড়ির কাজের লোকজন যারা, তারাও অত্যন্ত বিশ্বাসী। তা ছাড়া এটা তো স্রেফ ডাকাতির ঘটনা।"

"বুঝলাম। কিন্তু ওরা সন্ধানটা পাচ্ছে কী করে ?"

এমন সময় একজন ইনস্পেক্টর কয়েকজন কনস্টেবলকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন। ঢুকে চারদিক তন্নতন্ন করে দেখে তদন্তের সামান্য কাজ সেরে বললেন, "এ-বাড়িতে মনাদা নামের কে আছে ?"

মনাদা বলল, "আমি।"

"তুমি এখানে কী করো ?"

"বাবুর গাড়ি চালাই। এই পাড়াতেই থাকি।"

"তোমাকে একবার থানায় যেতে হবে।"

ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল মনাদার। বলল, "কেন, আমি থানায় যাব কেন ? যারা চুরি-ডাকাতি করে গেরস্তের ক্ষীরটি খেয়ে পালিয়ে গেল, তারা থাকবে মুক্ত বাতাসে আর আমি থাকব থানায় ? আইনটি তো করেছেন বেশ ?"

"তুমি যাবে কি না ?"

বাবলু বলল, "না। উনি যাবেন না।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "দ্যাখো বাবলু, এই ব্যাপারে তুমি কী চিন্তা করছ তা জানি না। তবে ডাকাতদলের দু'জন লোক ধরা পড়েছে আমাদের হাতে। এই বাড়ির ডাকাতির খবর ওয়্যারলেসে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের দু'জন সাদা পোশাকের পুলিশ ওই দু'জনকে ডিউক রোডে

হাতেনাতে ধরে ফেলে। ওরা যখন ডিউক রোডের ধারে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর নীচে অন্ধকারে বসে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করছিল ঠিক সেই সময় ওখানকার দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা পচা জঞ্জালের বিষাক্ত মিথেন গ্যাসের প্রভাবে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ে ওরা। দলে ওরা মোট চারজন ছিল। দু'জন পলাতক। বাকি দু'জন ধরা পড়ে এখন থানার লক-আপে। ওরাই মনাদার নাম বলেছে।"

মনাদা লাফিয়ে উঠল, "মিথ্যে, মিথ্যে। আমি ও-কাজ কখনও করতে পারি না। তা যদি হত তা হলে ওইদিন কলকাতায় গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় পঞ্চুকে আমি কখনওই সঙ্গে নিতাম না। আজও ছাদ থেকে চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করতাম না।"

"ওসব তো বিশ্বাস উৎপাদন করবার জন্য অভিনয়। ঘটনার বিবরণ যা শুনলাম তাতে জানলাম সেদিন যখন দুষ্কৃতীরা বোমা ছোড়ে তুমি তখন নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলে। আজ যখন ওরা ডাকাতি করতে এল, তুমি তখন ছাদে উঠে হাওয়া খাচ্ছিলে। চতুর বেড়াল, এখন তুমি ফাঁদে। থানায় চলো। পরে তোমার ব্যবস্থা হবে।"

ভগবানবাবু হাঁ করে রইলেন। তাঁর স্ত্রী "উঃ মাগো" বলে লুটিয়ে পড়লেন বিছানায়। আর খুকুদি যে কী করবেন, কী বলবেন, কিছু ঠিক করতে পারলেন না।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও নির্বাক! এইরকম বিশ্বাসী লোক শেষপর্যন্ত এই কাজ করল?

মনাদার কিন্তু কোনওরকম ভাবান্তর নেই। শুধু যাওয়ার সময় ওর চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল একবার। বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে মনাদা বলল, "দ্যাখো বাবলু, ভাগ্যবিপর্যয় কেউ রোধ করতে পারে না। কাজেই এখন তোরা কেন, স্বয়ং ভগবানও আমাকে এই লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন না। কাজেই তোদের কাছেও কোনওরকম সাহায্য চাইব না আমি। শুধু জেনে রাখ, মনের জোর আমার সাঙ্ঘাতিক। ধর্মের জয় হবেই। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

মনাদার এই শেষের কথাটা ভাবিয়ে তুলল বাবলুকে।

পুলিশের লোকেরা মনাদার জামার কলার ধরে গাড়িতে ওঠাল।

বাবলুরাও আর সেখানে বসে না থেকে সোজা বাড়ি চলে এল। মনাদার ব্যাপারটা রীতিমত ভাবিয়ে তুলল বাবলুকে। কেননা ওর চোখের দৃষ্টি আর কণ্ঠের বলিষ্ঠতাই জানিয়ে দিল লোকটা সত্যই নিরপরাধ।

সে-রাতে অনেক চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারল না বাবলু। মনাদার ব্যাপারটা নিয়ে মনের মধ্যে কীরকম যেন তোলপাড় করতে লাগল। অবশেষে একসময় ঠিক করল মনাদার ব্যাপারে আসল সত্য উদ্‌ঘাটন করে ওঁকে ছাড়িয়ে আনতেই হবে। সেইসঙ্গে উদ্ধার করতে হবে খুকুদির বিয়ের ওই গয়নাগুলো।

এই ভেবে পরদিন সকালে দলবদ্ধ হয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা রওনা হল থানার দিকে। যাওয়ার পথে একবার খোঁজ করে মনাদার বাড়িতেও এল ওরা। গিয়ে দেখল মনাদার বউ, ছেলেমেয়েরা লজ্জায় মাথা হেঁট করে বসে আছে আর কান্নাকাটি করছে।

মনাদার বউকে সান্ত্বনা দিয়ে বাবলু বলল, "আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আমরা জানি মনাদা খারাপ লোক নন। আমরা ওঁর জামিনের ব্যবস্থা করছি।" বলে বলল, "আচ্ছা, ডাকাতদলের একজন হঠাৎ মনাদার নামটা করল কেন বলতে পারেন?"

"আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ও ওইরকম লোকই নয়।"

মনাদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওরা বড় রাস্তার ধারে যখন এসেছে তখন রায় কেবিন থেকে অনন্তদা হাতছানি দিয়ে ডাকল ওদের। অনন্তদাই দোকানের মালিক। বাবলুরা কাছে গেলে অনন্তদা বলল, "তোদের চোখের সামনে থেকে একজন নিরীহ লোককে পুলিশ উঠিয়ে নিয়ে গেল কাল, অথচ তোরা কেউ কিছুই বললি না?"

"উপায় ছিল না। ধৃতদের একজন মনাদার নাম বলাতেই এই বিপত্তি।"

"নাম বলেছে? ডাকাতরা ওর নাম জানবে কী করে যে বলবে?" বলেই একটু গম্ভীর হয়ে শূন্য দৃষ্টিতে কী যেন চিন্তা করে বলল, "তবে কী—।"

বাবলু বলল, "কী তবে?"

অনন্তদা এদিক-সেদিক তাকিয়ে বাবলুকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে কানে-কানে কী যেন বলতেই বাবলু বলল, "ঠিক আছে। ব্যাপারটা তা হলে এইরকমই হয়েছে। তুমি কি একবার আমার সঙ্গে থানায় যেতে পারবে? দূর থেকে চিনিয়ে দিতে পারবে লোকটাকে!"

"ওরে বাবা! আমার ওসবে বড় ভয় করে। তবে ওর নাম বেচা। চুরি-ছিনতাইয়ের ব্যাপারে ওর যথেষ্ট দুর্নাম আছে।"

বাবলুরা আর একটুও দেরি না করে সোজা থানায় চলে এল। এসে ইনস্পেক্টরকে সব বলতেই উনি বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। একজন হল বেচা, অন্যজন কেনা। ওদের লিডারের নাম হচ্ছে মোহন। তার আর-এক শাগরেদ মদন। এই দু'জনকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। মারের চোটে এই নামগুলো আমরা বের করেছি ওদের মুখ থেকে।"

"যাই হোক, আমরা ওই দু'জনের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

অনুমতি পেয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা বন্দিদের সঙ্গে কথা বলতে গেল। লক-আপের মধ্যে বেচা, কেনা ও মনাদা তিনজনই ছিল।

বাবলু ধৃতদের দিকে তাকিয়ে ওদের মুখগুলো একবার চেনবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। আসলে নতুন আমদানি বোধ হয়। বাবলু ওদের বলল, "তোমরা যে এই মনাদার নাম বলেছ, এঁর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় কতদিনের?"

ওদের একজন ফোঁস করে উঠল, "তা জেনে তোদের কী লাভ?"

ইনস্পেক্টর ধমক দিয়ে উঠলেন, "আছে, আছে। বল শিগ্‌গির।"

বাবলু বলল, "ডুমুরজলার একটি খুনের ব্যাপারে এই মনাদা জড়িয়ে পড়েছেন। তোমরা যখন ওর দলের লোক তখন—।"

মনাদা চেঁচিয়ে উঠল, "মিথ্যে, মিথ্যে। সব মিথ্যে। সবই সাজানো ব্যাপার।"

বাবলু মনাদাকে প্রায় ধমক দিয়ে বলল, "আপনি চুপ করে থাকুন। একটি কথাও বলবেন না।" বলে ইনস্পেক্টর বলল, "সার, ওই মনাদাকে আগে লক-আপ থেকে বের করে আনুন। তারপর আপনার ঘরে নিয়ে গিয়ে বেশটি করে মোচড় দিন, তা হলেই দেখবেন সবার নাম বেরিয়ে যাবে।"

ইনস্পেক্টর তাই করলেন। মনাদাকে ধরে টানতে-টানতে ওঁর ঘরের দিকে নিয়ে যেতেই বাবলু বলল, "মনাদা, কিছু মনে করবেন না। এ ছাড়া উপায় নেই। এসব অভিনয়। আপনি মার খাওয়ার ভঙ্গিতে বাবা রে মা রে করে চেঁচাতে থাকুন, তারপর আবার আপনাকে লক-আপে ঢোকানো হলে আপনি বলবেন ওই দুই আসামি কেনা আর বেচাও জড়িত ছিল।"

অভিনয় ঠিকমতো হল। একটু পরেই মনাদাকে ধাক্কা দিয়ে লক-আপে ঢুকিয়ে দিতেই মনাদা স্বীকার করল ডুমুরজলার খুনের ঘটনায় জড়িত ছিল ওরাও।

বেচা আর কেনা লাফিয়ে উঠল তখন। বলল, "সার, বিশ্বাস করুন. ডুমুরজলার ওই খুনের ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না। এমনকী এই হতচ্ছাড়া লোকটাকেও চিনি না আমরা। সেদিন দুপুরের পর আমরা যখন

রায় কেবিনে চা খাচ্ছি ঠিক সেই সময় একটা কুকুরসমেত এই মনাদা নামের লোকটা দোকানে পা দিয়েই চা-চা করতে লাগল। তা চা দোকানের অনন্তদা বলল, 'ব্যাপার কী রে মনা, তোর এত তাড়া কেন ? তা ছাড়া পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এই কুকুরটা তোর সঙ্গে জুটে গেল কী করে ?' তা মনাদা বলল, 'আর বলো কেন দাদা, জোটাতে হয়নি। আপনিই জুটে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি এক কাপ চা খাইয়ে দাও দিকিনি। একে একটা কেক দাও। খুকুদির বিয়ের হঠাৎ ঠিক হয়ে গেছে। আমাকে এখনই গাড়ি বের করতে হবে। খুকুদিকে নিয়ে কলকাতায় যেতে হবে একবার বিয়ের নেমন্তন্ন করতে। আমনই ফেরার পথে হাজরা মোড়ের জুয়েলারির দোকান থেকে গয়নাগুলোও নিয়ে আসতে হবে। প্রায় এক-দেড় লাখ টাকার গয়না।' এই বলে চা খেয়ে ও চলে যেতেই এই দাঁওটা মারবার জন্য আমরা উঠি পড়ি করে লাগলাম। মদনদা ও মোহনদাকেও জানালাম ব্যাপারটা। যাই হোক, সেদিন ব্যর্থ হলেও কাল আমরা সাকসেসফুল হই। তবে ধরা পড়ার পরে যখন আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হল গয়নার খবর আমরা কীভাবে পেয়েছি তখনই নাম করেছি এই লোকের। কিন্তু কোনও সময়ই আমরা বলিনি ও আমাদের দলের লোক।"

বাবলু ইনস্পেক্টরকে বলল, "আপনি তো নিজের কানে শুনলেন সব, এবার তা হলে নির্দোষ এই মানুষটিকে মুক্তি দিন।"

ইনস্পেক্টর 'সরি' বলে মনাদাকে তখনই ছেড়ে দিলেন।

মুক্তি পেয়ে আনন্দে চোখে জল এসে গেল মনাদার। বলল, "বলেছিলাম না, ধর্মের জয় হবেই।"

ধর্মের জয় সত্যিই হল। কিন্তু মদন ও মোহন নামের ওই দু'জনকে ধরতে না পারলে তো খুকুদির গয়নাগুলো উদ্ধার হয় না। পুলিশ কাল রাত থেকে অনেক চেষ্টা করেও ধরতে পারেনি ওদের।

থানা থেকে বেরিয়ে ওরা যখন বাড়ির দিকে আসছে ঠিক তখনই চেঁচিয়ে উঠল মনাদা, "ওই, ওই তো সেই লোক। বাবলু—।"

ওরা দেখল, একজন লোক দূর থেকে একটা মোটরবাইকে বসে লক্ষ রাখছিল ওদের দিকে। মনাদা চেঁচিয়ে উঠতেই লোকটি একটি বোমা ফাটিয়ে ধোঁয়ার আড়ালে হারিয়ে গেল।

কিন্তু পঞ্চু তো ছাড়বার পাত্র নয়। সে তীরবেগে ধাওয়া করল সেই লোকটাকে। ধোঁয়ার কুণ্ডলির মধ্য দিয়ে পঞ্চুও হারিয়ে গেল চোখের পলকে।

এই মুহূর্তে পাণ্ডব গোয়েন্দারা কী করবে কিছু ভেবে পেল না। এখানে কোনও ট্রাফিক বা অন্য পরিবহণ নেই যা নিয়ে ধাওয়া করবে ওদের পেছনে। বাবলুর স্কুটারও ওর বাড়িতে।

এদিকে থানা থেকে পুলিশের লোকেরাও হইহই করে বেরিয়ে পড়েছে তখন।

বাবলু মনাদাকে বলল, "আপনি পুলিশের সঙ্গে ওদের গাড়িতে আসুন। আমরা ততক্ষণ এগোতে থাকি।" বলেই ছোটা শুরু করল।

বেশিদূর যেতে হল না। একটা বাঁকের মুখেই ওরা দেখতে পেল পঞ্চুর আক্রমণে ধরাশায়ী হয়ে সেই দুষ্কৃতী তখন পথের ধুলোয় পড়ে আছে। আর পঞ্চু বসে আছে তার বুকের ওপর। বাবলুরা যেতেই পঞ্চুকে ধাক্কা দিয়ে উঠে বসতে গেল লোকটি।

বাবলু গম্ভীর গলায় বলল, "অসম্ভব চেষ্টা কোরো না। কী নাম তোমার ? মদন, না মোহন ?"

লোকটি আরও গম্ভীর স্বরে বলল, "ওই বিশ্বাসঘাতক দুটো আমাদের নাম বলে দিয়েছে বুঝি ?"

"হ্যাঁ। না হলে জানব কী করে ?"

"আমার নাম মদন।"

"মোহন তা হলে কোথায় ? গয়নাগুলো কার কাছে ?"

"জানি না। তবে আমার কাছে নেই।"

বলার সঙ্গে-সঙ্গে সবাই মিলে পেটাতে শুরু করল ওকে। দু-চার ঘা পড়তেই মদন বলল, "আসলে কী হয়েছে শোনো। পুলিশের তাড়া খেয়ে আমরা দু'জনে যখন ওগুলো নিয়ে পালাতে যাই তখনই ওই জঞ্জালের গাদায় ধসে পড়ে যাই আমরা। গয়নার অ্যাটাচিটা তখন হাত ফসকে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। ওই অবস্থায় আমি আর সেদিকে নজর না দিয়ে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলেও মোহনদার ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না।"

ততক্ষণে অনেক লোকজন জড়ো হয়ে গেছে সেখানে। গাড়িভর্তি পুলিশও এসেছে। মনাদাও এসেছে সঙ্গে।

পুলিশ এসেই অ্যারেস্ট করল মদনকে।

বাবলুর মুখে সব শুনে ইনস্পেক্টর বললেন, "কই চলো তো, আমরা সবাই গিয়ে দেখে আসি কোথায় কী করেছে ওরা।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশের গাড়ি ডিউক রোডে সেই অভিশপ্ত জায়গাটার সামনে এসে দাঁড়াল। উঃ, কী দুর্গন্ধ সেখানে!

ইনস্পেক্টর বললেন, "কেউ আর এগিয়ো না। আমি কর্পোরেশনে খবর দিই। ওরা এসে যদি কিছুটা জঞ্জাল সরিয়ে উদ্ধার করতে পারে গয়নাগুলো তো করুক।"

মদন বলল, "অসম্ভব। একেবারে চাপা পড়ে গেছে।"

পঞ্চু তখন কারও অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই লাফিয়ে উঠে পড়ল সেই জঞ্জালের গাদায়। তারপর চারদিক তন্নতন্ন করে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে ভৌ-ভৌ করে চেঁচাতে শুরু করল। পরক্ষণেই গয়নাভর্তি সেই অ্যাটাচিটা টানতে-টানতে নিয়ে এল মুখে করে।

ইনস্পেক্টর আবেগে চেঁচিয়ে উঠলেন, "শাবাশ পঞ্চু, শাবাশ।"

কিন্তু পঞ্চু কেন চেঁচাল ?

কয়েকজন কনস্টেবল মুখে রুমাল চাপা দিয়ে গাদায় উঠে দেখল ধসের মধ্যে প্রাণহীন একটি দেহ নিথর হয়ে পড়ে আছে। কোনওরকমে তার পা দুটো ধরে টানতে-টানতে যখন নীচে এল তখন মদনই বলল, "এই আমাদের মোহনদা। আমরা এঁর হয়েই কাজ করতাম।"

মনাদা বলল, "লোভে পাপ। পাপে মৃত্যু।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এর পর পুলিশের গাড়িতে করেই ভগবানবাবুর বাড়িতে এসে খুকুদির হাতে তুলে দিল গয়নাগুলো।

খুকুদি যে আনন্দের উচ্ছ্বাসে কী করবেন কিছু ঠিক করতে পারলেন না। কতরকমের ভাল-ভাল খাবার যে খাওয়ালেন ওদের তার ঠিক নেই। পঞ্চুকে নিজে হাতে সাবান মাখিয়ে স্নান করালেন। কেননা জঞ্জালের দুর্গন্ধ ছিল ওর গায়ে।

মনাদাও এই পরিবারের বিশ্বাস আবার ফিরে পেল।

ওদের ওখান থেকে ফেরার পথে ভোম্বল বলল, "পঞ্চুর জন্মদিনের তা হলে কী হবে বাবলু ?"

বাবলু বলল, "হবেই। তবে কিনা যতটা ঘটা করে হওয়ার কথা ছিল তা আর সম্ভব নয়। কেননা হাতে সময় নেই। শুধু ওর স্বজাতিদের ওইদিন ভরপেট খাইয়েদাইয়েই এই জন্মোৎসব পালন করা হবে।" বলে পঞ্চুকে বলল, "তুই কী বলিস, পঞ্চু ?"

পঞ্চু বোধ হয় উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরিই ছিল। তাই বাবলুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ-ভৌ।"

(সমাপ্ত)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

★ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক সংরক্ষিত

তিন-তিনটি রেকর্ড দেখতে-দেখতে করে ফেলল ইরান ! এবারে প্রাক্-বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল ১৭২ টি দেশ। তার মধ্যে এই রেকর্ড অবশ্যই বলার মতো ঘটনা। ইরানের প্রথম রেকর্ড, ১৭ টি ম্যাচে ৫৭টি গোল করে দেশ হিসেবে তারা 'টপ স্কোরার'। মলদ্বীপের বিপক্ষে ১৭ টি গোল করে একটি ম্যাচে সবচেয়ে বেশি গোল করার রেকর্ডও তাদের। মজার কথা, গত ৬৭ বছরে অর্থাৎ ১৯৩০ সালের পর বিশ্বকাপে এরকম 'রেকর্ড স্কোর' আর কোনও দেশ করতে পারেনি। ইরানের তৃতীয় রেকর্ড, তাদের 'স্টার স্ট্রাইকার' করিম বাঘেরি সব ম্যাচ না খেলেও ১৯ টি গোল করে 'টপ স্কোরার' হয়েছেন। অর্থাৎ বিশ্বকাপের প্রথম পর্বে অন্তত ইরান তাদের দক্ষতা দেখিয়েছে। এবং এই রেকর্ড সঙ্গে নিয়েই এবার বিশ্বকাপের মূলপর্বে ফ্রান্সে খেলতে যাচ্ছে ইরান। সেখানেও চমক দেখাবার প্রস্তুতি অবশ্যই নিচ্ছে ইরান।

নাটকীয়ভাবে এবার বিশ্বকাপের মূলপর্বে উঠেছে ইরান। ২০ বছর পর তারা ফাইনাল পর্যায়ে

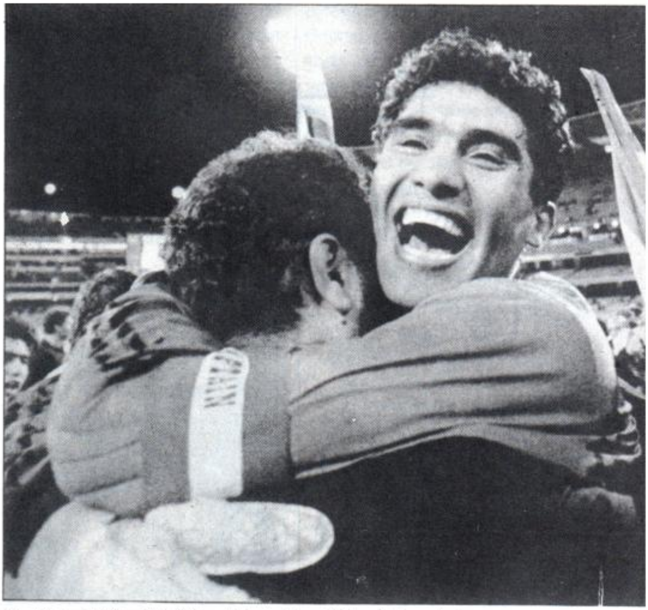

বিশ্বকাপের মূল পর্বে 'কোয়ালিফাই' করার পর আনন্দে মেতে উঠেছেন ইরানের খেলোয়াড়রা

বিশ্বকাপে চমক দেখাবে ইরান

প্রাক্ বিশ্বকাপের খেলায় রেকর্ড করে এবার ফ্রান্সে চমক দেখাতে যাচ্ছে ইরান। লিখেছেন **নির্মল সেন**

খেলছে। তারাই এবারের ৩২ তম তথা শেষ দেশ, যারা ফাইনালে যাওয়ার ছাড়পত্র আদায় করে নিয়েছে একেবারে শেষ মুহূর্তে। দু'বছর ধরে চলা প্রি-ওয়ার্ল্ড কাপের শেষ ম্যাচে উত্তেজনার যাবতীয় উপাদান মজুত ছিল। তেহরানে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রথম পর্বের ম্যাচে ১-১ গোলে খেলা শেষ করে ইরান। ফলে শেষ ম্যাচে চাপে ছিল তারাই, কারণ তাদের খেলতে যেতে হয়েছিল মেলবোর্নে। কিন্তু সেখানে ০-২ গোলে পিছিয়ে থেকেও শেষদিকের মাত্র পাঁচ মিনিটে 'ম্যাজিক' দেখায় ইরান। দুটি গোলই শোধ করে দিয়ে ম্যাচে সমতা ফেরায়। ফলে সব মিলিয়ে 'প্লে.অফ' ম্যাচ ৩-৩ ড্র থাকলেও 'অ্যাওয়ে ম্যাচ'-এ দুটি গোল করার সুবাদে ইরান জিতে যায়। প্রসঙ্গত, ফিফার নিয়মানুযায়ী, অ্যাওয়ে ম্যাচে করা এক গোলকে দু'গোলের সমান ধরা হয়। ইরান বাজিমাত করে মেলবোর্নে দু'গোল করে। তেহরানে অস্ট্রেলিয়া করেছিল এক গোল। অর্থাৎ ম্যাজিক বা চমক দেখিয়েই মূলপর্বে চলে যায় ইরান।

ইরান দলের প্রধান শক্তি তাদের সেরা স্ট্রাইকার করিম বাঘেরি। মিডফিল্ডার হিসেবেও তিনি দারুণ। ২৩ বছরের বাঘেরি 'প্লে-মেকার' হিসেবেই পরিচিত। খেলেন জার্মানির বুন্দেশ লিগায়। ফলে তাঁর খেলায় আছে ইউরোপীয় ঘরানার ফুটবলের ছাপ। ইরানের কোচ ব্রাজিলের ভল্‌দির ভিয়েরার মতে, "ও-ই আমাদের সবচেয়ে দামি ফুটবলার। ও নিজে যেমন খেলে, তেমনই অন্যদের খেলায়। স্ট্রাইকার হিসেবেও বাঘেরি অত্যন্ত দক্ষ। সবচেয়ে বেশি গোল করেই ও প্রমাণ করেছে, গোলটা ওর চেয়ে ভাল কেউই চেনে না।" বাঘেরির প্রশংসা করেছেন বিশ্বখ্যাত অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান কোচ টেরি ভেনেবল্‌স। তাঁর কথায়, "ম্যাচের গতি ও নিয়ন্ত্রিত করে, পাসিং চমৎকার—দূরে, কাছে দুটোতেই চমৎকার।" ইরান দলে বাঘেরি ছাড়াও আছেন খোদাদ আজিজি। তিনিও দারুণ দক্ষ স্ট্রাইকার। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মূলপর্বে ওঠার সোনার গোলটি করেন তিনিই।

ইরান মূলপর্বের প্রস্তুতির জন্য কোচ হিসেবে এখন আর্জেন্টিনার প্রাক্তন জাতীয় কোচ কার্লোস বিলার্দো অথবা হল্যান্ডের প্রাক্তন বিশ্বখ্যাত ফুটবলার যোহান ক্রুয়েফকে চাইছে। আশা করা যায়, এঁদের একজন ইরানের কোচ হলে তাদের শক্তি, সামর্থ্য ও দক্ষতা অনেক বেড়ে যাবে, কারণ দু'জনেই কোচ হিসেবে অত্যন্ত দক্ষ। করিম বাঘেরিও জানিয়েছেন, তিনি তাঁর সেরা খেলা দেখাবেন ফ্রান্সেই। অর্থাৎ সব মিলিয়ে আসন্ন বিশ্বকাপে চমক দেখানোর সব প্রস্তুতিই শুরু করে দিয়েছে ইরান।

ফিরে দেখা : ১৯৯৭

শেষ হয়ে গেল ১৯৯৭। এই বছরটিতে খেলাধুলোয় ঘটে গেছে নানা চমকপ্রদ মনে রাখার মতো ঘটনা। আলোচনা করেছেন প্রতাপ জানা

আর কয়েক ঘণ্টা পরেই বিদায় নেবে ১৯৯৭ সাল। খেলাধুলোর জগতে এই ১৯৯৭ সাল চিহ্নিত হয়ে থাকছে এক নজরকাড়া ও ব্যতিক্রমী বছর হিসেবে। ঘটনাবহুল বছরও এটি। ১৯৯৮ সালে ফ্রান্সে বিশ্বকাপ ফুটবলের মূলপর্বে যে ৩২টি দেশ খেলবে এবং কোন দেশ কার বিপক্ষে খেলবে, তা ঠিক হয়ে গেছে এই বছরই। ১৯৯৭ সালে হয়েছিল কোপা আমেরিকা ফুটবলের খেলা। সারা বছর ধরে ক্রিকেটদুনিয়া ছিল জমজমাট। এ ছাড়া এই ১৯৯৭ সালে হয়েছিল বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়ানশিপ, বিশ্ব টেব্‌ল টেনিস টুর্নামেন্ট, বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ানশিপ ও বিশ্ব জিমনাস্টিক্স প্রতিযোগিতার মতো বড় ধরনের খেলাধুলোর আসর। আর ছিল বিভিন্ন খেলাধুলোর বার্ষিক টুর্নামেন্টগুলিও। স্বাভাবিক নিয়মে উত্থান-পতনের দোলায় এ-বছরও দেখা গেছে, পুরনো ও প্রতিষ্ঠিত তারকাদের মধ্যে কয়েকজনের আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠার পাশাপাশি বেশ কিছু নতুন নায়ক-নায়িকার আবির্ভাব। ভারতীয় ক্রীড়ামানের বিচারে এই ১৯৯৭ সালে আমাদের গর্ব করার মতো কয়েকটি মুহূর্তও আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এবার দেখা যাক জনপ্রিয় খেলাগুলিতে সারা বছরের দলগত ও ব্যক্তিগত সাফল্য এবং পারফরম্যান্স কেমন অবস্থায় আছে।

ফুটবল

ফিফার নতুন নিয়মে ১৯৯৮ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলের মূলপর্বে খেলবে ৩২টি দেশ। বাছাই পর্বের খেলা শেষে ফ্রান্সে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে লাতিন আমেরিকা গ্রুপ থেকে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, প্যারাগুয়ে ও চিলি ; কনকাকাফ গ্রুপ থেকে মেক্সিকো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জামাইকা ; ইউরোপিয়ান গ্রুপ থেকে জার্মানি, হল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম, স্কটল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, রোমানিয়া, বুলগারিয়া, ক্রোয়েশিয়া ও

১৯৯৮-এর বিশ্বকাপ ফুটবলের ম্যাসকট

যুগোস্লাভিয়া ; আফ্রিকান গ্রুপ থেকে মরক্কো, নাইজিরিয়া, তিউনিসিয়া, ক্যামেরুন ও দক্ষিণ আফ্রিকা এবং এশিয়া-ওশেনিয়া গ্রুপ থেকে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সৌদি আরব ও ইরান। ব্রাজিল ও ফ্রান্সকে অবশ্য যোগ্যতাপর্বের খেলা খেলতে হয়নি। সরাসরি মূলপর্বে খেলার সুযোগ পেয়েছে ব্রাজিল—গতবারের চ্যাম্পিয়ান এবং ফ্রান্স—উদ্যোক্তা দেশ। বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের খেলা ছাড়া ১৯৯৭ সালের ফুটবলে বড় টুর্নামেন্ট ছিল কোপা আমেরিকা। প্রত্যাশামতোই ব্রাজিল ফাইনালে বলিভিয়াকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ট্রোফি জয় করেছে। বলিভিয়ায় হয়ে যাওয়া এই কোপা আমেরিকা টুর্নামেন্টে সেরা আবিষ্কার প্যারাগুয়ের গোলরক্ষক জোস লুই চিলাভার্ট, যিনি আবার ফ্রি-কিক থেকে গোল করতে বিশেষ দক্ষ। এই বছরের ফুটবলে আর-এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ব্রাজিলের ২০ বছর বয়সী, সুপারস্টার স্ট্রাইকার রোনাল্ডোর রেকর্ড দামে স্পেনের বার্সেলোনা ক্লাব থেকে ইতালির ইন্টার মিলান ক্লাবে যোগ দেওয়া। ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলে জার্মানির দুটি ক্লাব— বরুশিয়া ডর্টমুন্ড ও স্কালকে ক্লাবের সাফল্যও মনে রাখার মতো। বরুশিয়া ডর্টমুন্ড জিতেছে ইউরোপিয়ান কাপ এবং স্কালকে উয়েফা কাপ।

ক্রিকেট

১৯৯৭ সালে টেস্ট ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়া বেসরকারিভাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওরেল ট্রোফি জয়ের পর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে টেস্ট সিরিজ জিতেছে ২-১-এর ব্যবধানে। এর পর ইংল্যান্ড সফরে জিতেছে অ্যাশেজ সিরিজ। দেশের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জয় করেছে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। দক্ষিণ আফ্রিকা শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে গেলেও ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ জিতে নিজেদের শক্তি প্রমাণ করে দিয়েছে। টেস্ট

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ফোটো : অশোক চক্রবর্তী

ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আর সেই প্রাধান্য নেই। ভারত ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ জিতলেও হেরেছে অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তানের কাছে। ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ জিতেছে নিউজিল্যান্ড সফরে এবং টেস্ট সিরিজ অমীমাংসিত রেখেছে জিম্বাবোয়ের সঙ্গে। নিউজিল্যান্ড চমকে দিয়েছে টেস্ট সিরিজে দেশের মাটিতে শ্রীলঙ্কাকে ২-০-তে হারিয়ে। নিউজিল্যান্ড-জিম্বাবোয়ের টেস্ট সিরিজ ড্র হয়েছে। ড্র হয়েছে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তানের টেস্ট সিরিজও। শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত ভারত-শ্রীলঙ্কার দুটি টেস্টের সিরিজ অমীমাংসিতভাবে শেষ হলেও শ্রীলঙ্কার ব্যাটস্‌ম্যানদের দাপটে তৈরি হয়েছে দুটি নতুন রেকর্ড। সনৎ জয়সূর্য ও রোশন মহানামার জুটিতে ৫৭৬ রান (জুটিতে সর্বাধিক রানের রেকর্ড) এবং দলগত সর্বাধিক রানের ইনিংস— ছ' উইকেটে ৯৫২ রান। জুটিতে এই রেকর্ড সংখ্যক ৫৭৬ করার পথে সনৎ জয়সূর্য একাই জোগান দিয়েছিলেন ৩৪০ রান, যা টেস্টে ভারতীয় উপমহাদেশের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ স্কোরও। একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান শ্রীলঙ্কা এ-বছরও ধরে রেখেছে তাদের দাপট। জিতেছে শারজায় সিঙ্গার-আকাই কাপ, ভারতে ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ এবং দেশের মাটিতে এশিয়া কাপ। একদিনের সিরিজ জিতেছে দেশের মাটিতে ভারতের বিপক্ষে এবং নিউজিল্যান্ডে একদিনের সিরিজ ড্র করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা জিতেছে দেশের মাটিতে স্ট্যান্ডর্ড ব্যাঙ্ক টুর্নামেন্ট ও পাকিস্তানে চতুর্দলীয় টুর্নামেন্ট। কার্লটন অ্যান্ড ইউনাইটেড কাপ জিতেছে পাকিস্তান। অস্ট্রেলিয়া ৪-৩ ম্যাচে একদিনের সিরিজ জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। ইংল্যান্ড জিম্বাবোয়ের বিপক্ষে একদিনের সিরিজে ৩-০-তে বিপর্যস্ত হলেও কিছুটা সম্মান পুনরুদ্ধার করেছে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে একদিনের সিরিজ ড্র করে এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একদিনের সিরিজ জিতে। ভারতের জয় শুধু টরন্টোয় সহারা কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৪-১ ম্যাচে। এই একদিনের সিরিজে ব্যাট ও বলে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। পাকিস্তান অবশ্য এর বদলা নিয়েছে নিজেদের মাটিতে উইল্‌স সিরিজে ভারতকে ২-১ ম্যাচে হারিয়ে। বাংলাদেশ জিতেছে আই সি সি ট্রোফি। এই জয়ের সুবাদে আগামী বিশ্বকাপে খেলার সুযোগও পেয়ে গেছে বাংলাদেশ। কিনিয়া ও স্কটল্যান্ড আগামী বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা পেয়েছে।

ইভান্ডার হোলিফিল্ড

অ্যাথলেটিক্‌স

এবার ষষ্ঠ বিশ্ব অ্যাথলেটিক্‌স চ্যাম্পিয়ানশিপের আসর বসেছিল আথেন্সে। এই আসরে একদল নতুন তারকার আবির্ভাব ঘটলেও একটিও বিশ্বরেকর্ড হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মরিস গ্রিন ও মারিয়ন জোন্স এই আসরে ১০০ মিটারে সোনা জিতে পেয়েছেন যথাক্রমে বিশ্বের দ্রুততম ও দ্রুততমার সম্মান। ২০০ মিটারে সোনা জয় করে ত্রিনিদাদের ওটো বলডন চমক তৈরি করেছেন। পোলভল্টে আবার সোনা জিতেছেন ইউক্রেনের সের্গেই বুবকা। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্‌স চ্যাম্পিয়ানশিপে সোনা জয়ের ডাবল্ হ্যাটট্রিক হল এই প্রবাদতুল্য পোলভল্টারের। হাইজাম্পার জেভিয়ার সোতোমেয়ার ও লংজাম্পার ইভান পেড্রোসো সোনা জিতে প্রমাণ করে দিয়েছেন, দুঃসময় তাঁরা কাটিয়ে উঠেছেন। ৪০০ মিটারে ফ্রান্সের স্টিফেন দিয়াগানা ও ম্যারাথন দৌড়ে স্পেনের অ্যাবেল অ্যানটন বড় আসরে সোনা জিতলেন এই প্রথম। প্রত্যাশা অনুযায়ী নিজের নিজের ইভেন্টে সোনা জিতেছেন উইলসন কিপকেতার, হাইলে গেব্রেসেলাসি, ড্যানিয়েল কোমেন ও উইলসন বয়েট কিপকেতার। মেয়েদের বিভাগে স্প্রিন্ট ইভেন্টে ফুটে উঠেছেন ইউক্রেনের নতুন তারকা ঝান্না পিন্টুসেভিচ— ২০০ মিটারে সোনা ও ১০০ মিটারে রুপো। এর চেয়েও বড় কথা, ২০০ মিটারে মারলিন ওটিকে হারিয়ে শ্রীলঙ্কার ২১ বছরের তরুণী সুশান্তিকা জয়সিংঘের রুপো জয়। কিউবার আনা কুইরত ৮০০ মিটারে সোনা জয় করে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি এখনও ফুরিয়ে যাননি। আথেন্সের আসরে বিশ্বরেকর্ড না হলেও বিশ্বরেকর্ড হয়েছে এর পরে। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের রেকর্ডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরনো রেকর্ড ছিল ৮০০ মিটারে ইংল্যান্ডের সেবাস্তিয়ান কো-র, ১ মিনিট ৪১.৭৩ সেকেন্ড। স্টকহোম গ্রাঁ প্রি-তে কিনিয়ায় জন্ম, ডেনমার্কের দৌড়বাজ উইলসন কিপকেতার স্পর্শ করেছিলেন কো-র সময়কে। জুরিখে ১ মিনিট ৪১.২৪ সেকেন্ড সময় করে উইলসন কিপকেতার ভেঙে দেন কো-র রেকর্ড। কোলনে নিজের রেকর্ড উন্নত করেন ১ মিনিট ৪১.১১ সেকেন্ড। ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ দৌড়ে কিনিয়ার বার্নার্ড বারমাসাই নতুন রেকর্ড গড়েছেন কোলন গ্রাঁ প্রি-তে, সময় ৭ মিনিট ৫৫.৭২ সেকেন্ড। ৫০০০ ও ১০,০০০ মিটার দৌড়ের দুটি রেকর্ডই এ-বছর হাতছাড়া হয়ে গেছে ইথিওপিয়ার দূরপাল্লার দৌড়বীর হাইলে গেব্রেসেলাসির। ব্রাসেল্‌সে ৫০০০ মিটারে নতুন রেকর্ড করেছেন কিনিয়ার ড্যানিয়েল কোমেন (১২ মিনিট ৩৯.৭৪ সেকেন্ড) এবং ১০,০০০ মিটারে কিনিয়ারই পল টেরগাট, ২৬ মিনিট ২৭.৮৫ সেকেন্ড। মেয়েদের ৫০০০ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ড করেছেন চিনা মেয়ে ডং ইয়ানমেই। সময় ১৪ মিনিট ৩১.২৭ সেকেন্ড। বর্ষসেরা অ্যাথলিট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন পুরুষদের মধ্যে উইলসন কিপকেতার ও মেয়েদের বিভাগে মারিয়ন জোন্স। আর অ্যাথলেটিক্‌স জগৎকে বিদায় জানিয়েছেন এই শতাব্দীর অন্যতম সেরা অ্যাথলিট কার্ল লুইস।

টেনিস

১৯৯৭ সালেও বর্ষসেরা টেনিস খেলোয়াড় পিট সাম্প্রাস। গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্টগুলোর মধ্যে পিট

সাম্প্রাস জিতেছেন এবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও উইম্বলডনের খেতাব। এ ছাড়া তিনি আরও দুটি বড় খেতাবও জয় করেছেন, গ্র্যান্ড স্লাম কাপ ও এ টি পি চ্যাম্পিয়ানশিপ। ফরাসি ওপেনে বিজয়ী হয়েছেন গুস্তাভো কুয়েরতেন। আর ইউ এস ওপেনে প্যাট্রিক র‍্যাফটার। ডেভিস কাপ জিতেছে সুইডেন। মেয়েদের বিভাগে প্রায় নিরঙ্কুশ প্রাধান্য দেখা গেছে এ-বছর মার্টিনা হিঙ্গিসের।

বর্ষসেরা মহিলা টেনিস খেলোয়াড় তিনিই। হিঙ্গিস জিতেছেন তিনটি গ্র্যান্ড স্লাম খেতাব সহ মোট ১২টি টুর্নামেন্ট। হিঙ্গিস অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, উইম্বলডন ও ইউ এস ওপেনে চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। আর ফরাসি ওপেনে হয়েছেন রানার্স। ফরাসি ওপেনে বাজিমাত করেছিলেন ইভা মায়োলি। মেয়েদের ফেডারেশন কাপ জিতেছে ফ্রান্স। মেয়েদের টেনিসে এখন ইউরোপেরই জয়জয়কার। জুটির খেলায় এ-বছর ঘটেছে ভারতীয়দের বিরাট উত্থান। ফরাসি ওপেনে জাপানের রিকা হিরাকিকে সঙ্গী করে মহেশ ভূপতি জিতেছেন মিক্সড ডাবল্সের খেতাব। এই মুহূর্তে বিশ্বের চার নম্বর ডাবল্স জুটি লিয়েন্ডার ও মহেশ। ৩৬ নম্বর স্থান থেকে এই জুটি উঠে এসেছে এক বছরের মধ্যে চতুর্থ স্থানে। ১৯৯৭ সালে এই জুটি জিতেছে ছ'টি এ টি পি খেতাব। হার্টফোর্ডে বিশ্ব ডাবল্স চ্যাম্পিয়ানশিপের ফাইনালে মার্কিন জুটি রিক লিচ-জোনাথন স্টার্কের কাছে পরাজিত হয়ে লি-মহেশ জুটি পেয়েছে রানার্সের সম্মান। এই দু'জনের ওপর ভর করে ভারত জিতেছে এশিয়া কাপ।

ব্যাডমিন্টন

বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে চিন এ-বছরও বজায় রেখেছে তার আধিপত্য। অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টনে পাঁচটি খেতাবের মধ্যে চারটি খেতাবই জয় করেছেন চিনের খেলোয়াড়েরা। শুধু পুরুষদের ডাবল্স খেতাব জয় করেছিল ইন্দোনেশিয়ার জুটি। এর চেয়েও উল্লেখযোগ্য ঘটনা, পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গল্স ফাইনালে খেলেছিলেন শুধু চিনারা। পুরুষদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ান হন ডং জিয়ং ও মেয়েদের বিভাগে ইয়ে ঝাওইং। সুদিরমান কাপও জিতেছে চিন। গ্লাসগোয় অনুষ্ঠিত বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ানশিপে পাঁচটি খেতাবের মধ্যে তিনটি জয় করেছে চিন— মেয়েদের সিঙ্গল্স, মেয়েদের ডাবল্স ও মিক্সড ডাবল্সের খেতাব। পুরুষদের সিঙ্গল্সে বিজয়ী হন ডেনমার্কের পিটার রাসমুসেন ফাইনালে চিনের সান জুনকে হারিয়ে। পুরুষদের ডাবল্স জয়

কার্ল লুইস

করে ইন্দোনেশিয়া। মেয়েদের সিঙ্গল্স জয় করেন চিনের ইয়ে ঝাওইং। জাকর্তায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ব্যাডমিন্টনে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন যথাক্রমে সান জুন ও সুসি সুশান্তি।

হকি

১৯৯৭ সালে হকির সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট ছিল চ্যাম্পিয়ান্স ট্রোফির খেলা। ভারত এই টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ পায়নি। অস্ট্রেলিয়ায় আয়োজিত এবারের চ্যাম্পিয়ান্স ট্রোফির খেলায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছে জার্মানি, রানার্স অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যান্ডের মিল্টন কেইনসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জুনিয়ার হকি প্রতিযোগিতায় ভারতের পারফরম্যান্স ছিল নজরে পড়ার মতো। এই টুর্নামেন্টে অস্ট্রেলিয়া হয়েছে বিজয়ী, আর ভারত রানার্স। আগামী দিনের তারকা হিসেবে ফুটে উঠছেন দিলীপ টিরকে, বলজিৎ সিংহ সাইনি ও রাজীব মিশ্র।

টেব্‌ল টেনিস

বিশ্ব টেব্‌ল টেনিসে চিনের জয়ের ধারা এ-বছরও অব্যাহত আছে। ম্যাঞ্চেস্টারে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেব্‌ল টেনিস প্রতিযোগিতায় সাতটি খেতাবের মধ্যে ছ'টি খেতাব জয় করেছে চিন— পুরুষ ও মেয়েদের দলগত খেতাব, পুরুষদের ডাবল্স, মেয়েদের সিঙ্গল্স ও ডাবল্স এবং মিক্সড ডাবল্সের খেতাব। শুধু পুরুষদের সিঙ্গল্স খেতাব হাতছাড়া হয়ে গেছে চিনের। জিতেছেন সুইডেনের বর্ষীয়ান খেলোয়াড় ইয়ান ওভে ওয়াল্ডনার। মেয়েদের সিঙ্গল্স জিতেছেন দেং ইয়াপিং। নিমসে (ফ্রান্স) বিশ্বকাপ টেব্‌ল টেনিস টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন ক্রোয়েশিয়ার জোরান প্রিমোরাক, রানার্স চিনের কং লিঙহুই।

হেভিওয়েট বক্সিং (পেশাদারি)

ওয়ার্ল্ড বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের খেতাব ইভান্ডার হোলিফিল্ডের কাছেই ছিল। ফিরতি লড়াইয়ে মাইক টাইসনকে পরাজিত করে তিনি তা ধরে রেখেছেন। এর পরে মাইকেল মুরারকে হারিয়ে হোলিফিল্ড দখল করেছেন আন্তর্জাতিক বক্সিং ফেডারেশনের খেতাবও। অন্যদিকে অলিভার ম্যাককলকে পরাস্ত করে লেনক্স লুইস জিতেছেন ওয়ার্ল্ড বক্সিং কাউন্সিলের খেতাব। তা রক্ষা করেছেন হেনরি একিন্নানডে ও এন্ড্রু গোলোটাকে হারিয়ে। বক্সিং-দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন একালের প্রবাদতুল্য বক্সার জর্জ ফোরম্যান।

দাবা

গ্যারি কাসপারভের শীর্ষ স্থান এখনও অটুট আছে। দ্বিতীয় স্থানে আছেন বিশ্বনাথন আনন্দ। আনন্দ এ-বছর জিতেছেন হারমানাস, মন্টি কার্লো, বিয়েল চেস টুর্নামেন্টসহ মোট সাতটি প্রতিযোগিতায়। রানার্স হয়েছেন ডর্টমুন্ড চেস টুর্নামেন্টে। বিশ্বের কনিষ্ঠতম গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ফ্রান্সের ১৪ বছর বয়সী তরুণ প্রতিভা এটিনেনে ব্যাককট।

জিমনাস্টিক্স

বিশ্ব জিমনাস্টিক্স চ্যাম্পিয়ানশিপে পুরুষদের দলগত খেতাব জিতেছে চিন ও মেয়েদের বিভাগে রোমানিয়া। এই আসরে সেরা জিমনাস্ট হিসেবে উঠে এসেছেন পুরুষদের বিভাগে বেলারুশের ইভান ইভানকভ ও মেয়েদের বিভাগে রাশিয়ার শ্বেতলানা চোরকিনা।

ভারতের পারফরম্যান্স

টেনিস ও জুনিয়ার হকি ছাড়া ১৯৯৭ সালে ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের আরও কিছু উল্লেখযোগ্য পারফরম্যান্স আছে। ইন্ডিয়ান ওপেন ব্যাডমিন্টনে রানার্স হয়েছেন পুলেলা গোপীচাঁদ। কমনওয়েল্থ টেব্‌ল টেনিসে ডাবল্স খেতাব জয় করেছেন রামন-বাবুর জুটি। প্রতিবন্ধী সাতারু মাসুদ-উর রহমান বৈদ্য ইংলিশ চ্যানেল জয় করেছেন। আর ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দুর্দান্ত ফর্মেই আছেন। সাফ ফুটবলে সোনা জিতেছে ভারত। বিজয়ন ও বাইচুং-এর মধ্যে সেরা কে, প্রশ্ন উঠেছে। চিলিকে হারিয়ে ডেভিস কাপের ওয়ার্ল্ড গ্রুপে টিকে আছে ভারত।

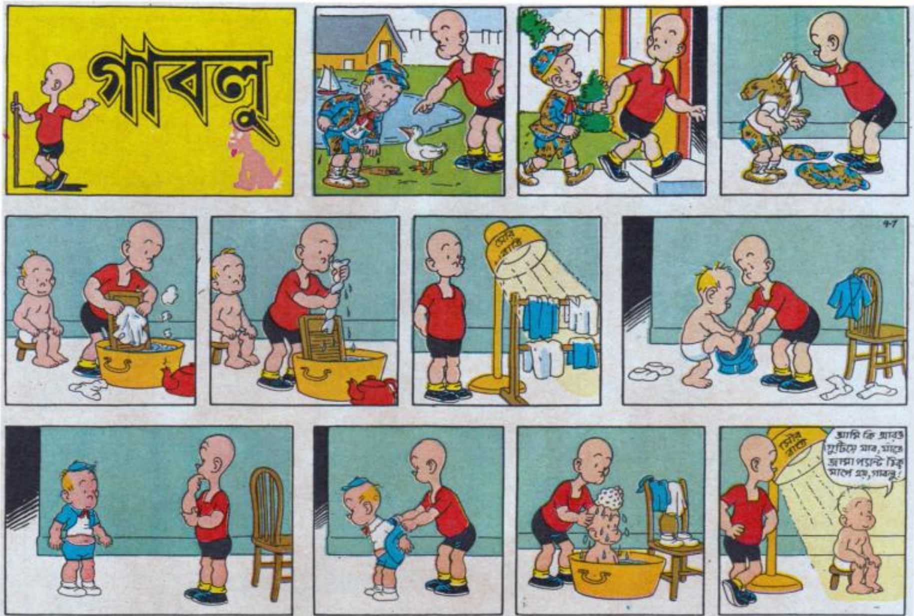
গাবলু
আমি কি আরও গুটিয়ে যাব, যাতে জামা প্যান্ট ঠিক মাপে হয়, গাবলু!

গাবলু
আচ্ছা এখানে দাঁড়িয়ে থাক,
...ছবি তুলব
এভাবেই দাঁড়া
দেখি..... আলো... দূরত্ব...
এবার হচ্ছে!
এক সেকেন্ড
ক্লিক
কী চটপট ক্যামেরায় ছবি ওঠে! আশ্চর্য!

আর্চি
আর্চি, আজকের জমকালো ডিনার পার্টির ব্যাপারে কী ভাবছি বলো তো ?
কী বললে ?
আরে বাবা, ডিনার পার্টি !
শোনো, বসতে হবে সোজা হয়ে, বুঝলে।
আমি আবার ঠ্যাং ছড়িয়ে বসি।
ন্যাপকিন কোলের ওপর পেতে রাখবে, ঘাড়ে গুঁজো না।
কনুই টেবিলে রাখবে না।
ও ! আর হাঁটু দুটো ?
আস্তে করে তুলে নেবে কাঁটা আর চামচ।
আলতোভাবে বাইরে থেকে ধরতে হবে।
ডাইনে-বাঁয়ে সব অতিথির সঙ্গেই কথা বলবে।
আগেভাগে হামলে পড়ে খাবে না।
জাগহেড কোথায় ?
তাই তো ! দেখে আসি বাইরে।
আর্চি, সাধারণ খাওয়াতেই শান্তি।
6-23

মাধ্যমিকের লেখাপড়া

ভৌতবিজ্ঞান
পদার্থবিদ্যা

চতুর্থ পর্ব

অজয় চক্রবর্তী

অধ্যাপক, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(গত সংখ্যার পর)

● **নিউটন এবং ডাইনের সংজ্ঞা :** যে-বল এক গ্রাম ভরবিশিষ্ট বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে 1 cm/s^2 ত্বরণ উৎপন্ন করে সেই বলকে 1 ডাইন বলা হয় (চিত্র ১)। এটি বলের সি. জি. এস. একক।

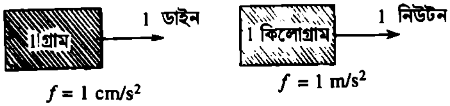

চিত্র ১ : বলের সি. জি. এস একক　　**চিত্র ২ : বলের এস. আই. একক**

যে-বল এক কিলোগ্রাম ভরবিশিষ্ট বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে 1 m/s^2 ত্বরণ উৎপন্ন করে তাকে 1 নিউটন বলা হয়।

সংজ্ঞানুসারে, 1 নিউটন = 1 কিলোগ্রাম × 1 মিটার/সেকেন্ড^2

$= 10^3$ গ্রাম × 10^3 সেন্টিমিটার/সেকেন্ড^2

$= 10^5$ × গ্রাম-সেন্টিমিটার/সেকেন্ড^2

$= 10^5$ ডাইন

সুতরাং, **1 নিউটন = 10^5 ডাইন**

● **বলের অভিকর্ষীয় একক—কিলোগ্রাম-বল :** 45° অক্ষাংশে গড় সমুদ্রতলে 1 কিলোগ্রাম ভরবিশিষ্ট কোনও বস্তুকে পৃথিবী যে-বলে আকর্ষণ করে, সেই বলকে এক **কিলোগ্রাম-ভার** বলা হয়। এই বলকে **কিলোগ্রাম-বলও** বলা হয়।

● **রৈখিক ভরবেগের নিত্যতা সূত্র :** বাহ্যিক বল অনুপস্থিত থাকলে (অর্থাৎ, বস্তুসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ছাড়া অন্য কোনও বল না থাকলে) কোনও বস্তু-সংহতির মোট ভরবেগ সর্বদা ধ্রুবক থাকে। একে 'রৈখিক ভরবেগের নিত্যতা সূত্র' বলা হয়।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হ্রস্বোত্তর প্রশ্ন

(১) কোনও বস্তুর বেগ শূন্য হলে তার ত্বরণ থাকতে পারে কি ? দৃষ্টান্তসহ উত্তর দাও।

কোনও বস্তুর বেগ শূন্য হলেও তার ত্বরণ থাকা সম্ভব। কোনও নির্দিষ্ট প্রারম্ভিক বেগে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত কোনও বস্তু যখন ওপরে উঠতে থাকে, তখন অভিকর্ষের টানে তার বেগ ধীরে-ধীরে হ্রাস পেতে থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত উঠে মুহূর্তের জন্য বস্তুটি স্থির হয়। এর পর বস্তুটি নীচে নামতে থাকে। উৎক্ষিপ্ত বস্তুটি অভিকর্ষ বলের অধীন বলে এর ত্বরণ অভিকর্ষজ ত্বরণের সমান। যে-মুহূর্তে বস্তুটি স্থির অবস্থায় আসে সেই অবস্থায় এর বেগ শূন্য, কিন্তু তখনও বস্তুটির ত্বরণ অভিকর্ষজ ত্বরণের সমান।

(২) কোনও বস্তুর বেগ ধ্রুবক হলে তার দ্রুতি পরিবর্তনশীল হতে পারে কি ?

কোনও বস্তুর বেগ ধ্রুবক হওয়ার তাৎপর্য এই যে, সময়ের সঙ্গে এর বেগের মান এবং অভিমুখ—এদের কোনওটিরই পরিবর্তন হয় না। বস্তুটির বেগের মান ধ্রুবক হলে এর দ্রুতির বা প্রতি সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্বের কোনও পরিবর্তন হতে পারে না। কাজেই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, কোনও বস্তুর বেগ ধ্রুবক হলে তার দ্রুতি পরিবর্তনশীল হতে পারে না।

(৩) কোনও বস্তুর দ্রুতি ধ্রুবক হলে তার বেগ পরিবর্তনশীল হতে পারে কি ?

দ্রুতি স্থির রেখে কোনও বস্তু যখন তার গতির অভিমুখের পরিবর্তন ঘটায় তখন তার দ্রুতি ধ্রুবক হলেও বেগ পরিবর্তনশীল। উদাহরণস্বরূপ, যখন কোনও বস্তু সমদ্রুতিতে একটি বৃত্তপথে ঘোরে, তখন প্রতি মুহূর্তে ওই বস্তুর বেগের পরিবর্তন ঘটে।

(৪) কোনও বস্তুর দ্রুতি ধ্রুবক হলে তার ত্বরণ থাকতে পারে কি ?

দ্রুতি ধ্রুবক হলেও বেগ পরিবর্তনশীল হতে পারে। বেগের পরিবর্তনই ত্বরণ। কাজেই, দ্রুতি ধ্রুবক হলেও কোনও বস্তুর গতি ত্বরিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কোনও বস্তু যখন সমদ্রুতি নিয়ে কোনও বৃত্তপথে ঘোরে, তখন ওই বৃত্তপথের কেন্দ্রাভিমুখে বস্তুটির ত্বরণ ঘটে।

(৫) বেগ এবং দ্রুতির পার্থক্য কী কী ?

(i) সময়ের সঙ্গে কোনও বস্তুর সরণের হারকে তার 'বেগ' বলা হয়। আর, কোনও বস্তু প্রতি একক সময়ে যে-দূরত্ব অতিক্রম করে তা-ই বস্তুটির 'দ্রুতি'।

(ii) বেগ একটি ভেক্টর রাশি, কিন্তু দ্রুতি একটি স্কেলার রাশি।

(iii) বেগ স্থির থাকলে কোনও বস্তুর দ্রুতির পরিবর্তন হতে পারে না, কিন্তু দ্রুতি স্থির থাকলে কোনও বস্তুর বেগের পরিবর্তন হতে পারে।

(৬) বায়ুশূন্য স্থানে পাখি উড়তে পারে না কেন ? [মাধ্যমিক (ত্রিপুরা), 1983]

পাখি ডানার সাহায্যে বায়ুতে তির্যগ্‌ভাবে বল প্রয়োগ করে। এতে বায়ুও পাখির ডানার ওপর প্রতিক্রিয়া-বল প্রয়োগ করে। এই প্রতিক্রিয়া বলের **উল্লম্ব উপাংশ** পাখির ওজনকে প্রতিমিত করে পাখিকে আকাশে ভাসিয়ে রাখে। বায়ুর প্রতিক্রিয়ার অনুভূমিক উপাংশ পাখিকে বায়ুর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। বায়ুশূন্য স্থানে পাখি ডানা ঝাপটালেও কোনও প্রতিক্রিয়া বলের সৃষ্টি হত না। এই কারণেই বায়ুশূন্য স্থানে পাখি উড়তে পারে না।

(৭) ঘোড়া যখন গাড়ি টানে তখন গাড়িও ঘোড়াকে সমান এবং বিপরীতমুখী বলে টানে। তাহলে ঘোড়ার গাড়ি চলে কেমন করে ?

ঘোড়া এবং গাড়ির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ঘোড়ার গাড়ি চলে না, কেননা কোনও সংস্থার অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে ওই সংস্থার ভরবেগের পরিবর্তন ঘটে না। কেবলমাত্র বাহ্যিক বলের ক্রিয়াতেই কোনও সংস্থার ভরবেগের বা বেগের পরিবর্তন ঘটতে পারে।

ঘোড়া তির্যগ্‌ভাবে ভূমির ওপর বল প্রয়োগ করে। ভূমিও ঘোড়ার ওপর সমান এবং বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া-বল প্রয়োগ করে। এই বলের (ভূমির

প্রতিক্রিয়ার) অনুভূমিক উপাংশের প্রভাবেই ঘোড়া এবং গাড়ির ত্বরণ ঘটে।

(৮) একটি বোমা স্থির অবস্থায় ফেটে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। বোমার ছোট টুকরোটির ভর সমগ্র বোমার ভরের এক-তৃতীয়াংশ। বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন টুকরোদুটির বেগের অনুপাত নির্ণয় করো।

মনে করি, বোমাটির ভর ছিল m। কাজেই, বোমার ছোট টুকরোটির ভর (m/3) এবং বড় টুকরোটির ভর (2m/3)। ধরি, বিস্ফোরণের ফলে প্রথম টুকরোটি v_1 বেগ এবং দ্বিতীয় টুকরোটি v_2 বেগ লাভ করে।

বোমাটি প্রথমে স্থির অবস্থায় ছিল। অর্থাৎ, বোমার প্রাথমিক ভরবেগ = 0

কাজেই, ভরবেগের নিত্যতা সূত্র থেকে লেখা যায়,

$$\frac{m}{3} \times v_1 + \frac{2m}{3} \times v_2 = 0$$

বা, $v_1 + 2v_2 = 0$

বা, $\frac{v_1}{v_2} = -2$

অর্থাৎ, ছোট টুকরোটির বেগ বড় টুকরোটির বেগের দ্বিগুণ হয়, ঋণাত্মক চিহ্নটির তাৎপর্য এই যে, বোমার টুকরো দুটির বেগ পরস্পর বিপরীতমুখী।

(৯) 100 কিলোগ্রাম ভরবিশিষ্ট একটি গাড়ি সেকেন্ড 10 m/s বেগে চলছে এবং অন্য একটি 250 কিলোগ্রাম ভরের একটি গাড়ি 3 m/s বেগে চলছে। একই সময়ের মধ্যে থামাতে হলে কোন গাড়িটির ক্ষেত্রে বেশি বলের প্রয়োজন হবে ?

প্রথম গাড়িটির ভরবেগ = (100 kg) x (10 m/s)
= 1,000 kg. m/s

এবং দ্বিতীয় গাড়িটির ভরবেগ = (250 kg) x (3 m/s)
= 750 kg. m/s

দেখা যাচ্ছে যে, দ্বিতীয়টির তুলনায় প্রথম গাড়িটির ভরবেগ বেশি। কাজেই, একই সময়ের মধ্যে গাড়ি দুটিকে থামাতে হলে প্রথম গাড়ির ভরবেগের পরিবর্তনের হার তুলনামূলকভাবে বেশি হয়। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে, ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক হয়। সুতরাং, একই সময়ের মধ্যে গাড়ি দুটিকে থামাতে হলে প্রথম গাড়িটির ক্ষেত্রেই তুলনামূলকভাবে বেশি বলের প্রয়োজন হয়।

(১০) *a* কিলোগ্রাম ভরবিশিষ্ট বস্তুর ওপর *t* সেকেন্ড সময় ধরে *b* নিউটন বল ক্রিয়া করলে বস্তুটির বেগ কত হবে ?

a কিলোগ্রাম ভরবিশিষ্ট কোনও বস্তুর ওপর *b* নিউটন বল ক্রিয়া করলে বস্তুটির ত্বরণ *f* হলে লেখা যায়,

$$f = \frac{\text{বল}}{\text{ভর}} = \frac{b \text{ নিউটন}}{a \text{ কিলোগ্রাম}} = \frac{b}{a} \text{ m/s}^2$$

t সময় পরে বস্তুটির বেগ *v* হলে লেখা যায়,

$$v = ft = \frac{b}{a} \times t \text{ m/s} = \frac{bt}{a} \text{ m/s}$$

(১১) ক্যাচ ধরার সময় ক্রিকেটার তার হাত কিছুটা সরায় কেন, ব্যাখ্যা করো।

ছুটন্ত ক্রিকেট-বলকে যত দ্রুত থামানো যায় তার ভরবেগের পরিবর্তনের হার তত বেশি হয়। ফলে ক্রিকেটারকে ক্রিকেট-বলটির ওপর তত বেশি বল প্রয়োগ করতে হয়। ক্রিকেট-বলকে ধরার সময় হাত কিছুটা পেছনে সরালে ক্রিকেটার বলটিকে বেশি সময় ধরে থামানোর সুযোগ পায়। এতে

কোনও বস্তুর বেগ ধ্রুবক হওয়ার তাৎপর্য এই যে, সময়ের সঙ্গে এর বেগের মান এবং অভিমুখ—এদের কোনওটিরই পরিবর্তন হয় না। বস্তুটির বেগের মান ধ্রুবক হলে এর দ্রুতির বা প্রতি সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্বের কোনও পরিবর্তন হতে পারে না।

ক্রিকেট-বলের ভরবেগের পরিবর্তনের হার কম হয় এবং ক্রিকেট-বলটির ওপর অপেক্ষাকৃত কম বল প্রয়োগ করতে হয়। এতে হাতের ওপর ক্রিকেট-বলের প্রতিক্রিয়াও কম হয়। ফলে হাতে চোট লাগার আশঙ্কা হ্রাস পায়।

(১২) 10 গ্রাম ভরের একটি বস্তুর ওপর একটি বল ক্রিয়া করায় 5 সেকেন্ড সময়ে বস্তুটি স্থির অবস্থা থেকে 15 cm/s বেগ লাভ করল। বস্তুটির ত্বরণ, ভরবেগ এবং বলটির মান নির্ণয় করো।

বস্তুটির প্রাথমিক বেগ, $u = 0$ cm/s

5 সেকেন্ড পরে বস্তুটির বেগ, $v = 15$ cm/s

কাজেই, বস্তুটির ত্বরণ, $f = \frac{\text{বেগের পরিবর্তন}}{\text{সময়}} = \frac{15 \text{ cm/s}}{5 \text{ s}}$
$= 3 \text{ cm/s}^2$

আমরা জানি যে, বল (P) = ভর $(m) \times$ ত্বরণ (f)

এখানে $m = 10$ g, $f = 3 \text{ cm/s}^2$। সুতরাং, বস্তুটির ওপর ক্রিয়াশীল বল,

$P = (10 \text{ g}) \times (3 \text{ cm/s}^2) = 30$ ডাইন

বস্তুটির অন্তিম ভরবেগ = ভর (m) × বেগ (v)
$= (10 \text{ g}) \times (15 \text{ cm/s}) = 150$ g.cm/s

(১৩) একটি গাড়ি দুটি স্টেশনের মধ্যবর্তী দূরত্বের প্রথমার্ধ 40 km/hr দ্রুতিতে এবং পরবর্তী অর্ধাংশে 60 km/hr দ্রুতিতে অতিক্রম করে। গাড়িটির গড় দ্রুতি কত ?

মনে করি, দুটি স্টেশনের মধ্যবর্তী দূরত্ব = 2x কিলোমিটার

গাড়িটি 40 km/hr দ্রুতিতে প্রথম x কিলোমিটার যেতে সময় নেয়,

$t_1 = \frac{x}{40}$ ঘন্টা

এবং 60 km/hr দ্রুতিতে পরবর্তী x কিলোমিটার যেতে সময় নেয়,

$t_2 = \frac{x}{60}$ ঘন্টা

কাজেই, দুই স্টেশনের মধ্যবর্তী 2x কিলোমিটার অতিক্রম করতে ট্রেনটি সময় নেয়,

$$t = t_1 + t_2 = \left(\frac{x}{40} + \frac{x}{60}\right) \text{ ঘন্টা} = \frac{x}{24} \text{ ঘন্টা}$$

সুতরাং, ট্রেনটির গড় দ্রুতি,

$$= \frac{\text{মোট দূরত্ব}}{\text{মোট সময়}} = \frac{2x}{(x/24)} \text{ km/hr}$$
$$= 48 \text{ km/hr}$$

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

মাধ্যমিকের লেখাপড়া

ইংরেজি চতুর্থ পর্ব

রণধীর ভট্টাচার্য

প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক, হিন্দু স্কুল

(গত সংখ্যার পর)

Joining of sentences with relative pronouns or connectives:

Example: (i) Join the following sentences with a participle (a) The stranger received no answer. He knocked a second time.
Ans: Receiving no answer, he knocked a second time.
(b) I saw a girl. She was carrying a basket of flowers.
Ans: I saw a girl carrying a basket of flowers.
(c) The peasant worked hard. He felt tired
Ans: Having worked hard, the peasant felt tired (d) A girl was drowning.She shouted for help.
Ans. A drowning girl shouted for help.
(a) The sun rose. The fog dispersed. (By using absolute phrase.)
Ans. The sun having risen, the fog dispersed.
(b) The weather was fine. Miss Stock went for a walk.
Ans. The Weather being fine, Miss Stock went for a walk.
(c) The work was done. We returned home.
Ans. The work having been done, we returned home.

Combine each set of sentences into one simple sentence by using participles or absolute phrase.
(a) David saw the snake. He ran away.
(b) Mr. Bose saw a lame lady. She was carrying a load on her head.
(c) The game was over. They left the field.
(d) The police arrived. The dacoits fled away.
(e) Somen was very tired. He fell asleep.
(f) The dinner was over. The guests left the hall.

Join each set of the following sentences with the linking word or words in the brackets:
(a) He did not write. He did not telephone too. (neither/nor)
(b) He is ill. His brother also is ill. (as well as).
(c) You should be careful. You may get into trouble. (If).
(d) He said something. I did not hear. (what)
(e) The house is under construction. It belongs to me. (which)
Ans: (a) Neither did he write, nor telephoned.
(b) He as well as his brother is ill.
(c) If you are not careful, you may get into trouble.
(d) I did not hear what he said.
(e) The house which is under construction belongs to me.

Join the following set of sentences as directed
(a) We saw a famous actor on T.V. last night. What's his name? (Join using a relative clause)
(b) Mr. Shome tells jokes. We didn't like them (join using a relative clause)
(c) Harry will go to colorado. He says so. (Join using a nominal clause)
(d) The village is prosperous. It is on the bank of a river. (use a relative pronoun).
(e) The letter came this morning. It is from my father. (use a relative pronoun)
(f) The woman is sitting at the table. She is the President's wife. (use relative pronoun)

Replace the underlined word/words by the correct forms of phrasal verbs given below:

Example.
(a) He continues with his studies further.
(b) The President is busy distributing prizes.
(c) The enemy did not surrender easily.
(d) Find out the word in the dictionary.
List of Phrasal verbs: give in, look up, carry on, give away.
Ans: (a) carries on, (b) giving away, (c) gave in (d) look up.
Example: (i) They will establish a school in the village.
(ii) Maintain national custom.
(iii) The price of rice has reduced recently.
(iv) I shall stay at a hotel in Puri.
List of phrasal verbs: keep up, put up, set up, come down.
Ans: (a) set up, (b) keep up, (c) come down, (d) put up.

Use the following phrasal verbs in the gaps of the sentences to make them meaningful:
(i) The winter has — early this year.
(ii) Tagore — a university at Santiniketan.
(iii) Henry — to collect all the wisdom in the world.
(iv) The mischievous boys — fire just behind the old man.

List of phrasal verbs: set out, set in, set up, set off.

Fill in the blanks with correct forms of phrasal verb to make the sentences meaningful:

(i) How did you — this pen?

(ii) There is none to — The child.

(iii) He — the Madhyamik Pariksha last year.

(iv) You must — for the loss.

(v) The rainy season has —.

List of phrasal verbs: make up, sit for, set in, come by, look after.

Fill in the blanks with appropriate phrasal verbs from the list given below.

(i) You should not — the poor.

(ii) His appeal was —.

(iii) I — him yesterday.

(iv) — such an insult was impossible for an educated man.

List of phrasal verbs given: look down upon, put up with, turn down, come across.

"Writing- Skill"- এ মোট নম্বর 40. এই Section-এ বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন প্রস্তুত করতে হবে। যেমন, Paragraph writing, letters, story-writing, reports, describing a process, flow-chart, dialogues and conversation ইত্যাদি।

Writing application.

(1) Recently there has been a scarcity of drinking water in your school. Write an application to the Headmaster informing him of your difficulties.

Ans.

To
The Headmaster......
.....
....

Subject: Scarcity of drinking water.

Respected Sir,
With due respect I like to inform you that for a few days, we don't get drinking water in the school. The pump man tells us that the pumping machine is out of order. The drinking-water that we bring from home is quite insufficient.
So, I request you to please make arrangement for supplying drinking water to the students at an early date.
With best regards.
Date....Your most obedient pupil

XYZ

(2)The following advertisement is published in a newspaper:

Learn drawing, dancing and music. Write to the Secretary—Kalamandir, 6 Cathedral Road, Calcutta-19.

Choose one item and write a letter to the Secretary asking the following information.

(a) Duration of the course.
(b) Fees to be paid.
(c) Teaching Staff.
(d) Whether recognised by Government.
(e) If a certificate is given at the end of the course.

Joining of sentences-এর ক্ষেত্রে সবসময় খেয়াল রাখবে, কীভাবে join করতে বলা হয়েছে। relative pronoun দিয়ে join করতে বলা হয়, কখনও বা participle দিয়েও join করতে হতে পারে। এ ছাড়া absolute phrase, relative clause বা linking word দিয়েও join করতে বলা হয়। কীভাবে join করবে, সেটা ভাল করে পড়ে তবে উত্তর লিখতে শুরু করা দরকার।

Phrasal verb-এর ক্ষেত্রে অনেক সময় preposition-এর গোলমাল হয়ে যায়। যেমন, 'Set off' লিখতে গিয়ে কেউ-কেউ 'Set in' বা 'Set out' লিখে বসে। এ-ক্ষেত্রে কিন্তু নম্বর পাওয়া যাবে না। Phrasal verb ভাল করে মুখস্থ রাখা এ-কারণেই অত্যন্ত জরুরি। যে-কোনও ভাল grammar বইয়ে Phrasal verb-এর list পেয়ে যাবে। আর Question Bank থেকে পুরনো প্রশ্নপত্র সমাধান করতে পারো।

Notice Writing

The Secretary,
Kalamandir,
6 Cathedral Road,
Calcutta-19

Dear Sir,

In response to the advertisement in the Statesman on 15th November, I like to inform you that I intend to learn drawing. Please give me the following information at an early date.

(1) Duration of the course.

(2) Fees to be paid.

(3) Teaching staff.

(4) Whether recognised by government.

(5) If a certificate is given at the end of the course.

Please enlist my name as a student for learning 'drawing'.

Thanking you,
Yours faithfully,
XYZ

Address:
Date:

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

মাধ্যমিকের লেখাপড়া

বাংলা তৃতীয় পর্ব

নিখিল সরকার

প্রাক্তন অধ্যাপক, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

(গত সংখ্যার পর)

(ii) **কবিতাটির ভাবসত্য :**

ঈশ্বর করুণাময়। দেবতার অধিষ্ঠান মন্দিরে বা মসজিদে নয়। তিনি সর্বত্র বিরাজ করেন। যেখানে ঐশ্বর্যের অহঙ্কার, ক্ষমতার দম্ভ, সেখানে তিনি থাকেন না। তিনি থাকেন যেখানে 'চাষা' মাটি ভেঙে চাষ করছে, যেখানে মানুষ রোদ-জলে সবার সাথে পাথর ভেঙে পথ কাটছে, বারো মাস খেটে চলেছে, যারা সর্বহারা, নানাভাবে উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত, সেখানেই তাঁর চরণধ্বনি শোনা যায়। নরের মধ্যেই নারায়ণের অধিষ্ঠান। জীব-সেবাই, ঈশ্বর-সেবা। যে মানুষ পরের দুঃখ দেখে কাতর হয় না, যার মধ্যে প্রেম, সহানুভূতি, দয়ার অভাব, সেই আত্মসর্বস্ব, অহঙ্কার মত্ত মানুষ কখনও দেবতার প্রকৃত মহিমা অনুভব করতে পারে না। কারণ, সত্য-দয়া-প্রেম-শান্তিই ঈশ্বরের চিরন্তন ঘর। রাজা বিশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে তৈরি করেছেন বিশাল এক মন্দির। স্বর্ণ-সিংহাসনে স্থাপন করেছেন রত্নময় বিগ্রহ। তিনি ভেবেছিলেন, ঐশ্বর্যের কাছেই দেবতা ধরা দেন। ঐশ্বর্য আর অহঙ্কার দিয়েই তিনি জগতের দেবতাকে ধরতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝতেই পারেননি, দেবতার প্রকাশ আত্মপীড়িত-অসহায়-দুঃখী মানুষের মাঝেই। তিনি যে দীনবন্ধু ! অথচ রাজা এই চিরন্তন সত্যটিই উপলব্ধি করতে পারেননি। তিনি ছিলেন হৃদয়হীন, আচারসর্বস্ব সংস্কারের ক্রীতদাস। যে বছর তিনি বহু অর্থব্যয়ে বিশাল মন্দির নির্মাণ করলেন, সে বছরই বিশ হাজার প্রজা এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে গৃহহীন, আশ্রয়হীন ও অন্নবস্ত্রহীন হয়। রাজার কাছে কাতর প্রার্থনা নিয়ে তারা ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু নির্মমহৃদয় রাজার কাছে সব কাকুতি মিনতি ব্যর্থ হয়। তারা গুহায়, অরণ্যে, পথের প্রান্তে, ভাঙা মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিল। রাজার ধর্ম প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ। তিনি সেই ধর্মের কথা ভুলে গিয়ে তৈরি করলেন স্বর্ণচূড়া এক বিশাল মন্দির। রাজদম্ভে-পূর্ণ সেই মন্দিরে প্রকৃতপক্ষে রাজা নিজেকেই স্থাপন করেছেন, 'জগতের দেবতারে নহে।' দীন দুঃখী প্রজাদের অবজ্ঞা করে দয়াল দেবতাকে মণিময় দেবালয়ে স্থাপন করতে চাওয়া—অজ্ঞতারই অন্য নাম। রাজার অন্তর দম্ভে, ক্ষমতায়, অন্ধ তামসিকতায় আচ্ছন্ন ছিল বলেই জ্যোতির্ময় দেবতা তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন।

২। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : (যে কোনও দুটির উত্তর দিতে হবে)**

ক। 'আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া/উল্লাসে কারে যাচে রে।' —কী দেখে কবির প্রাণ আকুল হয়েছে এবং কীভাবে তিনি তাঁর মনের উল্লাস ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, লেখো।

উত্তর : (i) বর্ষা ঋতুর সমাগমে আকাশের বুকে জমেছে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ। তাই দেখে কবির মন উল্লসিত হয়ে উঠেছে।

(ii) গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ দিনের অবসান হয়েছে নববর্ষার আগমনে। আকাশের বুকে সজল মেঘের আনাগোনা। তাই দেখে কবির মন সৃষ্টির আনন্দে অস্থির, উদ্বেল। ময়ূরের শতকলাপ বিস্তারে তাঁর নাচতে ইচ্ছা করছে। তাঁর মনে অদ্ভুত এক ভাললাগার আবেশ। কবি যেন আজ নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। অঙ্কুরিত তৃণের মাসে, বিকশিত কদম্ব কুঞ্জে, বাদলের রাগিণীতে, বর্ষাবধূর দোল খাওয়ার আনন্দে, ঝরকে-ঝরকে ঝরা বকুলের বিন্যাসে, অরণ্যের শ্যামলিমায়, মেঘের গুরু গুরু গর্জনে, দাদুরীর ডাকে তিনি একাত্ম হয়ে গেছেন। বর্ষাঋতুর প্রিয় অনুষঙ্গ চিত্র কবিকে সুদূরের অভিসারী করে তুলেছে।

খ। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'— উক্তিটি কার এবং কার কাছে ? কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি ? উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

উত্তর : (i) উক্তিটি গাঙ্গিনী নদীর খেয়া পারাপারকারী ঈশ্বরী পাটনীর।

(ii) দেবী অন্নপূর্ণার কাছে তিনি এই প্রার্থনা করেছিলেন।

(iii) **প্রার্থনার প্রসঙ্গ :**

সন্ধ্যাকালে এক কুলীন রমণী গাঙ্গিনী নদীর খেয়াঘাটে এলেন। সেই ঘাটে ঈশ্বরী পাটনী খেয়া দেন। কুলরমণী অপর পারে যেতে চাইলেন। ঈশ্বরী পাটনী তাঁর প্রকৃত পরিচয় না জেনে পার করবেন না জানালেন। দ্ব্যর্থ ভাষায় কুলকামিনী তাঁর পরিচয় দিলেন। ঈশ্বরী পাটনী তাঁর নিজের মতো করে বুঝে নিলেন, রমণী কুলীন ঘরের কুলবধূ। কোন্দল করে ঘর ছেড়েছেন। কিন্তু নৌকায় আরোহণের পর ঈশ্বরী বুঝলেন যে, কুলীন রমণী সাধারণ যাত্রিণী নন। তাঁর পায়ের ছোঁয়ায় কাঠের সেঁউতি দেখতে-দেখতে সোনা হয়ে গেল। মাঝি বিস্মিত, বিহ্বল। তিনি তাঁকে দেবী বলেই মেনে নিলেন। তা না হলে এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে না। নৌকা তীরে ভিড়লে তিনি চলতে শুরু করলেন। পাটনীও তাঁর পিছু-পিছু চললেন। দেবীর পরিচয় জানতে চাইলেন। দেবী এবার আরও স্পষ্ট করে পরিচয় দিলেন। তিনিই কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণা। পাটনীর চোখে তখন জল। মুখে ভক্তির আবেশ। দেবী অন্নপূর্ণা তাঁর সারল্যে ও ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ইচ্ছামতো বর চেয়ে নিতে বললেন। তখন ঈশ্বরী পাটনী এই প্রার্থনা করেন।

(iv) **উক্তির তাৎপর্য :**

ঈশ্বরী পাটনী এখানে দেবীর কাছে ধনদৌলত, খ্যাতি প্রতিপত্তি, রাজ-ঐশ্বর্য—অনেক কিছুই চাইতে পারতেন। কিন্তু তিনি একজন সাধারণ সহজ সরল মাঝি। বিত্তশালী হওয়ার স্বপ্ন তিনি দেখেন না। সারা জীবন খেয়া পারাপার করে দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়েই সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন। তিনি নির্লোভ, স্বার্থবুদ্ধি শূন্য, সঙ্কীর্ণতামুক্ত। তিনি তাঁর চারপাশের হা-অন্ন মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা জানেন। অন্নহীন থাকার কষ্ট তাঁর অজানা নয়। অনেকের মতো তাঁর জীবন দুঃখ-দারিদ্র্যের। সেই জ্বালাযন্ত্রণার সঙ্গে তাঁরও পরিচয় আছে। সন্তানের অন্নকষ্টের আর্তি তাঁকেও পীড়িত করে। তিনি একজন নির্লোভ সন্তানবৎসল পিতা। তাঁর নিজের জন্য ধনরত্ন চাননি। সকলের জন্যেই দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের প্রার্থনা করেছেন। শুধু সাধারণভাবে সন্তানদের নিয়ে বেঁচেবর্তে থাকা ! পাটনী এখানে যেন সমগ্র মধ্যযুগের দারিদ্র্যপীড়িত সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি।

গ. 'পিতামহ দিলা মোর অন্নপূর্ণা নাম।/অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম।'—অন্নপূর্ণা কে ? পিতামহ কে ? 'অনেকের পতি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে ? 'পতি মোর বাম' কথার অর্থ কী ?

উত্তর : (i) অন্নপূর্ণা হলেন শিব-পত্নী, কাশীশ্বরী। তিনিই 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্নপূর্ণা। তিনিই পূর্বজন্মে দক্ষরাজ-কন্যা সতী, শিবজায়া। দক্ষযজ্ঞকালে পতিনিন্দা শুনে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। পরে তিনি উমা বা পার্বতী নামে গিরিরাজ ও মেনকার কন্যারূপে জন্ম নেন।

(ii) 'পিতামহ' বলতে এখানে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার কথা বলা হয়েছে। তিনিই

সবকিছুর স্রষ্টা। তাই সবারই তিনি পিতামহ। আদি জননী অন্নপূর্ণারও পিতামহ তিনি।
(iii) 'অনেকের পতি' বলতে এখানে দেবাদিদেব মহাদেবকে বোঝানো হয়েছে। অনেকেই তাঁকে পতি স্তানে পূজা করে। তিনি বিশ্বনাথ।
(iv) 'পতি মোর বাম' কথার সাধারণ অর্থ হল স্বামী তাঁর প্রতি বিমুখ। কথাটা দেবী দ্ব্যর্থক ভাষায় বলেছেন। এর গভীরে রয়েছে অন্য অর্থ। দেবী আসলে বলতে চেয়েছেন, তাঁর স্বামী হলেন মহাদেব। মহাদেবের অন্য নাম বামদেব।

ঘ. 'পরদোষে কে চাহে মজিতে'— বক্তা কে ? কার প্রতি এই উক্তি ? কোন প্রসঙ্গে বক্তা এ-কথা বলেছেন ? এতে বক্তার চরিত্র সম্পর্কে তোমার যে-ধারণা হয়েছে, তা লেখো।
উত্তর : (i) বক্তা এখানে 'বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ' কবিতার রাবণভ্রাতা বিভীষণ।
(ii) তিনি রক্ষঃকুলরত্ন, বাসবত্রাস, বীরবর মেঘনাদকে এ-কথা বলেছেন।
(iii) **প্রসঙ্গ** :
রাবণ-অনুজ সত্যাশ্রয়ী বিভীষণ রামচন্দ্রের পক্ষে যোগ দিয়েছেন। নিজেকে 'রাঘবের দাস' বলে পরিচয় দিয়েছেন। বিভীষণই রামানুজ লক্ষ্মণকে পথ চিনিয়ে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিয়ে এসেছেন। এমনকী, ইন্দ্রজিৎ যাতে অস্ত্রাগারে যেতে না পারে তার জন্যে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছেন। মেঘনাদ খুল্লতাত বিভীষণের এহেন আচরণে বিস্মিত, ক্ষুব্ধ হলেন। ভর্ৎসনাও করলেন তাঁকে। তারই উত্তরে বিভীষণ এ-কথা বলেছিলেন ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদকে।
(iv) **চরিত্র** :
বিভীষণ ছিলেন ধর্মপরায়ণ। তিনিও রণকুশলী। তাঁর মধ্যেও রয়েছে ভ্রাতৃপ্রেম, রয়েছে স্বদেশানুরাগ। কিন্তু অন্ধ মোহাবরণ তাঁকে কখনও গ্রাস করতে পারেনি। তিনি যথার্থই জ্ঞানী, বিচক্ষণ, সর্বোপরি সত্যাশ্রয়ী। ধর্মকে তিনি সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেননি। অগ্রজ রাবণের সীতাহরণকে অন্যায়, অনুচিত ও রাজধর্মবিরোধী কাজ বলে তিনি বিবেচনা করেছেন। তাঁর এই হীন কাজের তিনি নিন্দা করেছেন। আর সেজন্যই তিনি বহিষ্কৃত হয়েছেন। আজ স্বর্ণলঙ্কার এই যে করুণ পরিণতি, তার জন্যে রাবণকেই তিনি অভিযুক্ত করেছেন। স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর রাবণের দম্ভ ঔদ্ধত্য, সীতাহরণের মতো হীন অপকর্মই তাঁর বিনাশের কারণ। ধর্মপ্রাণ বিভীষণ চিরন্তন মানবধর্মকেই বড় করে দেখেছেন। তাঁর মহত্তম ধর্মোপলব্ধির কাছে স্বজাতিপ্রীতি, স্বদেশানুরাগ তুচ্ছ হয়ে গেছে। আপাতদৃষ্টিতে বিভীষণের রামের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধন, গোপনীয় তথ্য পরিবেশন, এমনকী নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণকে বাঘ দেখিয়ে নিয়ে আসা, ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দ্রজিৎকে অস্ত্রাগারে যেতে না দেওয়া চরম বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বিভীষণের কাছে ধর্ম এর চেয়েও অনেক বড়। বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র স্বার্থকেও বিসর্জন দিতে হয়। তিনিও স্বজন বিয়োগে অশ্রুকাতর হয়েছেন, লঙ্কার হতশ্রী দেখে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। তবু তিনি অন্যায়কে, পাপকে প্রশ্রয় দেননি। এখানেই তাঁর চরিত্র কর্তব্যবোধে অবিচল, দৃঢ়নিষ্ঠ।

ঙ. 'লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা অস্তাচলে।'—লঙ্কার পঙ্কজ রবি এখানে কাকে বলা হয়েছে এবং কেন ? কীভাবে সেই রবি অস্তাচলে গমন করল ?
উত্তর: (i) লঙ্কার পঙ্কজ রবি এখানে দেব দৈত্য নর ত্রাস, লঙ্কার অলঙ্কার এবং কর্বুরকুলের গর্ব বীরবর ইন্দ্রজিৎকে বলা হয়েছে।
(ii) সূর্য উঠলে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়। সূর্যের সঙ্গে পদ্মের সম্পর্ক তাই নিবিড়, অচ্ছেদ্য। রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিতের সঙ্গেও লঙ্কাবাসীর সম্পর্ক তেমনই ঘনিষ্ঠ। তিনিই লঙ্কাবাসীর মনে আশার আলো, স্বজন ও স্বদেশপ্রীতির উৎস। সূর্যসম তাঁর তেজস্বিতার ছোঁয়া পেয়ে লঙ্কাবাসীরাও পৌরুষদৃপ্ত, প্রাণবন্ত। তাঁর শৌর্যবীর্যেই স্বর্ণলঙ্কা উদ্ভাসিত। পঙ্কজের কাছে রবি যেমন, লঙ্কাবাসীর কাছে ইন্দ্রজিৎও তেমনই অপরিহার্য। তিনি একাধারে পদ্মের মতো কোমল, স্নিগ্ধ, আবার সূর্যের মতো তেজোময়।
(iii) নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবতার পূজায় রত নিরস্ত্র মেঘনাদকে, লক্ষ্মণ কপট সমরে মহারথী প্রথা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে অস্ত্রাঘাতে নিহত করলেন। এভাবেই লঙ্কার গৌরব সূর্য চিরতরে অস্তমিত হল। গভীর আঁধার লঙ্কাপুরীকে আচ্ছন্ন করল।

চ. 'গুঞ্জনে আর কূজন গীতে হর্ষে ভুবন হরবোলা।'—কোন কবিতার অংশ ? 'গুঞ্জন আর কূজন গীতে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে ? 'হরবোলা' কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।
উত্তর : (i) উদ্ধৃতাংশটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিরচিত 'ভোরাই' কবিতার অংশ।
(ii) শরৎ প্রকৃতি বিচিত্র ফুলের সম্ভারে নিজেকে সাজায়। সেই রূপের টানে ছুটে আসে অলির দল। তারা ফুলে-ফুলে উড়ে বেড়ায়। মধু পান করে। আনন্দে গুনগুন গান করে। আসলে মৌমাছির উড়ে বেড়ানোর সময় গুন্‌গুন ধ্বনি ওঠে। সেই ধ্বনিই হল গুঞ্জনধ্বনি। শরতের সেই অপরূপ, মনকাড়া ভোরে শুধু অলির গুঞ্জনই নয়, হরেক রকমের পাখি জেগে উঠেছে। আনন্দে গান ধরেছে তারা। নানা সুরের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এক ঐকতান। অর্থাৎ নির্মেঘ নীল আকাশ, রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল, ভ্রমর গুঞ্জন আর পাখির কূজনগীত—সব মিলিয়ে এক অপরূপ শরৎ।

'অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনী' কবিতায় পাটনী তাঁর সন্তানদের জন্য দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের প্রার্থনা জানিয়েছেন। পাটনী এখানে যেন সমগ্র মধ্যযুগের দারিদ্র্যপীড়িত সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি।

(iii) 'হরবোলা' শব্দের অর্থ, যে হরেক রকমের বুলি বলে। মেঘমুক্ত শরতের ঝকঝকে সোনালি সকাল সমস্ত জীবের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে এক খুশির মেজাজ। মনের খুশিতে পাখিরা গান ধরেছে। ভ্রমর গুন্‌গুন করছে। হর্ষে ভরে গিয়েছে ভুবন। বিচিত্র সুরের সমাহারে সৃষ্টি হয়েছে এক ঐকতান। যেন এক দক্ষ হরবোলা। তার কণ্ঠে ফুটে উঠেছে বিচিত্র স্বরধ্বনি।

ছ. 'আজ কি উচিত ডঙ্কা দিয়ে ঝাণ্ডা নিয়ে ঝড় তোলা ?'—উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।
উত্তর : শরতের এক সুন্দর প্রভাত। নির্মেঘ নীল আকাশ। অরুণ আলোর রক্তিমাভা পূর্ব দিগন্তে। সবুজ ধানের খেত। দূর্বাদলের ডগায় শিশিরকণা, শিউলি সুরভি ; পদ্মের সমারোহ, অপরাজিতার চোখে নীল কাজল। যেন রূপের বান ডেকেছে। পাখিরা জেগেছে। ফিঙে উড়ছে। ভ্রমর গুন্‌গুন করছে। বুলবুলি শিস দিচ্ছে। অর্থাৎ এদের 'গুঞ্জনে আর কূজন গীতে' হর্ষে আজ ভুবন এক হরবোলা। শরতের রূপের বৈভব কবিকেও মুগ্ধ করেছে। পূর্ব দিগন্তের নীলের বিস্তারে কবিমন বিভোর হয়ে আছে। আবার পশ্চিম দিগন্তের কালো মেঘ দেখে কবি বিষণ্ণ হৃদয়। সেখানে মেঘ গর্জন করছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কেশর-ফোলা সিংহের মতো ঝড়-বিদ্যুৎ ছুটে আসছে। মেঘের গর্জন এখানে ডঙ্কা বা রণদামামা। ঝড়বাদলের সম্ভাবনা যুক্ত মেঘকেই এখানে ঝাণ্ডা বলা হয়েছে। সুন্দরের পূজারী, রূপতন্ময় কবিও চান না শরতের এমন একটি সুন্দর সকাল ঝড়-বিদ্যুতের নিষ্ঠুরতায় লণ্ডভণ্ড হয়ে যাক। এমন একটি আনন্দময় প্রভাত নিরানন্দে ভরে উঠুক।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

মাধ্যমিকের লেখাপড়া

ইতিহাস

পনেরো পর্ব

সুদেব মুখোপাধ্যায়

হোমরুল লিগ আন্দোলনের বিবরণ দাও।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে ব্রিটিশ সরকারের সুতীব্র অর্থনৈতিক শোষণ, অত্যাচার তথা দমনমূলক নীতি ভারতের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে। অন্যদিকে, কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী অনৈক্য, বিচ্ছিন্নভাবে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, মুসলিম লিগের পৃথক অধিকার অর্জনের দাবি প্রভৃতি নেতিবাচক ঘটনাগুলি সম্মিলিতভাবে জাতীয় আন্দোলনের গতিকে স্তিমিত করে তোলে। উদ্ভূত এই পরিস্থিতির প্রতিবিধানকল্পে অ্যানি বেসান্ত ও বালগঙ্গাধর তিলক আয়ারল্যান্ডের অনুকরণে পৃথকভাবে হোমরুল আন্দোলনের সূচনা করেন।

উদ্দেশ্য : 'হোমরুল' কথার অর্থ হল **'ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার অনুরূপ স্বায়ত্ত শাসন'**। অর্থাৎ কেন্দ্রের হাতে বৈদেশিক, সামরিক, শুল্ক, ডাক, তার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি থাকলেও, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভারতীয়দের আধিপত্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই এদেশে হোমরুল আন্দোলন শুরু হয়। এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভারতীয়দের আরও বেশিসংখ্যক নিয়োগের দাবিও ছিল এই আন্দোলনের অন্যতম স্লোগান। আলোচ্য এই আন্দোলনের উদ্দেশ্যের যথার্থ সন্ধান মেলে **বেসান্তের এমত মন্তব্যে**—"To attain self govt. within the British empire and to educate and organise the mass opinion towards the attainment of the same."

বেসান্ত কর্তৃক লিগ প্রতিষ্ঠা : ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে বিশিষ্ট থিওজফিস্ট অ্যানি বেসান্ত তাঁর **'দ্য কমন উইল'** ও **'নিউ ইন্ডিয়া'** নামক পত্রিকাদুটির মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তিনি কংগ্রেসের কাছ থেকে কোনওপ্রকার সহযোগিতা না পেয়ে ১৯১৬ সালে নিজ দায়িত্বে হোমরুল লিগ প্রতিষ্ঠা করেন। অচিরেই মুম্বই, ইলাহাবাদ, কানপুর, বারাণসী, কালিকট ও চেন্নাই প্রভৃতি এলাকায় শাখা সংগঠন গড়ে ওঠে।

তিলক কর্তৃক লিগ প্রতিষ্ঠা : ১৯১৪ সালে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর কংগ্রেসে যোগদান করতে গিয়ে তিলক নানা কারণে প্রত্যাখ্যাত হন। ফলত, রাজনৈতিক কার্যকলাপ অব্যাহত রাখার জন্য তিনি পুনরায় তৎপর হন। এই উদ্দেশ্যে ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে বেলগাঁও প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি হোমরুল লিগ প্রতিষ্ঠা করেন। এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে **যোসেফ ব্যাপ্টিস্টা** ও **কেলকার**। লিগের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিলক নিম্নলিখিত দিকগুলি তুলে ধরেন—

I) স্বশাসিত সরকার গঠন।

II) স্বরাজের আদর্শের সঙ্গে-সঙ্গে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন।

III) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ।

আন্দোলনের বিস্তার : ক্রমশ এই আন্দোলন মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তারলাভ করে, মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় লিগের আদর্শ প্রচার করার উদ্দেশ্যে তিলক মরাঠি, ইংরেজি, গুজরাতি ও কন্নড় ভাষায় প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। ১৯১৮ সালে লিগের সদস্যসংখ্যা ছিল ৩২,০০০।

অপরপক্ষে, অ্যানি বেসান্তের লিগের কর্মক্ষেত্র ছিল অনেক বিস্তৃত। গ্রাম ও শহরে তাঁর ২০০টি শাখা কার্যালয় ছিল। আর্নডেল, রামস্বামী আয়ার ও ওয়াদিয়া নামক তিনজন অনুচর নিয়ে বেসান্ত চেন্নাই থেকে লিগের কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। ১৯১৭ সালে তাঁর লিগের সদস্যসংখ্যা ছিল ২৭,০০০।

একই লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে দু'টি লিগ গঠিত হলেও উভয়ের কর্মক্ষেত্র পৃথক হওয়ায় বিরোধের অবকাশ ছিল না। বস্তুত হোমরুল লিগের মাধ্যমে বেসান্ত ও তিলক সারা ভারতে শাসন সংস্কারের দাবি প্রচার করে। এই আন্দোলনের সদর্থক দিকের পরিচয় প্রসঙ্গে **এইচ এফ আওয়েন** তাঁর 'Soundings in Modern South Asian History' গ্রন্থে বলেছেন যে, অবহেলিত প্রদেশে জাতি, ভাষা ও বিভিন্ন বৃত্তির মানুষকে লিগ শামিল করেছিল।

১৯১৪ সালে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর কংগ্রেসে যোগদান করতে গিয়ে তিলক নানা কারণে প্রত্যাখ্যাত হন। ফলত, রাজনৈতিক কার্যকলাপ অব্যাহত রাখার জন্য পুনরায় তৎপর হন। এই উদ্দেশ্যে ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে বেলগাঁও প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি হোমরুল লিগ প্রতিষ্ঠা করেন। এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে যোসেফ ব্যাপ্টিস্টা ও কেলকর।

সরকারি প্রতিক্রিয়া : হোমরুল লিগের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে সরকার নিম্নলিখিত দমননীতি গ্রহণ করেন। I) ছাত্ররা যাতে এই আন্দোলনে যোগ দিতে না পারে, এই মর্মে সরকার আইন জারি করে।

II) বিপ্লবাত্মক বক্তৃতার জন্য তিলককে গ্রেফতার করা হয়।

III) বেসান্তকে 'নিউ ইন্ডিয়া' পত্রিকার জন্য প্রথমে দু'হাজার ও পরে ১০ হাজার টাকা জামিন চাওয়া হয়।

মূল্যায়ন : সরকারি দমননীতির চাপে হোমরুল আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী না হলেও, এর উদ্দেশ্য কিন্তু পুরোপুরি ব্যর্থ হয়নি। আর সে-কারণেই তদানীন্তন ভারত সচিব মন্টেগু নীতিগতভাবে স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নেন।

এই আন্দোলন যেমন একদিকে কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনের অসারত্ব প্রমাণ করে, তেমনই অপরদিকে গান্ধীজির আন্দোলনের প্রেক্ষাপট প্রস্তুত করে। এ-কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে **জুডিথ ব্রাউনের** এরূপ মন্তব্যে— "The Home Rule leagues begar in halting fashion what Gandhi was later to do boldly and with far greater success."

সাইমন কমিশন-এর বিরুদ্ধে ভারতীয়দের আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

অথবা, সাইমন কমিশন ও তার প্রতিক্রিয়া।

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার ও স্বরাজ্য দলের ব্যর্থতার ফলে রাজনৈতিক দলাদলি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকট হয়ে ওঠায় সমগ্র ভারতব্যাপী হিন্দু-মুসলমান সঙ্ঘর্ষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কংগ্রেসের তরুণ নেতারা ক্রমশ বামপন্থী ভাবধারায় প্রভাবিত হন। জাতীয় আন্দোলনের এই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে সাইমন কমিশনের আগমন ঘটে।

কমিশন আসার কারণ : ভারতীয় জনগণের সাংবিধানিক ও শাসনতান্ত্রিক অধিকার পূরণের উদ্দেশ্যেই কমিশন ভারতে আসে। যদিও ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সংস্কার আইনের শর্তানুসারে ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য ১০ বছর পরে একটি কমিশন নিয়োগের উল্লেখ ছিল। কিন্তু, ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনের জন্য **টোরি মন্ত্রিসভা** নির্ধারিত সময়ের আগেই এই কমিশন নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রখ্যাত আইনবিদ **সার জন সাইমন, এডওয়ার্ড ক্যাডোগান, স্টিফেন ওয়াল্‌শ, মেজর এটলি** প্রমুখ সাতজন সদস্য নিয়ে কমিশন গঠিত হয়, প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য যে, এই কমিশনে কোনও ভারতীয় সদস্য ছিলেন না।

দায়িত্ব : সাইমন কমিশন মূলত ভারতীয় শাসনব্যবস্থার পরিস্থিতি, শিক্ষার অগ্রগতি ও সরকারি নীতির বিচার-বিবেচনা শুরু করে। এদেশে প্রচলিত দায়িত্বশীল সরকারের কার্যকলাপ হ্রাস-বৃদ্ধির দায়িত্বও কমিশনকে দেওয়া হয়।

ভারতীয়দের বিক্ষোভ : সংস্কার প্রবর্তনের আশ্বাস দিয়ে ব্রিটিশ সরকার কার্যত ঐক্যের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিলেন। তদানীন্তন ভারতীয় নেতৃবর্গ সরকারের এমত প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য যথার্থভাবেই উপলব্ধি করেন। ফলত কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, হিন্দু মহাসভা, ভারতের বণিক ফেডারেশন ও মিল মালিক সঙ্ঘ প্রভৃতি দল কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯২৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি সাইমন কমিশন মুম্বই এসে পৌঁছয়। এইদিন সমগ্র ভারতে বর্জন আন্দোলন ও হরতাল পালিত হয়। এ ছাড়া জনগণ মিটিং-মিছিল ও কালো পতাকা প্রদর্শন করে সাইমন কমিশনকে 'অভ্যর্থনা' জানান। 'সাইমন ফিরে যাও' বা Go back Symon ধ্বনিতে ভারতবর্ষ মুখর হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সাইমন কমিশন-বিরোধী আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করতে শুরু হয় সরকারি দমন-পীড়ন।

সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে **পঞ্জাবের** লাহোর শহরে এক প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। এতে নেতৃত্ব দেন লালা লাজপৎ রায়। পুলিশ লাঠিচার্জ করলে লালা লাজপৎ গুরুতর আহত হন ও কিছুদিনের মধ্যে মারা যান।

অপর ঘটনাটি ঘটে **উত্তর প্রদেশের** লখনউ শহরে। এখানকার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে জওহরলাল নেহরু ও গোবিন্দবল্লভ পন্থ পুলিশের গুলিতে আহত হন। তথাপি, লক্ষণীয় যে, নির্লজ্জ সরকারি নিপীড়নও এই আন্দোলনের গতি রোধ করতে পারেনি।

ফলাফল : ভারতের এই উত্তাল পরিস্থিতির মধ্যেও কমিশন তার সমীক্ষা চালায় এবং দু'বছরের মধ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তাদের প্রতিবেদন পেশ করে। এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই **'ভারত শাসন আইন'** প্রবর্তিত হয়।

(ii) কমিশনের বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে বিবদমান ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে গভীর ঐক্যের সৃষ্টি হয়।

(iii) কোনও ভারতীয়কে কমিশনে স্থান না দিয়ে সরকার তাদের সাম্রাজ্যবাদী ও স্বৈরতন্ত্রী মনোভাব উন্মোচিত করে।

(iv) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার অবসান ঘটে এবং ভারতের মৃতপ্রায় আন্দোলন পুনরায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

(v) এই কমিশনের বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে **'নেহরু রিপোর্ট'** প্রকাশিত হয়।

১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহ সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তিম লগ্নের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গণ-বিস্ফোরণ হল ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহ। '৪২-এর বিপ্লব, আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তি সংগ্রাম, সমগ্র ভারতে এক উত্তাল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। পরিণামে সাম্রাজ্যবাদী সরকার, ওয়াভেল পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বাধীনতা সম্বন্ধে নতুন চিন্তাভাবনা শুরু করে। এরূপ সঙ্কটজনক মুহূর্তে নৌ-সেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

কারণ : নৌ-বিদ্রোহ সঙ্ঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে নীচের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। যেমন—

প্রথমত, ব্রিটিশ অফিসারদের জাতিগত বিদ্বেষ, বৈষম্যমূলক আচরণ ও অত্যাচার ভারতীয় নাবিক ও কর্মীদের ক্রমশ ক্ষুব্ধ করে তোলে।

দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ সময়েই ভারতীয় নাবিকদের নিকৃষ্ট মানের খাদ্যদ্রব্য দেওয়ায় তারা সরকারের ওপর অসন্তুষ্ট হয়।

তৃতীয়ত, সমযোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয়দের বেতনের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য লক্ষ করা যায়। তাদের বিশেষ বেতন বৃদ্ধি বা পদোন্নতিও ঘটত না।

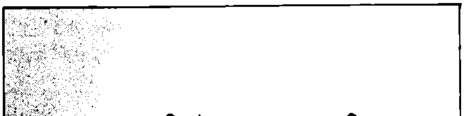

১৯৪৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ে তলোয়ার জাহাজে নাবিকরা প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পরদিন অন্যান্য জাহাজে দ্রুত বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহকে অনেকে ১৯০৫ সালে রাশিয়ার কৃষ্ণসাগরের নৌ-বিদ্রোহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আন্দোলনকারীরা জাহাজ ছেড়ে মুম্বইয়ের পথে-পথে ব্রিটিশ-বিরোধী স্লোগান দেয়। তারা জাহাজের মাস্তুল থেকে ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে সেখানে কংগ্রেস, মুসলিম লিগ ও কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা তুলে দেয়।

উল্লেখিত প্রত্যক্ষ কারণ ছাড়াও, আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তি সংগ্রাম নৌ-সেনাদের পরোক্ষভাবে উদ্দীপিত করে। বস্তুত, আজাদ হিন্দ বাহিনীর ধৃত সৈনিকদের মুক্তির দাবিতেই তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়।

এ ছাড়াও, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে মুক্তি সংগ্রামের ঝড় ওঠে। এই যুদ্ধে ব্রিটেন জয়লাভ করলেও তার অর্থনৈতিক ও সামরিক বনিয়াদ দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্য দিকে ব্রিটেনে শ্রমিকদল ক্ষমতালাভ করায় ভারতীয় নৌ-সেনারা উৎসাহিত হয় এবং ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়। এই ধর্মঘট দ্রুতলয়ে নৌ-বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়।

বিদ্রোহ : ১৮ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ে তলোয়ার জাহাজে নাবিকরা প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পরদিন, অন্যান্য জাহাজে দ্রুত বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহকে অনেকে ১৯০৫ সালে রাশিয়ার কৃষ্ণসাগরের নৌ-বিদ্রোহের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

আন্দোলনকারীরা জাহাজ ছেড়ে মুম্বইয়ের পথে-পথে ব্রিটিশ-বিরোধী স্লোগান দেয়। তারা জাহাজের মাস্তুল থেকে ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে সেখানে কংগ্রেস, মুসলিম লিগ ও কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা তুলে দেয়। মুম্বই, করাচি ও কোচিনে আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে।

(অবশিষ্টাংশ আগামী সংখ্যায়)

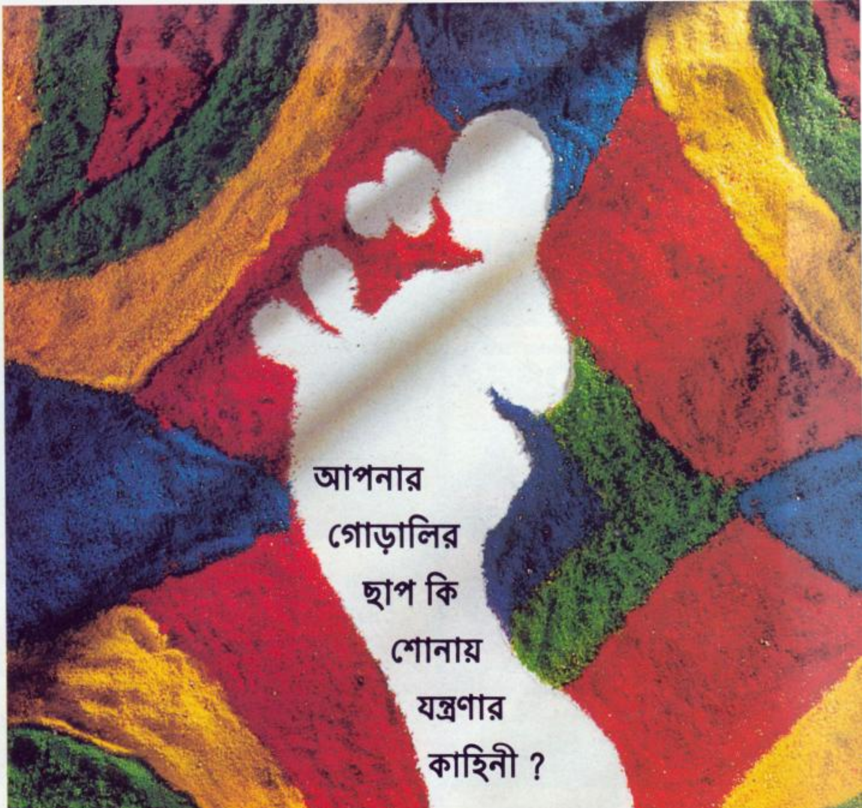

ফাটা গোড়ালি হবে সুন্দর মোলায়েম

গোড়ালির বিশ্রী ফাটা। জ্বালা। যন্ত্রণা। সংকোচ। টিটকিরি। এ সব হয়রানির কারণ পেট্রোলিয়াম জেলি বা কোল্ড ক্রীমের মতো কোনও সাধারণ চিকিৎসা তো নয় ? কেননা এসবে কাজ হতে সময় লাগে। চটপট আরাম পেতে আপনার দরকার **ক্র্যাক ক্রীম**। এর সোরিয়া রুবুস্টা উপাদানটি ফাটা যতই গভীর হোক না কেন সারিয়ে তোলে। নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করলে মাত্র ১৪ দিনেই ফাটা গোড়ালি সুন্দর মোলায়েম হয়ে ওঠে। এর পর আপনার গোড়ালি শোনাবে এক নতুন কাহিনী; কোমলতার। সৌন্দর্যের। প্রশংসার।

পরিচর্যায় সুফল পাওয়ার জন্য ক্র্যাক ক্রীম লাগাবেন প্যাকে লেখা নির্দেশ অনুযায়ী।

ক্র্যাক ক্রীম-ফাটা গোড়ালির **বিশেষ** পরিচর্যা।

ভারতের ১ নং হিল কেয়ার ক্রীম।

Mudra:PAR:10095 Ben.

ANANDAMELA 31 DECEMBER 1997 REGD. NO. WB/CC/264 MH/MBI-SOUTH/683/97 TN/MS(C) 731 Rs. 15.00